কপিল নাচছে

মতি নন্দী

নবপত্র প্রকাশন / কলিকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ই এপ্রিল, ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

ব্লেজার

বাবা আর ছেলে তালকোটরা সুইমিং পুল স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে এসে কুড়ি মিনিট ধরে চেষ্টা করছে একটা অটো রিক্‌শা বা ট্যাক্সি পাওয়াব জন্য। নানান রুটের বাস চলাচল করছে বটে কিন্তু ওরা জানে না কত নম্বরেরটা তাদের হোটেলের রাস্তা দিয়ে যাবে। নেহরু স্টেডিয়ামে এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন দেখে ফেরাব সময় একটা লোকের কথা শুনে বাসে উঠে তারা দিল্লির উত্তরপ্রান্তে চলে গেছল। তখনই ঠিক করে আর বাসে ওঠা নয়।

"আমাদের হোটেলের সামনে দিয়ে নিশ্চয়ই একটা না একটা বাস যায়। কন্ডাক্টরকে জিগ্যেস করে উঠে পড়ি, চল্।" বরুণ সম্মতির জন্য ছেলের মুখের দিকে অনিশ্চিতভাবে তাকাল। বলুর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা তার কাছে অনেক কিছুর থেকে প্রিয়। "কাছাকাছিও যদি যায় তাহলে, এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে—"

"কিন্তু গাভমেন্টেরই তো ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল। কত ফরেন ট্যুরিস্ট এসেছে, দেশের কত জায়গা থেকে লোক এসেছে, সবাই কি আর শুধু পাবলিক বাসেই চড়বে?" বলুর স্বরে যতটা না বিরক্তি তার থেকেও সমালোচনার ঝোঁকটাই ফুটে উঠেছে। বরুণের তা ভাল লাগল, বিশেষ করে 'গভর্নমেন্ট' উচ্চারণটা।

ভ্রূ তুলে সে কাঁধদুটো উপরে নিচে ওঠানামা করিয়ে বলল, "একটা গাড়ি পাবার জন্য এতক্ষণ ধরে ছোটাছুটি বিদেশে হলে কি এরকম হত?"

বলু চুপ রইল। বরুণ আপনমনে গজগজ করে বলল, "দেশের সব জায়গায় এই ব্যাপার! ...ট্যাক্সি, অটো, বাস ট্রাম ঠিক সময়ে কিচ্ছুটি পাবার উপায় নেই...ফুটবল ম্যাচটা কটায়?"

ব্লেজারের হাতা তুলে ঘড়ি দেখতে গিয়ে বরুণের মনে হল বগলের কাছে সেলাই ছেঁড়ার শব্দ যেন শুনতে পেল। আটাশ বছরের পুরনো ব্লেজার। সুধা এতদিন যত্নে রেখেছে তাই মোটামুটি গায়ে দেবার মত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু সুতো যদি পচে যায় কি আর করতে পারে। আটাশ বছর আগের গায়ের মাপও

আর নেই। তখন সে ছিল এক মণ আটাশ সের, চারদিন আগে হাওড়া স্টেশনে ওজন নিয়েছে। ছিয়াত্তর কেজি, মানে কত মণ কত সের ?

ট্যাক্সির দিকে বলু দৌড়ল, পিছনে বরুণও। কিন্তু সে কয়েক পা দৌড়েই থেমে গেল। ডাক্তারের মানা আছে শরীরকে দিয়ে হঠাৎ কিছু করানয়। জোরে হেঁটে সে ট্যাক্সির কাছে পৌঁছল। লোকটি ভাড়া মিটিয়ে একবার ওদের দিকে তাকাল। ব্লেজারে চোখ পড়তেই বরুণের মুখের দিকে চোখ উঠল। একটা চেষ্টা লোকটির চাহনিতে ফুটে উঠল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। ব্লেজারের পকেটের লেখাটা পড়ার চেষ্টা করল। তারপর আবার বরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে, ফিকে হাসি ঠোঁটে টেনে দিয়ে পুলের গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ একটা আত্মপ্রসাদ বরুণের মনেপ্রাণে ছেয়ে এল।

"তাকাল কেন ?"

ব্লেজারটা কি খুব বেমানান লাগছে ? ব্লেজার যত পুবনো হয় ততই কদর বাড়ে। এটা কি মিউজিয়ামে রাখার মত অবস্থায় এসে গেছে ? আমাকে কি খুব বয়স্ক দেখাচ্ছে ?

লোকটা কি আমার দিকেই তাকিয়েছিল ? আমাকে কি কেউ চিনবে ?

বরুণ ছেলের দিকে তাকাল। ট্যাক্সিব জানালা দিয়ে বলু রাস্তা, বাড়ি, গাছ, আলো গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে। এই প্রথম ও দিল্লিতে। সে প্রথম এসেছিল কবে ? প্রথম ডুরান্ডে খেলতে। কোন সালে ? বরুণের মুখে হাসি ফুটল। দেখতে দেখতে একত্রিশটা বছর কেমন পার হয়ে গেল।

"বাড়িগুলো কি সাজান. বিউটিফুল, কি চওডা চওড়া পরিষ্কার রাস্তা আর গাছ ! কান ফাটানো হর্ন বাজে না।"

বলু উত্তেজিত হয়ে উঠেছে দেখে বরুণ গম্ভীর মৃদুকণ্ঠে বলল, "মনে রেখ এটা ইন্ডিয়ার ক্যাপিটাল আর এখানে চলছে এশিয়ার গ্রেটেস্ট বিগেস্ট স্পোর্টিং ইভেন্ট। ঝকঝকে ঝলমলে করে তো রাখতেই হবে। দেশের প্রেস্টিজের ব্যাপার এটা। ফরেন ডিগনিটারিজরা সব সময় আসছে যাচ্ছে..."

ব্লেজারের বগলের সুতো তাকে ভাবনায় ফেলেছে। যদি ছিঁড়ে গিয়ে থাকে তাহলে এখন সেলাই করাবে কোথায় ?

"ব্যাডমিন্টন দেখতে আর যাব না, তোর ইচ্ছে আছে নাকি ?"

"আর একদিনের টিকিট তো রয়েছে।"

"প্রকাশ নেই, ইন্ডিয়া থেকে একটা চ্যালেঞ্জ অন্তত তাহলে থাকত।...স্টেডিয়ামটা করেছে কিন্তু জব্বর, আমাদের সময় এসব ভাবাই যেত না। পঁচিশ হাজার লোকের ইন্ডোর স্টেডিয়াম, দিল্লি দেখাল বটে !"

"কাল একটা রাস্তার নাম দেখলাম কোপর্নিকাস মার্গ। এমন নামের রাস্তা কলকাতায়ও থাকা উচিত।"

"কেন, আছে তো, সেক্সপীয়র সরণি।"

"সায়েন্টিস্টের নামে থাকা উচিত।"

"আইনস্টাইন ?"

"হ্যাঁ।"

বলু মুখ ফিরিয়ে হাসল। "কলকাতার মত পলিটিক্যাল নেতাদের অকথ্য বাজে মূর্তি দিয়ে শহরটা নোংরা নয়।"

"ঠিক, কারেক্ট।" বরুণ বারদুই মাথাটা বাতাসে ঠুকল। বলুর মন বয়সের তুলনায় যে অনেক ম্যাচিওরড় এটা খুবই ভাল।

এশিয়ান গেমসের জন্য তৈরি নতুন হোটেলটার ফটক দিয়ে ঢুকে পোর্টিকোয় ওদের ট্যাক্সিটা থামতেই সেখানে অপেক্ষমান এক দম্পতি ব্যগ্র হয়ে এগিয়ে এল। বরুণ ভাড়া মিটিয়ে একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখল নতুন যাত্রী কারা। টাক শুরু হওয়া, ভারি গতরের, শ্যামবর্ণ পুরুষটির চোখ তার ব্লেজারের বুক পকেটে সোনালী সুতোয় এমব্রয়ডারি করা : "ইন্ডিয়ান ফুটবল টিম। ম্যানিলা এশিয়ান গেমস ১৯৫৪" অক্ষরগুলোর দিকে। অক্ষরগুলো বিবর্ণ, সুতো আলগা, চট করে পড়া যায় না যদিও হোটেলের দরজায় যথেষ্ট আলো। সে লোকটির দিকে শরীর ঘুরিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল যাতে পড়তে পারে। লোকটি হাসি হাসি ভাব মুখে ফুটিয়ে চোখ তুলে তাকে দেখল। বরুণও সৌজন্যবশত হাসল এবং লক্ষ্য করল গাড়িতে ঢুকেই লোকটি বউকে কিছু বলল এবং ট্যাক্সি চলতে শুরু করামাত্রই দুজনে মুখ ঘুরিয়ে পিছনের কাচ দিয়ে তার দিকে তাকাল।

বরুণ ভ্রু কুঁচকে সিঁড়ির ধাপে পা রেখে বলুর দিকে তাকিয়ে দেখল ওর মুখে বিস্ময়।

"তোমার চেনা ?"

"কই না তো! কেন ?"

"এমনি।"

আবার সে আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। "আশ্চর্য এক একটা লোকের স্মৃতিশক্তি কী ভীষণ যে জোরালো হয়!" নিজেকে শুনিয়ে বরুণ বলল।

ঘরের চাবি নেবার সময় বরুণের মনে হল রিসেপশনিস্টের চোখ যেন তার বুক পকেটের উপর তিন সেকেন্ডের জন্য বসেই উড়ে গেল। ছোকরাকে সে কাউন্টারে আগে দেখেনি। ওর মুখ দেখে মনে হল না ব্লেজারটা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কৌতূহল বোধ করছে। হয়তো ফুটবল ভালবাসে না কিংবা সিনেমা

স্টার ছাড়া আর কিছুতে আগ্রহী নয়। ম্যানিলা গেমসের সময় নিশ্চয় ওর জন্ম হয়নি। বরুণ চ্যাটার্জি নামটা ওর বাবা-কাকা হয়ত জানতে পারে। অবশ্য যদি তারা যৎসামান্যও ফুটবল নিয়ে মাথা ঘামিয়ে থাকে।

রিসেপশন লবির প্রান্তে টি ভি সেটের সামনে সোফাগুলোয় ঠাসাঠাসি দর্শক, কিছু লোক দাঁড়িয়ে দেখছে। বলু সেদিকে এগিয়ে গেল। মেয়েদের ভলিবল ম্যাচ চলছে।

"বলু হারি আপ, ফুটবল ম্যাচ কটায় ?"

বরুণ বাঁহাতটা তুলতে গিয়ে তুলল না, লবির দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাল।

"বরুণ লিফটের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ভাবল, লোকটা কে হতে পারে ? সে কুড়ি-একুশ বছর আগে খেলা ছেড়ে দিয়েছে, লোকটার বয়স কম করেও চল্লিশ বিয়াল্লিশ। দেখে তো মনে হল বাঙালি, হয়ত কলকাতার লোক এখানে চাকরি করতে এসেছে। যদি সতের বছর বয়সেও, সেটা এখনও বলুর বয়স, মাঠে যাতায়াত শুরু করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তার নাম শুনেছে তো বটে, খেলাও দেখেছে। চেহারা মনে রাখা এমন কিছু শক্ত নয়। কাগজে বছরে দু-তিনবার ছবি বেরতোই অবশ্য ছবিগুলো বেশিরভাগই চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের। তাহলেও একটু মোটা হওয়া আর সামনের দিকের চুল উঠে যাওয়া ছাড়া সে প্রায় কিছুই বদলায়নি।

লোকটা কি আমায় চিনেছে, নাকি নিছকই ব্লেজারটার জন্য কৌতূহল।

তবু সে আবার আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে করতে টের পেল এই এশিয়ান গেমসের মাঝে সেও যেন একটা ভূমিকায় রয়েছে। কিছু একটা তাকে করতে হবে। বলুর ওই 'তোমার চেনা ?' কথাটা আর অবাক চোখে তাকান, তাকে যেন পথ দেখাল। বরুণ বহুদিন বাদে নিজের অস্তিত্ব যেন খুঁজে পাচ্ছে। ছেলের কাছে তার আলাদা একটা পরিচয় তুলে ধরার সুযোগ এসেছে। এমন সুযোগ কলকাতায় কখনও পায়নি, সেখানে এই ব্লেজার পরলে লোকে হাসবে। দিল্লি এশিয়ান গেমসের কাছে সে কৃতজ্ঞবোধ করল।

লিফট থেকে কিছু লোক বেরিয়ে এল। বরুণ লক্ষ্য করল না তাদের মধ্যে একজন একবার থমকে তার দিকে তাকিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল। বরুণের নজর তখন বলুর দিকে। ছেলেটা জমে গেছে টি ভি-র সামনে।

॥ ২ ॥

ভ্রূ কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে বরুণ চ্যাটার্জি কোটের হাতা টেনে তুলে ঘড়ি দেখল। চট করে কি একটা হিসেব করে নিয়েই দ্রুত বলল, "পনেরো মিনিট বড় জোর কুড়ি···তৈরি হয়ে নাও। গরম মোজা পর, ফুলহাতা সোয়েটারটা, জ্যাকেটটা আর টুপিটাও নাও। ওভারকোটটা হাতে নিও। আমি ততক্ষণ বাথরুমের থেকে ঘুরে আসছি। চা বলছি, কিছু খাবে কি ? একদম খালি পেটে থাকা উচিত নয়, ফিরতে ফিরতে দশটা হয়ে যাবে, কাল কটায় ফিরেছিলাম আমরা ?···স্যান্ডুইচ বলছি। আর শোন, তোমার ওই জীনসের প্যান্টটা বদলাও। দিল্লির ঠাণ্ডা কি জিনিস তাতো জান না, গরম প্যান্টটা পরে নাও। আমরা যখন ডুরান্ড খেলতে আসতাম···

বরুণ টেলিফোন তুলল।

"স্পিকিং ফ্রম রুম নাম্বার ফোর জিরো ফাইভ, ইয়েস ইয়েস চারশ পাঁচ, দো প্লেট চিকেন স্যান্ডুইচ ঔর এক পট চায়ে ভেজ দেনা···সেন্ড কুইকলি প্লীজ।"

আড়চোখে সে ছেলের দিকে তাকাল। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ছে। ক্লাস নাইন। মোটামুটি ফরফরিয়েই বলে, উচ্চারণটাও অন্যরকম। ওর সামনে ইংরেজিতে কারুর সঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তি হয় বরুণের। সে বাহান্ন সালের আই এ পাশ। কলেজে থার্ড ইয়ার আর্টসে শুধু নামটাই যা লেখান ছিল, পড়াশুনো আর হয়নি। ফুটবল খেলার জন্য মাঠে মাঠে ঘোরাঘুরি করেই পড়ার পাট চুকিয়ে দেয়। দুবার সে ভারত দলের সঙ্গে বিদেশেও গেছল তার একটি ম্যানিলায় এশিয়ান গেমসে, কিন্তু ইংরেজি বলাটা রপ্ত করতে পারেনি। জীবনের প্রথম তিরিশ বছর ইংরেজিতে কথা বলার দরকার বা সুযোগ হয়নি।

সে মুখচোরা তার উপর সব সময়ই ভয়, ব্যাকরণ অশুদ্ধ ইংরেজি বলে অন্যাদের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠবে।

বলু পিছন ফিরে প্যান্ট নামিয়ে পা থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। ভাল স্বাস্থ্য, খেলায় আগ্রহী, স্কুলটিমে সেন্টার স্ট্রাইকারে খেলে। খেলতে চাইলে খেলুক, তার আপত্তি নেই। নিজের চেষ্টায় গড়ে তোলা পেইন্টের এজেন্সির ব্যবসা, তিনতলা বাড়ি যা থেকে মাসে আড়াই হাজার টাকা ভাড়াও পাচ্ছে আর সল্ট লেকে চার কাঠার জমিটা, এসবই ও পাবে। অর্থাভাব হবে না। নামী ফুটবলার হলে খ্যাতি পরিচিত সম্মান পাবে যেমন সে নিজে একদা পেয়েছে হয়ত আজও পায়।···এখনও কি পায় ? কেউ কি তাকে চেনে বা চিনতে পারবে ?

বলু তার একমাত্র ছেলে। আজকালকার চ্যাংড়া, অসভ্য নয়, বাবা-মাকে

শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, পড়াশুনোয় ভাল, দেখতেও সুন্দর হয়েছে, মুখখানি ওর মায়ের মত। বরুণ ছেলেকে ভালবাসে। ছেলের চোখে নিজেকে বড় করে তুলে ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যায়। সফলও হয়। গতমাসে বলু দুটো অটোগ্রাফ বইয়ে তার সই করিয়ে নিয়ে গেছে।

"ওভারকোটটা নেব না, এমনকি ঠাণ্ডা!"

"না না ইউ মাস্ট···অবশ্যই নেবে। ঠাণ্ডাটা ভীষণ ট্রেচারস এখানে। মনে হবে লাগছে না কিন্তু···দিল্লিতে সন্তোষ ট্রফি খেলতে এসে আমার লেগেছিল। হেঁটে ফিরছিলাম নাইট শোয়ে সিনেমা দেখে···তোমাকে তো সে গল্প করেছি। বুকে চাপ চাপ সর্দি, একটা ম্যাচও ফাইনালের আগে খেলতে পারিনি, অবশ্য আমার গোলেই বেঙ্গল ট্রফি জিতেছিল। মনে রেখ খোলা স্টেডিয়ামে বসতে হবে, একদমই এই ঠাণ্ডাকে অবহেলা করবে না।"

বরুণ বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল এবং দশ মিনিট পরেই বেরিয়ে এল। ততক্ষণে চা, স্যান্ডুইচ এসে গেছে। বলুর একহাতে স্যান্ডুইচ অন্য হাতে চামচ নাড়ছে চায়ে।

"টিকিটগুলো দেখে নাও, তারিখ ঠিক আছে কিনা চেক কর।"

বরুণ দ্রুত সোয়েটারটা পরে নিয়ে খাটের উপর রাখা তার আটাশ বছর আগের আকাশী নীল ব্লেজারটা স্নেহভরে তুলে নিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে লাল আধ ইঞ্চি একটা সুতো খুঁটে তুলে নিল। ঘাড়ের কাছে টোকা দিয়ে ধুলো ঝাড়ল। তারপর সন্তর্পণে হাত গলিয়ে পরতে লাগল। পেটের কাছে বোতামটা আঁটা যায় না, কাঁধেও চাড় পড়ে; বরুণ কুঁকড়ে থাকে ব্লেজারটা গায়ে দিয়ে। সব সময় তার ভয় হয়, এই বুঝি সুতো ফেটে গেল। 'কমাতে হবে, বড্ড চর্বি জমে গেছে', প্রতিবারই ব্লেজারটা গায়ে দিয়ে সে মনে মনে বলে। এখনও বলল।

বলু দুটো টিকিট বরুণের অ্যাটাচি কেস থেকে বার করে চোখ বুলিয়ে বলল, "ঠিকই আছে এই তো আজকের তারিখই লেখা।"

"তবু দেখে নেওয়া ভাল। সিঙ্গাপুরে একবার আমাদের···"

সে থেমে গেল। বলু ঝুঁকে জুতোয় ফিতে বাঁধছে, কথাগুলো শুনছে না। সম্ভবত সতের-আঠার বার শুনছে। স্যান্ডুইচ-চা খেয়ে বরুণ ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল। আয়নায় নিজেকে দেখে নেবার সময় কানের পাশ থেকে টাকের উপর টেনে আনা চুলে সে আলতো চাপড় দিল।

"দেখে নাও তো বারান্দার দরজাটা লক করা আছে কিনা।"

নিজেও সে টেনে দেখল সুটকেস দুটোয় চাবি দেওয়া কিনা।

"যদিও চুরি যাবে না জানি, বড় হোটেলে বেয়ারাদের তুমি বিশ্বাস করতে প'র তবু অভ্যাসটা থাকা ভাল। সব সময় সাবধান হবে, চল এবার।"

ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় চাবি দেবার আগে বরুণ টাকার ব্যাগ খুলে পরিমাণটা দেখে নিয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসল।

"আজ কনট প্লেসে কাকেদায় খাব। ঝাল ঝাল বেশ লাগে, তবে বড্ড রিচ। ওই এক আধবারই খাওয়া ভাল।"

॥ ৩ ॥

রাস্তায় বেরিয়ে ওরা অপেক্ষা করতে লাগল অটোরিক্শার জন্য। হাত নেড়ে একটা খালি রিক্শাকে দাঁড় করিয়ে বরুণ বলল, "নেহরু স্টেডিয়াম।"

মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানিয়ে অটোওয়ালা চলে গেল। দুজনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হাঁটতে শুরু করল।

"এইখানেই দাঁড়াই।"

সংসদ মার্গ আর অশোক রোডের মোড়ে রাস্তার আলো যেখানে উজ্জ্বল বরুণ সেখানে দাঁড়াল। ব্লেজারটা চোখে পড়ার মত আলো এখানটায়।

"এই এক ঝামেলা, বাবুদের অনুমতি নিয়ে তবে অটোয় উঠতে হবে।"

"কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালারাও তাই করে। অবনক্লাস, আমরা যে কত আন্ডার-ডিভেলাপড, এই থেকেই বোঝা যায়।"

ইংরেজি শব্দগুলো বরুণের ভাল লাগল।

"আর আমরা কিনা থার্ড ওয়ার্ল্ডের নেতা!"

বরুণের মনে হল, থার্ড ওয়ার্ল্ড' শব্দটা ফুটবলার হিসাবে ভারতে সে প্রথম উচ্চারণ করল এখনকার কটা ফুটবলার পারবে?

"ধর ধর, বল্।"

ওদের দেখে অটোরিক্শাটা নিজে থেকে শুধু থামলই না, নেহরু স্টেডিয়াম বলামাত্র যেতে রাজি হয়ে গেল।

স্টেডিয়াম থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে ওদের নামতে হল। স্রোতের মত লোক চলেছে। তাদের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে ওরা স্টেডিয়াম পৌঁছল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় বরুণ তারই বয়সী ব্লেজার পরা, এক শিখকে দেখে স্মিত হেসে মাথা হেলাল। লোকটি একহাত সামান্য তুলে মাথা ঝাঁকাল সামান্য এবং দ্রুত উঠে গেল। ওর ব্লেজারে টোকিও এশিয়ান গেমস ১৯৫৮ লেখা। কোন টিমে ছিল সেটা আর পড়া হল না, বোধহয় অ্যাথলেটিকস কিংবা হকির কেউ।

"তোমার চেনা নাকি ?"

"আমার ? কই না তো !"

""হাত তুলল দেখলাম।"

"তাই নাকি। হয়ত চিনতে পেরেছে।"

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ফুটবল ম্যাচ। পঁচাত্তর হাজার লোকের স্টেডিয়াম কানায় কানায় ভরা। কোনক্রমে ওরা দুজন জায়গা করে বসল। ওদের আশেপাশে যে অধিকাংশই বাঙালি সেটা কথাবার্তাতেই বোঝা যাচ্ছে।

"টুপিটা এবার পরে নাও।"

"পরে।"

"না না এখনই, দিল্লির ঠাণ্ডা বড় ট্রেচাবাস।"

অনিচ্ছাভরে বলু টুপি মাথায় দিল। কানদুটো ঢাকা পড়েনি, কিনারা ধরে বরুণ টুপি টেনে নামাল।

ভারত দুগোলে জিতল। ঠেলাঠেলি করে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় বরুণের পাশের লোকের মন্তব্যের জবাবে একজন বলল, "থার্টি ইয়ার্ডস থেকে প্রসূন দুটো শট নিল আর দুটোতেই গোল. কোন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডেব গোলকীপার কি ওই শটে গোল খায়।"

"নিশ্চয় খেতে পাবে···কি দুর্দান্ত শট আর কতটা সোয়ার্ভ কবেছিল !"

"আমরা যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে বলের সোয়ার্ভ দেখা যায় নাকি ? কি সব গুলগাঁজা মারছিস !"

দুজনেব গলার স্বব ক্রমশ চড়ে উঠছে, বহু লোক ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে, শুনছে। নিচের ধাপে বলুব দিকে একটু ঝুঁকে বকণ বলল. "থার্টি কেন ফর্টি ইয়ার্ডস থেকেও গোল হতে পারে. রোভার্সে সঞ্জীবকে গোল দিয়েছি প্রায় ফর্টি ইয়ার্ডস থেকে···সঞ্জীব তখন ইন্ডিয়ার বেস্ট তো বটেই ওযার্ল্ডেরও ওয়ান অব দ্য বেস্ট ছিল।"

যতটা গলা নামিয়ে বললে বলু শুনতে পায বরুণ ততটা নামায়নি। অনেকের মাথা পাশে ফিরল, পিছনে ফিরল। তীক্ষ্ণ চোখগুলো তার মুখটাকে খুঁটিয়ে দেখেই ব্লেজারের দিকে উৎসুকভাবে নেমে গেল। ভিড়ে বুক পকেটটা আড়াল পড়ে গেছে, বিশেষ করে সামনে বলু। বয়সের তুলনায় বড় বেশি লম্বা হয়ে গেছে।

কৌতূহলী কয়েকটা প্রশ্ন ফিসফিস হল। "কে রে লোকটা ?"

"ইন্ডিয়া টিমের ব্লেজার···কোন সাল দেখ তো ?"

"বাবাদেব আমলের।"

"চিনতে পারিস ?...কোন ক্লাবে খেলত ?"

"নাম জিগ্যেস কর না ?...লজ্জা কিসের কর না ?...দাদা, আপনার নামটা বলবেন ?"

"বরুণ চ্যাটার্জি।"

ঈষৎ অবহেলা ভরে সে বলল। কেউ আর কোন প্রশ্ন করল না। সে আড়চোখে দুপাশে তাকিয়ে মুখগুলো লক্ষ্য করল। নির্বিকার। সদ্য দেখা খেলাটি নিয়ে আবার মন্তব্য চলতে লাগল। কেউ তার দিকে আর তাকাল না।

॥ ৪ ॥

স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে প্রায় আধ মাইল হেঁটেও ওরা কোন অটোরিকশা বা ট্যাক্সি পেল না। বাসে উঠল না কেন না বাস কোথায় যে নিয়ে পৌঁছে দেবে সে সম্পর্কে বরুণের ভীতি আছে।

"এখানেই দাঁড়াই।"

"কালও এরকম হয়েছিল। বিকেলে তালকোটরা থেকে ফেরার সময় তো এরকম অসুবিধে হয়নি।"

পর পর দুটো ট্যাক্সি চলে গেল লোক ভরতি হয়ে। এক অটোরিকশাওলা প্রত্যাখ্যান করল তাদের তুলতে।

"চল আর একটু পিছিয়ে গিয়ে মোড়টায় দাঁড়াই।"

রাস্তাটা নির্জন ইতস্তত কিছু পথচারী ছাড়া। শুধু একটি লোক, বোধহয় তাদের মতই, বাহনের জন্য অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পর লোকটি এগিয়ে এসে বলল, "আপনারা কতদূর যাবেন ?"

"জনপথ রোড, হোটেল অলিভ।"

"আহ্, আমি তো কাছেই অশোক যাত্রীনিবাসে, ভালই হল...দেখেছেন ট্রান্সপোর্টের কি দুর্দশা, কুড়ি মিনিট দাঁড়িয়ে।" বলতে বলতে লোকটি বরুণের ব্লেজারের দিকে তাকাচ্ছিল। "আপনি ফিফটি-ফোর এশিয়ান গেমসের। আমি ফিফটি-ওয়ানের সাইক্লিং টিমে স্ট্যান্ড বাই ছিলাম...জিমি দস্তুর।"

হাত বাড়িয়ে দিতেই বরুণ ধরে ঝাঁকাবার সময় লোকটির মুখের দিকে তাকাল। টার্টলনেক ভারী লাল সোয়েটারটা চমৎকার মানিয়েছে গায়ের ফর্সা রঙের সঙ্গে। ঘন ভুরু, মাথার সামনের দিকে টাক। কপালে কাটা দাগ। দস্তুর তারই বয়সী প্রায়।

"এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। কিন্তু..." বলতে বলতেই দস্তুর ছুটল হাত তুলে,

"ট্যাকসিইই, ট্যাকসিইইই..."

ট্যাক্সিটা থেমে গেল। ড্রাইভারের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে দস্তুর ওদের হাত নেড়ে ডাকল। ওরা পৌঁছতেই দরজা খুলে ধরে বলল, "উঠুন, ভাগ্যটা আমাদের ভালই। পাওয়া গেছে তবু।"

পথে এক সময় দস্তুর বলল, "আমি বোম্বাইয়ের লোক, ফুটবল প্রায়ই দেখি, ভাল লাগে।"

"আমি আটবার রোভার্সে খেলেছি, দুবার ফাইনালে।"

"সত্যি! কি নাম আপনার। কোন ক্লাবে খেলেছেন? একি আপনার ছেলে?"

"বরুণ চ্যাটার্জি। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল দুটো ক্লাবেই, ফিফটি থেকে ফিফটি নাইন, হ্যাঁ আমার ছেলে।"

বলু হেসে হাত বাড়িয়ে দিল।

"তাহলে নিশ্চয় আপনার খেলা দেখেছি। আপনার নামটা শুনেছি মনে হচ্ছে, আচ্ছা, আই সি এল-এর সঙ্গে ফিফটি টুয়ে কি খেলেছেন?

"হ্যাঁ।"

"গোল দিয়েছিলেন?"

"তাই বলুন, দারুণ গোল...দারুণ দারুণ! এখনো চোখে ভাসছে...রাইট আউট চিপ করল, আপনি ধরেই দুজনকে ডজ করে কৌণাকুণি শট নিলেন, তা প্রায় কত গজ হবে। টোয়েন্টি? টোয়েন্টি-ফাইভ? তাই কি?"

"ফর্টি ইয়ার্ডস।"

বলু নিঃশ্বাস চেপে অস্ফুটে বলল।

ঘন ভুরুদুটো জুড়ে নিয়ে দস্তুরের চোখে বিভ্রান্তির ছায়া পড়ল।

"ফ...র...টি! তাই কি? গোলে তো সঞ্জীব ছিল!"

"হ্যাঁ ফরটি আমার মনে আছে।"

বরুণ বিনীত নম্রস্বরে তথ্যটি পেশ করল বটে কিন্তু মনে মনে অনিশ্চিত উদ্বেগ নিয়ে।

"তা হবে। কিন্তু দারুণ গোল হয়েছিল। এখনো চোখে ভাসে।"

দস্তুর আগে ওদের নামিয়ে দিতে চাইল। বরুণ আপত্তি জানাল, ট্যাকসি ভাড়া সে দিতে চায়। অবশেষে ঠিক হল দুজনের হোটেলের মাঝামাঝি জায়গায় তারা নামবে, তাহলে দুশো গজের বেশি কাউকেই হাঁটতে হবে না।

"কিন্তু ভাড়া আমি দেব।"

বরুণ জেদ ছাড়েনি। এই প্রথম সে একজনকে পেল যে তার গোলের কথা

মনে রেখে দিয়েছে। লোকটিকে ছাড়তে তার ইচ্ছে করছে না।

"বাবা আমরা তো এখন কাকেদায় খেতে যেতে পারি, ট্যাক্সিটা না ছাড়লেই তো হয়।"

বরুণ তাজ্জব হয়ে গেল। কি আশ্চর্য, এই সহজ সরল সমাধান এতক্ষণ তার মাথায় আসেনি কেন! ফুটবল খেলার দিনগুলোয়, কেউ তো তাকে বলতে পারেনি 'মাথামোটা'। অথচ বলু কেমন বুদ্ধিমানের মত…!

"বাবা, ওঁকেও আমাদের সঙ্গে খেতে বল।"

বলু কানের কাছে মুখ রেখে বলল। বরুণ প্রায় লাফিয়ে উঠল।

ট্যাক্সিওয়ালাকে কনটে প্রেসে যাবার নির্দেশ দিয়ে সে দস্তুরের হাত চেপে ধরল।

"মিস্টার দস্তুর আজ আমাদের সঙ্গে আপনি ডিনার করবেন।…না না প্লিজ, আমার ছেলের অনুরোধ।"

কিন্তু একটা আপত্তি তোলার চেষ্টা করতে গিয়েও বাবা আর ছেলের সাগ্রহ মুখদুটি দেখে দস্তুর হেসে, হতাশভঙ্গিতে মাথা নেড়ে রাজি হয়ে গেল।

"আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম। তবে ট্যাক্সি ভাড়া আমি দেব।"

"সে আপনার খুশি।" বরুণ উদারভাবে অনুমতি দেবার ভঙ্গিতে বলল।

কাকেদা রেস্টুরেন্টে দোতলায় তক্ষুনি একটা টেবিল খালি হয়েছে তাই ওদের আর অপেক্ষা করতে হয়নি।

বরুণ খাবারের মেনুটা দস্তুরের সামনে এগিয়ে ধরল।

"আপনি যা পছন্দ করবেন।"

"আমি খুব ঝাল খাই না। নান আর ডিমের তবকা, রাতে পেটভরে খাওয়ার অভ্যাস নেই।"

বরুণকে অবাক এবং হতাশ দেখাল। সে ভেবেছিল দস্তুরকে চর্ব্যচোষ্য খাইয়ে, রোভার্সে তার গোল দেওয়ার কথাটা মনে রাখার জন্য ঋণ শোধ করবে।

"আপনারা যা খেতে চান খান না, আমি রাতে বেশি খাই না।"

"আমরাও খুব বেশি খাই না। বলু তুই অর্ডার কর।"

মেনু কার্ড পাশে ছেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলল, "প্লেয়ারদের যেমন খাওয়া উচিত তেমনি বল।"

ভেবে চিন্তে বলু যখন পরিবেশককে জিজ্ঞাসা করে করে খাদ্যের ধরন জেনে নিয়ে অর্ডার দিচ্ছিল দস্তুর তখন হাসিমুখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

"আমার ছেলেও ফুটবল খেলে।"

"বটে! আমার এক মেয়ে, সে খেলাধুলো পছন্দ করে না, পিয়ানো শিখছে।"

"ভালই তো, কালচারাল সাইডেই আছে। আপনি ফিফটি ওয়ানের পর আর ইন্ডিয়া টিমে আসেননি?"

দস্তুর মৃদু হাসল। মাথা নেড়ে বলল, "আর তো ইন্ডিয়ান সাইক্লিং টিম কোথাও পাঠানই হয়নি। যখন কম্পিটিটিভ সাইক্লিং ছেড়ে দিয়েছি ইন্ডিয়া তখন টোকিও অলিম্পিকসে টিম পাঠায়। দেশে ভেলোড্রোম নেই তাই তাতে চালানোরও অভ্যাস নেই। সত্তর-আশি ডিগ্রি খাড়াই অ্যাঙ্গেলে রেস করতে প্র্যাকটিস থাকা দরকার, দু-চারদিনে সেটা রপ্ত হয় না। টোকিওয় আমাদের সাইক্লিস্টরা চালাতেই পারেনি, ক্র্যাচড হয়ে যায়।"

"অন্য কোনো স্পোর্টস নিতে পারতেন।" বলু গম্ভীর মুখে বলল। মনে মনে সে খুবই উদ্বিগ্ন। যে সব খাবার আনতে বলল সেগুলো খেতে কেমন হবে জানে না।

"অন্য স্পোর্টস বলতে ফুটবলই আমার প্রিয়।"

"সেটা বুঝতেই পেরেছি, নইলে কবে আমি গোল করেছি, কী ভাবে বলটা ধরেছি, ডজ করেছি, সট নিয়েছি।"

"ফর্টি ইয়ার্ডস থেকে।" বলু নিশ্বাস চেপে বলল।

দস্তুরের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। কি একটা বলতে গিয়েও থেমে শুধু অস্ফুটে বলল, "গোলে তো সঞ্জীব ছিল।"

শুনতে পেয়েছে বরুণ। মুখটা পাংশু হল লহমার জন্য। আড়চোখে বলুর দিকে তাকাল। তার কপালে ভাঁজ।

"মিস্টার দস্তুর আপনি জানেন না ওদের শট কত জোর ছিল। বাঙালি গোলকীপার তা জানে, ম্যানিলায় ওই একটা ম্যাচেই ইন্ডিয়া ফার্স্ট হাফে ওয়ান-নিলে এগিয়ে ছিল। ফরটি ইয়ার্ডস। ওখানকার কাগজের কাটিংটা—বলু তোর মা বোধহয় সেই ফাইনালে চীনের গোলকীপার অদ্ভুতভাবে ড্রাইভ দিয়ে কর্নার করে বাঁচায়, সেটাও থার্টি ফাইভ টু ফর্টি ইয়ার্ড ছিল।"

দস্তুরকে কিঞ্চিৎ কাচুমাচু দেখাল। বরুণ যে তার সামান্য ছোট্ট মন্তব্যে এতটা গুরুত্ব দিয়ে ফেলবে এটা সে ভাবেনি। সঞ্জীবকে গোল দিয়েছিল বরুণ ঠিকই কিন্তু চল্লিশ গজটা হজম করতে হলে বোধবুদ্ধি কিছুটা নামিয়ে আনতে হয়। তাছাড়া এখন সে অতিথি, এমন কিছু বলা উচিত নয় যাতে হোস্ট মনে কষ্ট পেতে পারে।

"আপনার শুটিংয়ের কথা আমি অনেক শুনেছি, বোম্বাইয়ে, কলকাতাতেও।"

"কলকাতায়!" বলু অবাক হল।

উচিত ছিল আর পেল কিনা একটা গাধা।...এ রকমই তো হয়, কত রামাশ্যামা সিলেকটারদের তেল দিয়ে, পা টিপে দিয়ে, বাজার করে দিয়ে অলিম্পিয়ান হয়ে দ্যাখ বুক ফুলিয়ে ব্লেজার পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে...এখানেই কত দেখবি।"

দস্তুরই প্রস্তাব দিল, হেঁটে ফেরা যাক্। নানান গল্প করতে করতে তিনজনে প্রায় নির্জন সংসদ মার্গ ধরে হেঁটে এসে অশোক যাত্রী নিবাসে পৌঁছল। ধন্যবাদ ও শুভরাত্রি জানিয়ে দস্তুর বিদায় নিল। ওরা দু'জন আর একটু হেঁটে নিজেদের হোটেলে পৌঁছল।

॥ ৫ ॥

লাবিতে যা কিছু ভিড় টি ভি সেটটার সামনে, রাত মাত্র দশটা।

"তুই কি এখন বসে দেখবি নাকি?"

"দেখে যাই।"

বলু ভিড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ঘরের চাবি চেয়ে নিয়ে বরুণ লিফটের দিকে যাচ্ছে সেই সময় ভারি গলায় পিছন থেকে তাকে কে ডাকল। সে থমকে ফিরে তাকাল।

"কিরে ব্যাটা, কবে এলি, আজই তোকে দেখলুম লিফট থেকে নামার সময়। তাড়া ছিল বলে ডাকলুম না।"

বরুণ ভূত দেখার মত চোখে শুধু তাকিয়ে আছে। মুখ থেকে রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাশে। হাতের আঙুল থরথর কাঁপছে। আশ্চর্য, শুভেন্দু গুপ্ত এখানে এই সময়।

"তুই?"

"হ্যাঁ আমিই রে। কেন এশিয়ান গেমস দেখতে আসতে পারি না? কেরানীর চাকরি বলে কি দিল্লি আসার পয়সা নেই ভেবেছিস?"

পানের ছোপ পড়া দাঁত বার করে, শীর্ণ লোকটা কাঁচা-পাকা চুলের উপর দিয়ে হাতের তালু বোলাল। কুচকুচে চামড়ায় কমলালেবু রঙের ফুলশার্ট মাথার মধ্যে গজাল বসাচ্ছে। গলার টাইটা বিবর্ণ রঙ চটা। বরুণ চিনতে পারল, এমন টাই তারও আছে তবে সে পরেনি।

"যাচ্ছিস কোথায়, ঘরে? চল একটু বারে গিয়ে বসি, অনেক দিন পর দেখা। কচ্ছিস কি, সেই রঙের কারবার?"

কিছু বলার আগেই শুভেন্দু তার কনুই ধরে টেনে নিয়ে গেল বারের দিকে। একবার সে মুখ ফিরিয়ে দেখল বলু সেটের দিকে একাগ্র তাকিয়ে। সে স্বস্তি

বোধ করল। যাক বলু দেখতে পায়নি।

"এখানে আছিস কোথায় ?" বরুণ জিজ্ঞাসা করল।

"পাঁচশো চব্বিশ নম্বর ঘর।"

অনেক টেবলই খালি। দেয়াল ঘেঁষে একটা টেবলে দু'জনে বসল। বরুণের এখন চিন্তা, কিভাবে এর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। লোকটাকে বারবারই অপছন্দ করে এসেছে। উদ্ধত, ঠোঁট কাটা, লোভী এবং অশিক্ষিত। মদ, গাঁজা কিছুই বাদ যায় না।

"কি খাবি ?" বরুণ ব্যস্ততা দেখাতে হাত ঘড়ি দেখল।

"খাওয়াবি ? ভাবলুম আমিই তোকে খাওয়াব।"

"ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন। হার্টের ট্রাবল।তাছাড়া এইমাত্র ভরপেট খেয়ে আসছি।"

"একটা ছোট পেগ নে। সামনে সাজিয়ে রেখে বসে থাক, নইলে আমার অস্বস্তি হবে।"

ওয়েটারকে দেড় খানা রাম আর সোডা আনতে বলল শুভেন্দু।

"মনে হচ্ছে খেয়ে এসেছিস।"

"সামান্য। দু-চারটে ভক্ত এখনও আছে তো। গুরু বলে ধরে পড়ে, না বলতে পারি না। এই যে হোটেলে রয়েছি, এটাও এক ভক্তের পয়সায়। সখ হয়েছে এশিয়ান গেমস দেখবে। প্লেনে নিয়ে এসেছে, এক সঙ্গেই ঘরে আছি, এক সঙ্গেই ফিরব। অগাধ টাকা, খাবার লোক নেই। সোনা স্মাগলিংয়ের কারবার, কাউকে বলিসনি যেন।"

ওর হাতে যে একটা কোট ঝোলান ছিল এতক্ষণে বরুণের তা খেয়াল হল যখন পাশের চেয়ারে সেটা ঝপাং করে ছুঁড়ে ফেলল। চেয়ার থেকে মেঝেয় পড়ে যেতেই বরুণ তাড়াতাড়ি নিচু হল তোলার জন্য।

ঠিক তার গায়ের ব্লেজারটার মতই একটা ব্লেজার। শুধু বুক পকেটের লেখাটা অন্যরকম। এটা অলিম্পিক ব্লেজার।

"এত অযত্নে রেখেছিস কেন ?" বরুণ ধুলো ঝেড়ে ব্লেজারটা টেবলের ওপর রাখল। চোখে পড়ল একটা বোতাম নেই।

ওয়েটার গ্লাস এবং সোডা টেবলে নামিয়ে রেখে গেল। শুভেন্দু গ্লাসেই সোডা ঢালল।

"চীয়ার্স।"

বরুণ নিজের গ্লাসটা তুলে ধরেই নামিয়ে রাখল।

"যত্নআত্তি কিছুই করি না। ওটা যে এতদিন ঘরে ছিল এটাই জানতুম না।

আসার সময় ছেলে বলল, নিয়ে যাও। তা সঙ্গে নিলুম। ও হরি, এখানে গায়ে দিতে গিয়ে দেখি ঢলঢল করছে। ওই হাতে নিয়েই ঘুরছি। একবার তো ছবি দেখতে পাশে নিয়ে বসেছি, উঠে আসার সময় ভুলেই গেছি। একটা লোক ডেকে আমায় বলতে মনে পড়ল। তোর ওটা তো দিব্যিই গায়ে ফিট হয়ে আছে। শরীরটা খুব যত্নে রেখেছিস।"

শুভেন্দুর স্বরে খেদ বা আনন্দ কিছুই নেই। চোখের চাহনিটা আগের মতই ধূর্তামিতে ভরা। গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে তারিয়ে তারিয়ে। বরুণ বুঝতে পারছে না ওর মনে এখন কি ধরনের মতলব ঘুরছে। ওর খেলার মত ওকেও বোঝা দায়। কোনখান দিয়ে এসে গোলে বল ঢোকাবে ভারতের কোন ডিফেন্স তার হদিশ জানত না।

"ফুটবল দেখলি ?"

"দেখলুম।" নিস্পৃহ স্বরে শুভেন্দু বুঝিয়ে দিল এই আলোচনায় ইচ্ছুক নয়। গ্লাস খালি করে ইশারায় ওয়েটারকে আবার দিতে বলল।

"গোলগুলো কেমন হল ?"

"হল। তুইও নামলে গোল পেতিস। ফোর্থ ক্লাস।"

বরুণের মুখ শুকিয়ে গেল। শুভেন্দু বরাবরই তাকে থার্ড ক্লাস বলত, লোকজনের সামনেও। সে ঘড়ি দেখল।

"অত ঘড়ি দেখছিস কেন আমাকে ভাল লাগছে না, তাই তো ? সঙ্গে কেউ আছে ?"

"ছেলে।" তারপরই মনে পড়ল ঘরের চাবিটা তার কাছেই, বলু হয়ত উপরে গিয়ে করিডোরে অপেক্ষা করে আছে। প্রায় লাফিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। শুভেন্দু চোখ তুলে তাকাল।

"কত নম্বর ঘর ?"

"চারশো পাঁচ। চাবিটা আমার কাছে।" বরুণ চাবি দেখল।

"যাবি ? আর খাওয়াবি না ?"

"নিশ্চয় নিশ্চয় নেনা।" বরুণ দ্রুত হাতনেড়ে ওয়েটারকে ডাকল।

"এ সাবকো ঔর বড়া চারপেগ দে দৌ। ঔর জলদি বিল লে আও।...কিরে আর চারটেতে হবে ?"

"হবে।"

"ব্লেজারটা ফেলে যাসনি যেন।"

শুভেন্দু অবহেলায় ব্লেজারটার দিকে তাকিয়ে বলল, "এটার থাকা আর না থাকা। কি লাভ হল ফুটবল খেলে ? গরুর গাড়ি চালাতে শিখলে বরং কাজ

দিত। ফুটবল তোকে অনেক দিয়েছে। অথচ দেখ তোর থেকে আমি অনেক ভাল খেলতুম। ফিফটি ফোবে হাঁটুতে লাগল, আমি সিলেক্ট হয়েও যেতে পারলুম না, তুই গেলি। সেই ব্রেজার পরে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিস।...শোন্ আমাকে কয়েকটা টাকা দিবি।"

"টাকা।"

"'শ' পাঁচকে।"

"কোথায় পাব ?" বরুণের স্বরে ঝাঁঝ ফুটে উঠল।

"আমার হাঁটুটা তোকে ব্রেজার পরিয়েছে। হাঁটুকে টাকা দিবি।"

বরুণ উত্তর দিল না। ওয়েটারকে বিল মিটিয়ে, বখশিস দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল।

বলু দাঁড়িয়েই ছিল, বাবাকে দেখে শুধু জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"আর বলিস কেন।" চাবি দিয়ে দরজা খুলতে খুলতে বরুণ কৈফিয়ত দেবার স্বরে বলল। "পড়েছিলুম সেই গাধাটার পাল্লায়। কাকেদায় দস্তুর যার কথা বলল...গুপ্তা শুভেন্দু, তার সঙ্গে দেখা। কি অদ্ভুত যোগাযোগ।"

"শুভেন্দু গুপ্ত। তোমাকে আনফিট করিয়ে যাকে অলিম্পিকে পাঠান হয়েছিল ? এখানে কি করছে ?"

"এই হোটেলেই রয়েছে। অলিম্পিকের ব্রেজার গায়ে চড়িয়ে লোককে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, দেখলে হাসি পায়।"

পোশাক বদলে, আলো নিবিয়ে দুজনে শুয়ে পড়ল।

"কাল সকালে কিছু নেই, বিকেলে হকি, তাই তো ?"

"হ্যাঁ।"

কিছুক্ষণ পর বলু অস্ফুটে ডাকল, "বাবা।"

"কি।"

"এশিয়াডের থেকে অলিম্পিক ব্রেজারের সম্মান বেশি, তাই না ?"

বরুণ চুপ করে রইল। বলু আর কথা বলল না।

॥ ৬ ॥

সকালে বরুণ ঘর থেকে বেরল যখন বলু বাথরুমে ছিল। মিনিট কুড়ি পর ফিরে এসে দেখল বলু জুতো পরছে। রুম বয় খালি কাপ-প্লেটগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল।

"বেরচ্ছিস নাকি, এখন আবার কোথায় যাবি ?"

"একটু হেঁটে বেড়াই, মাটির নিচে পালিকা বাজারটা কেমন একবার দেখে আসি। তুমি যাবে ?"

"নাহ্। পেটটা একটু গোলমাল করছে যেন, কাল খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে। টাকা লাগবে ?"

"দাও। একটা বেল্ট কিনব।"

বরুণ একশো টাকার একটা নোট দিল। বলু বেরিয়ে যাবার পর সে একটা ফোন করল। তারপর খবরের কাগজটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

ঘণ্টাখানেক পরে ফোন বেজে উঠল। বরুণ তখন চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে। ধড়মড়িয়ে উঠে ফোন ধরল।

"না এখনো ফেরেনি···আমিই ফোন করে জানিয়ে দেব···হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছি তো।" কথা অসমাপ্ত রেখেই রিসিভার নামিয়ে বিছানায় এসে আবার শুয়ে পড়ল।

ঘরের বেল বাজতেই বরুণের ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে দরজা খুলে দেখল বলু।

"দেরি হল যে ?"

"ডাইভিংয়ের হিটস আর মেয়েদের ভলিবল টিভি-তে দেখাচ্ছে।"

বলুর কোমরে নতুন বেল্ট। সেটা বাবাকে দেখাল। আপ্পু ছাপ দেওয়া একটা স্পোর্টস গেঞ্জিও কিনেছে।

"ভালই কিনেছিস। চান করে নে এবার। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ক'দিন সকাল-সন্ধ্যে যা ধকল যাচ্ছে।"

বলু বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই বরুণ প্রায় ছুটে গিয়ে ফোনটা তুলল।

বাথরুমের দরজা খুলে বলু বেরিয়ে এল। বরুণ তাকে দেখতে পেল না পিছন ফিরে কথা বলায়। চেয়ারেব উপর থেকে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে আবার বাথরুমে ফেরার সময় সে শুনতে পেল "পনেরো মিনিট পরে আয়।"

তোয়ালেতে মাথা ঘষতে ঘষতে বলু বেরিয়ে আসতেই বরুণ ব্যস্ত হয়ে বলল, "চান করে খালি গায়ে থেক না, পট্ করে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

বলু গেঞ্জি পরে চিরুনিটা হাতে তুলে নিয়েছে তখন বেল বেজে উঠল। অবাক হয়ে সে বাবার দিকে তাকাল।

"দেখ তো এখন আবার কে জ্বালাতে এল।" বলু দরজা খুলল।

"বরুণ চ্যাটার্জি কি এখানে···ওহ্ এই যে বরুণ।"

ঢলঢলে পুরান ব্লেজার পরা, কাল রঙের শীর্ণ লোকটি ঘরের মধ্যে চলে এল।

"খবর পেলুম এই হোটেলেই রয়েছ তাই ভাবলুম একটু হ্যালো করে যাই।

কেমন আছ ? এটি কে ছেলে ?”

“হ্যাঁ।” বরুণের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। “আমি এখন চান করতে যাব।”

“বড় প্লেয়ারের মেজাজ দেখছি আজও বদলায়নি। জান খোকা…কি নাম ?”

“বলেন।” শুকনো স্বরে নাম বলে ব্লেজারের দিকে বলু তাকিয়ে রইল। এই লোকটার জন্যই যে বাবা অলিম্পিকসে যেতে পারেনি এটা মনে হতেই তার মন বিরূপ হয়ে উঠেছে।

“জান বলেন শুটিং প্র্যাকটিস করত তোমার বাবা আর আমরা গোলের পেছনে দাঁড়িয়ে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠাতাম। একটু দেরি হলেই গালাগাল। কত লোক দাঁড়িয়ে তোমার বাবার শুটিং দেখত, তিরিশ-চল্লিশ গজ দূর থেকে মারত গোলকীপার ডাইভ দেবার টাইমই পেত না। সঞ্জীবের মত গোলকীপার, সেও কিনা হ্যান্ডস ডাউন বিট হল। জান তো ?”

“জানি রোভার্সে, ফিফটিটুয়ে, তারপরই তো ম্যানিলা গেমসে সেখানেও বার্মাকে গোল দিয়েছিল ফর্টি ইয়ার্ড থেকে।”

“বাহ্ তুমি তো বাবার অনেক খবরই জান।”

শুভেন্দু চেয়ারে বসল। বরুণ তার পিছনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বলুকে ইশারায় জানাল চটপট বিদায় করে দেবার জন্য।

“নিশ্চয়ই জানি। কিভাবে মেলবোর্ন যাওয়া থেকে বঞ্চিত হল তাও জানি।” বলু চোখ ছোট করে হিংস্র চাহনিতে তাকিয়ে রইল। এই লোকটার জন্যই বাবা যেতে পারেনি।

“সত্যিই অত্যন্ত অন্যায় করা হয়েছে ওর উপর। এখন ভাবলে আমার খালি মনে হয় পাপ করেছি, এ পাপের ক্ষমা নেই। একটা যোগ্য লোককে বঞ্চিত করে আমিই বা কি পেলাম ?” শুভেন্দুর গলার স্বরে অনুশোচনা, মাথাটা নত। বরুণ তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।

“কেন ওই ব্লেজারটা !”

শুভেন্দু মুখ তুলে শূন্য দৃষ্টি মেলে বলুর দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে চোখে ফিরে এল গাঢ় দুঃখ, হতাশা আর শ্রান্তি মেশানো অদ্ভুত একটা চাহনি।

“হ্যাঁ, ব্লেজারটা। এটা গায়ে দিলেই মনে হয় অন্যের জিনিস চুরি করে পরেছি। অনেক সময় মনে হয়েছে বরুণকে দিয়ে দি। আবার কেমন লজ্জাও করে। যদি না নেয় ? আমার থেকে কত বড় ফুটবলার সে ছিল। ওর সময়ে ভারতে কেউ বরুণের ধারে কাছে আসতে পারত না। ব্লেজারটার কোন মূল্য নেই আমার কাছে। সিংহের চামড়া গায়ে দেওয়া গাধার গল্পটা জানতো, এটা হল তাই। এটা গায়ে দিয়ে কি বরুণ চ্যাটার্জি হতে পারব ? সিংহ সিংহই, বরুণ

বরুণই ।"

বলুর মুখে শান্ত, প্রসন্নতা ফুটে উঠছে । যে জঙ্গী ভাবটা সারা শরীরে ছড়িয়ে ছিল সেটা মিলিয়ে গিয়ে বন্ধুত্বে ইচ্ছুক সহৃদয় ভঙ্গি এসেছে ।

"আপনি কি চা খাবেন ?"

"না এত বেলায় আব চা নয় । বরুণ তোমাকে কাল বলেছিলুম একবার আসব তাই এলুম । ইচ্ছে করেই ব্লেজার পরে তোমার সামনে এসেছি, যাতে তুমি মনে মনে আমায় ঘৃণা কব, এটাই আমার শাস্তি হবে ।"

"না, না, সেকি ।" এতক্ষণে বরুণ কথা বলল । কি রকম একটা ঘোরের মধ্যে যেন তার সময় কাটছিল । "আমি তোমায় ঘৃণা কবব ভাবলে কেন !"

"পাপেব প্রায়শ্চিত্ত কবতে হয় ।"

"কি বকম ।"

"ব্লেজারটা আমি পুড়িয়ে ফেলব ।"

"য়্যাঁ ।" বলু প্রায় আঁতকে উঠল ।

"এসব পাগলামি আবাব মাথায় ঢুকল কবে ? বরুণ ধমকেই উঠল ।

"কালকেই । তোমার গায়ে ব্লেজার দেখে মনে হল, ওটা তো আমার পবার কথা নয় । সারারাত ঘুম হল না ।"

শুভেন্দু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ব্লেজারটা এক ঝটকায় খুলে ফেলল । উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে । দুটো চোখেব মণি ঠিকরে বেবিয়ে আসবে যেন । এধার ওধাব তাকাল কিছু খুঁজে ।

"দেশলাই আছে ?"

"আপনি বসুন তো ।"

"কি পাগলামি হচ্ছে শুভেন্দু ।"

বরুণ এগিযে এসে হাত থেকে ব্লেজারটা কেড়ে নিল ।

"রাখ, তোমাব কাছেই থাক ।"

উজ্জ্বল হয়ে উঠল শুভেন্দুর মুখ । বিরাট একটা পাথর যেন বুক থেকে নেমে গেছে এমন স্বস্তি ভরে তাকিয়ে থাকল ব্লেজারটার দিকে । অনুনয়ের স্বরে বলল, "রাখবে আমার এই অনুরোধ ?"

দু'গাল বেয়ে জল গড়িয়ে নামল । বরুণের দুটি হাত সে চেপে ধরেছে । বলু তাকাল বাবার দিকে । এখন কি করবে ? লোকটাকে যতটা খারাপ সে ভেবেছিল, দেখছে একদমই তা নয় । খুবই সৎ । ঘটনাটা যদি কলকাতায় বন্ধুদেব কাছে সে করে তাহলে কেউই বিশ্বাস করবে না । রীতিমত নাটকীয় ।

বরুণ বিপন্ন চোখে ছেলেব দিকে তাকিয়ে যেন বলতে চাইল—কি করব রে

এখন ?

"বাবা তুমি রেখে দাও।"

শুভেন্দু কাতর চোখে বরুণ আর বলুর মুখের দিকে বারবার তাকাল।

"আচ্ছা।"

"তুমি একবার পর, আমি দেখি।"

শুভেন্দুর অনুরোধ রাখতেই বিব্রত মুখে বরুণ ব্লেজারটা পরল। চমৎকার ফিট করেছে। আয়নার দিকে তাকিয়ে আপনা থেকেই আত্মপ্রসাদের হাসি তার ঠোঁটে লেগে রইল।

"আমি যাই, আমি যাই।" বলতে বলতে শুভেন্দু ছুটে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

"অদ্ভুত মানুষটা তো...এমন জিনিস কেউ দিয়ে দেয় ?"

হোটেলের রেস্টুরেন্টে খেয়ে এসে দু'জনেই বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। বলু পুরান একটা খেলার ইংরেজি পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল এমন সময় ফোন বেজে উঠল। পাশে তাকিয়ে দেখল বাবা ঘুমোচ্ছে। উঠে ফোন ধরল।

"কিরে ব্যাটা ঘুমোচ্ছিলিস নাকি ? কেমন করলুম বল। আমি তো নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিলুম। শোন্ ও শালা ব্লেজার তুইই রেখে দে বরং আমায় আরো দুশো টাকা দে...হ্যালো, হ্যালো।"

রিসিভারটা রেখে দিয়ে বলু জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল। তার হাঁটুদুটোয় আর জোর নেই, এবার হয়ত সে ভেঙ্গে পড়বে। গলা শুকিয়ে গেছে।

"কার ফোন রে বলু ?"

"রং নাম্বার।"

বাবার পাশ ফিরে শোয়ার শব্দ পেল, বলু চেয়ারে বসে পড়ে দু হাতে মুখ ঢাকল। সে কিছুই আর চিন্তা করতে পারছে না। চিন্তা করতেও চায় না। শুধু একটা কথাই তার মনে ঘুরে ঘুরে বৃত্ত তৈরি করে যাচ্ছে—কার জন্য, কার জন্য বাবা এটা করল ?

ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে হকি খেলা দেখতে যাবার জন্য দু'জনেই তৈরি।

"টিকিট দুটো পকেটে ?...গরম জামা ? ঠিক আছে এবার তাহলে যাওয়া যাক।"

বরুণ দরজার দিকে এগোল।

"বাবা।"

বরুণ ঘুরে দাঁড়াল।

"ব্লেজারটা পর।"

"সে কি ! চেনা লোকেরা যে দেখলে হাসবে। অলিম্পিকেই যাইনি..."

"তারা হাসল তো বয়েই গেল, আমার লাগবে। সুন্দর ফিট করেছে।" বলু খুব উৎসাহে ঝকঝক করে উঠল। "পর পর। উনি তো বলেই গেলেন এটা আসলে তোমারই।"

ব্লেজারটা পরে বরুণ যখন হোটেলের বাইরে এসে অটোরিক্শার জন্য দাঁড়াল তখন বলু উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল, "তোমাকে অলিম্পিয়ানের মতই দেখাচ্ছে।"

পর্দার নীচে একজোড়া পা

বাজার থেকে বেরিয়ে, ট্রামরাস্তা ধরে প্রবীর ষাট-সত্তর মিটার হেঁটেছে, তখনই ঘটল।

তার সামনে, মাত্র দশ হাত দূরত্বে যে লোকটি ঠিক তার মতই বাজারের থলি হাতে, সবুজ লুঙ্গি এবং সাদা পাঞ্জাবি পরে মথাটা বাঁ ধারে হেলিয়ে হাঁটছিল, তাকে আচমকা চারটি ছেলে প্রবীরের পিছন থেকে এগিয়ে এসে ঘিরে ধরল। প্রায় দু হাত লম্বা মোটা একটা লোহার রড দিয়ে একজন লোকটির মাথার পিছনে মারল। ভোঁতা একটা শব্দ হল। মাথা ঘুরিয়ে লোকটি তাকাতেই প্রবীর ওর চোখে এমন এক ধরনের বিস্ময় দেখতে পেল যেটা তার একবছর বয়সী ছেলে বুবাই-এর চোখে ফুটে ওঠে, হাত থেকে বিস্কুট বা খেলনা কেড়ে নিলে।

লোকটির হাত থেকে থলিটা পড়ে গেল এবং দুহাত বাড়িয়ে প্রবীরের দিকে তাকাল। রড হাতে ছেলেটি বিরক্ত-উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে প্রবীরকে বলল, "হাঁটুন, হাঁটুন।" বুকফাটা একটা মরিয়া চিৎকার করে লোকটি প্রবীরের দিকে ছুটে আসতে গেল। চারজনের একজন ওর পাঞ্জাবি টেনে ধরে অতি দ্রুত পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দিল। প্রবীরের হতভম্ব ভাবটা সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল এবং দেখল জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছে। তখন সে রাস্তার অন্যান্য লোকেদের মত উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।

কিছুদূর গিয়েই অবশ্য প্রবীর থেমে গেল। পিছনে তাকিয়ে দেখল লোকটি উপুড় হয়ে পড়ে। বাঁ হাতটা মুচড়ে বুকের নিচে, ডান হাতটা ট্রাফিক পুলিশের হাতের মত প্রসারিত। বুবাই কখন কখন এইভাবে ঘুমোয়। তখন সে সন্তর্পণে চিত করে দেয়। বুবাই-এর জন্য বিস্কুট কেনার কথা মনে পড়ে যেতেই প্রবীর নিকটবর্তী দোকানটিতে ঢুকল। সেই সময় দোকানীর সঙ্গে তার নিম্নোক্ত কথা হল :

"কি কাণ্ডটা হল দেখলেন, একেবারে চোখের সামনে ঘটে গেল!"

"আমার দোকানের সামনে দিয়েই তো ছেলেগুলো গেল। এখন পুলিশ এসে আর কি করবে। এ পর্যন্ত একজনকেও তো হাতেনাতে ধরতে পারল না।"

"ওদের সাহস কিরকম দেখেছেন ?"

"যারা মার্ডার করল ?"

"হ্যাঁ। এতবড় একটা রাস্তায়, সকাল সাড়ে আটটায়, এত লোকজনের মধ্যে কি অবলীলায় যে কাজ সেরে বেরিয়ে গেল !"

"আপনি খুব কাছ থেকে দেখতে পেলেন।" ক্ষুণ্ণস্বরে দোকানী বলল।

"রডটা মারল যে, তাকে তো খুব ভাল করেই দেখলুম। বেশ বড়ঘরের ছেলে বলেই মনে হল। কি টকটকে গায়ের রঙ, কি টানা টানা চোখ ! স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতুম না অমন ফুটফুটে চেহারাব ছেলে অতজোরে রড চালাতে পারে।"

"পাবলিককে ভয় খাওয়াতে বোমাটোমা চালাযনি, এই যা রক্ষে। তাহলে ঝাঁপ ফেলে দিতে হত। সকালের এই সময়টা বন্ধ গেলে বড় লোকসান যায়।"

প্রবীর বাড়িতে ফিরেই, রান্নাঘরে থলিটা রাখতে রাখতে ঘটনার কথা বলল। শোনামাত্র ওর মা 'আহা' বলে উঠল। অফিসের রান্নার দেরি হয়ে গেছে ; থলি থেকে মেঝেয় আনাজ ঢেলে, বঁটিটা পেতে চেঁচিয়ে বলল, "বৌমা মাছটা তাড়াতাড়ি কুটে দাও।" তারপব প্রবীরের সঙ্গে তার নিম্নোক্ত কথাবার্তা হল :

"কি কাণ্ড, ওম্মা ! বাজার করে ফিরছে একটা লোক আর অমনি তাকে মেরে ফেলল !"

"হয়ত কোন কারণ আছে।"

"তাহলে তো লোকটা নিজেও জানত ; তাহলে নিশ্চয় অমন আগলা হয়ে রাস্তায় বেরুত না।"

"কখন যে কাকে মারবে, তা-কি কেউ জানে ! হয়ত লোকটা জানত না সে এমন কিছু কবে ফেলেছে যেটা ওদের কাছে অপরাধ।"

"য়্যাঁ, জানত না ?"

"হয়ত করেছে।"

"তাহলে লোকে বুঝবে কি কবে কোন কাজটা করলে খুন হতে হবে ? একি জ্বালারে বাবা !"

"কি জানি। সব থেকে ভাল বোধহয় কোন কিছু না করা।"

"লোকজনের সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া করিসনি বাপু, তোর যা মাথা গরম আর অফিস থেকে সকাল-সকাল ফিরিস।"

এরপর প্রবীর বুবাইকে কিছুক্ষণ আদর করল। তার মধ্যে একবার ওর স্ত্রী ঘরে আসতেই সে বলল, "আজ দারুণ বেঁচে গেছি। ঠিক এক হাত সামনে, এইভাবে"—প্রবীর উঠে দাঁড়িয়ে একটি কাল্পনিক রড ঘাড়ের উপর তুলল। ওর

ী শিউরে উঠে চোখ বুজে বলল, "থাক্ থাক্ !"

তখন ওদের নিম্নোক্ত কথা হল :

"রডটা তোলার সময় তোমার চোখেমুখে খোঁচা লেগে যেতে পারত।"

"তাতো লাগতই যদিনা চট্ করে পিছিয়ে যেতুম।"

"লোকটার মত তুমিও তো লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরেছিলে, যদি ওরা ভুল রত !"

"যাকে মারে, তাকে কি আগে ভাল করে দেখে নেয় না ভেবেছ ?"

"তবু, ভুল কি আর হতে পারে না। তুমি কিন্তু কাল থেকে আর লুঙ্গি পরে রতে পারবে না।"

"প্যাণ্ট কি ধুতিপরা লোক কি খুন হয়নি ?"

স্ত্রী রাগ দেখিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বুবাইকে নিয়ে। স্নান সেরে বাবার ঙ্গে খেতে বসল প্রবীর। দুজনে এক সঙ্গেই অফিসে বেরবে। একই অফিস বে দুজনের ডিপার্টমেণ্ট আলাদা। খেতে খেতে দুজনের মধ্যে নিম্নোক্ত কথা ল :

"একটু সাবধানে লোকজনের সঙ্গে কথা বলবি। কোন রকম পলিটিক্যাল থার মধ্যে থাকবি না।"

"আমি তো কখন ওসব আলোচনার মধ্যে থাকি না।"

"লোকটার বয়স কত মনে হল ?"

"আমার থেকে বছর দশেকের বড় হবে।"

"পুলিশের লোক হয়ত। তোর এক সার্জেণ্ট বন্ধু আছে না ? তার সঙ্গে এখন ার দেখাটেখা করিসনি। আর বৌমা বলছিল প্যাণ্ট-শার্ট পরে বাজারে যেতে। ামার অবশ্য মনে হয় না তাতে নিরাপত্তা কিছু বাড়বে, তবে বলছে যখন। ভাল খা ওরা ক'জন ছিল ?"

"মনে হল চারজন।"

"চারজন আচমকা অ্যাটাক করলে একটা লোক কীই-বা করতে পারে। তবে াস্তায় আশেপাশের লোকেদের দিকে নজর রাখবি।"

অফিসে পৌঁছেই প্রবীর উসখুস করতে লাগল ঘটনাটার কথা সহকর্মীদের ানাতে। একসময় সে পাশের টেবলের লোকটিকে বলল, "জানেন দাদা, আজ ীষণ বাঁচা বেঁচে গেছি। তিন হাত দূরে ঠিক আমার সামনের লোকটাকেই খুন বল চারটে ছেলে রড আর ছোরা দিয়ে ; ওপেন রাস্তায় একশো লোকের মনে। একটুর জন্য বেঁচে গেছি, লোকটার আর আমার পরনে একই লুঙ্গি

"সে কি, দারুণ সেভড় হয়েছেন ! শুনছেন, প্রবীরবাবু আজ খুন হতে হ
বেঁচে গেছেন।" লোকটি চেঁচিয়ে অন্যান্য টেবলকে শোনাল। সঙ্গে সঙ্গে কা
বন্ধ হয়ে গেল। প্রবীরকে সাত আটজন ঘিরে দাঁড়াল। তখন ওদের মধ
নিম্নোক্ত কথাবার্তা হল :

"একস্যাক্টলি ঠিক কোনখানে রডটা মারল ?"

"ঠিক এইখানে ! মার খেয়েই লোকটা তাকাল পিছনে। তখন আমার স
চোখাচোখি হল। শরীরটা তখন কিবকম যে করে উঠল কি বলব। একটা বয়
সুস্থ জ্যান্ত লোক মারা যাবার কয়েক সেকেণ্ড আগে যে ওভাবে বাচ্চা ছেলের ম
তাকাতে পারে ভাবাই যায় না।"

"কটা স্ট্যাব করল ?"

"সাত-আটটা।"

"গলার নলি কাটল না ?"

"অতটা আব দেখিনি, বোধহয় কেটেছে, কাল কাগজে জানা যাবে।

"কোনরকম শব্দটব্দ করেনি লোকটা ?"

"একবার যেন আঃ বলে উঠল।"

"আবে মশাই আপনাবাও যেমন, গলা দিয়ে শব্দ বার করার সময় কি আ
ওরা দেয়। এক সেকেণ্ডেই খতম। ছেলেগুলো তাবপব কি করল, ছু
পালাল ?"

"ছুটেছিল, তবে খুব জোবে নয়। অনেকটা বরং হনহন করে।"

"ওরা দেখতে কেমন ? শুনেছি রুমাল দিয়ে মুখ বেঁধে বাখে যাতে না কে
আইডেণ্টিফাই করতে পাবে।"

"আপনি আবার দেখলে চিনতে পারবেন ?"

"একজনকে তো পারবই। খুব ফবসা, টানাটানা চোখ চেহারাটা পাতলা।

"প্রবীরবাবু আপনি একটু সাবধানে থাকবেন

"যাঁ ! আমিতো কিছু করিনি।"

"আপনি প্রধান সাক্ষী, স্বচক্ষে খুব কাছে থেকে দেখেছেন, ওদের একজনকে
চিনতে পারবেন, বলছেন। আপনি তো ওদের কাছে বিপজ্জনক।"

"কি যে বলেন, ওরাও কি আমায় চিনে বসে আছে নাকি। রাস্তায় তখ
আমাব মত আবো কত লোক ছিল, তাবাও তো দেখেছে। তাই বলে কি
সবাইকে ওরা খুন করবে ?"

"আপনি সব থেকে কাছে ছিলেন তো।"

ওরা যে যার টেবলে চলে যাবার পর প্রবীর অনেকক্ষণ ভাবল। ভেবে ভে

সে বুঝে উঠতে পারল না কেন সে খুন হতে পারে। ক্রমশ তার মাথাটা ভার হয়ে উঠছে, জ্বরো ভাব লাগছে। ছুটি নিয়ে সে বাড়ি এল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কৈফিয়ত হিসাবে বউকে বলল, সকালের ঘটনার জন্য মনটা বিশ্রী লাগছে। বউ তখন ইভনিং শো-য়ে সিনেমা দেখার প্রস্তাব দিতেই প্রবীর রাজি হয়ে গেল। সিনেমা যাবার পথে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে সে বলল, "ঠিক এইখানটায়ই ঘটেছে আজ সকালে।" বউ হ্যাঁচকা টান দিয়ে প্রবীরকে সরিয়ে এনে বলল, "এমনভাবে দাঁড়ালে যেন—উঃ কি যে ভয় করে উঠেছিল।" তারপর হাঁটতে হাঁটতে বলল, "বাড়ি ফিরে জুতোটা ধুয়ে নেবে।"

হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে, নায়কের অভিনয়ের নানান গুণের এবং নায়িকার দেহ-সৌন্দর্যের দু-চারটি ত্রুটির কথা বলতে বলতে বউ হঠাৎ খাপছাড়াভাবে প্রবীরকে প্রশ্ন করল, "তখন থেকে তুমি বার বার ফিরে তাকাচ্ছ কেন বল তো?"

"কই তাকাচ্ছি!" প্রবীর অপ্রতিভ হয়ে বলল।

"অন্তত বার দশ দেখলুম।"

"মনে হল যেন চেনা কেউ আসছে।"

"কই কাউকে তো দেখছি না!"

প্রবীর আর জবাব দিল না। সিগারেট ধরাল এবং ঘন ঘন টান দিয়ে বাড়ি পৌঁছবার আগেই শেষ করে ফেলল। বুবাই ঘুমোচ্ছিল। তাকে তুলে সে কিছুক্ষণ আদর করল। কটা দাঁত উঠেছে গুনল। অবিলম্বে ওকে ট্রিপল অ্যাণ্টিজেন দেওয়া সম্পর্কে বউ-এর সঙ্গে কথা বলল। মা এসে জানাল, বুবাই অত্যন্ত দুষ্টু হয়েছে, চোখের আড়াল করলেই হামা দিয়ে পালায়। সন্ধ্যার সময় ছাদে উঠে গেছল। পাঁচিলের ঘুলঘুলিগুলো দিয়ে ওর মাথা গলে যায়। দুদিন আগেও বুবাই আধখানা বেরিয়ে গেছল। যদি না বৌমা ছুটে গিয়ে ধরত তাহলে কি যে হত, ভাবলে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কালকেই যেন মিস্ত্রি ডেকে ঘুলঘুলিগুলো বুজিয়ে ফেলা হয়।

অনেক রাত পর্যন্ত প্রবীরের ঘুম এল না। কেন যে সে রাস্তায় বারবার পিছু ফিরে তাকিয়েছিল, ভেবে ভেবে তার কারণ খুঁজতে লাগল। আততায়ীর ভয়ে? কিন্তু আমাকে খুন করবে কেন, কি অপরাধ করেছি? কোনদিন রাজনীতি করিনি। শুধু স্কুলে পড়ার সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘে কিছু দিন প্যারেড করেছি। তখন জানতুমই না ওটা একটা সাম্প্রদায়িক সংগঠন। না জেনে এমন কাজ কতই তো করি, কত কথাই তো বলি। কাজলকে তো বলেছিলুম ওকে বিয়ে করব নয়ত সায়নাইড খাব। ও বলেছিল আমাকে না পেলে গলায় দড়ি দেবে। কাজল গত মাসেও বাপের বাড়ি এসেছিল তিন ছেলেকে নিয়ে. রাস্তায়

দেখা হতে দুজনেই হাসলুম। একটুও তো অপরাধী মনে হয়নি নিজেকে ওকে। এমনতো হামেশাই হয়। ইকনমিক্স পরীক্ষায় শুধু একটা প্রশ্নের উত্ত টুকেছিলুম। কিন্তু তার জন্যেই বি· এ· পাস করেছি এমন কথা নয়। না টুকলে পাস করতুম, তবে কয়েকটা নম্বরই শুধু কম হত। কিন্তু ডিগ্রিটা সেজন্য চু করে নিয়েছি বলা যায় না। চাকরিটাও বলা যায় না যে অযথা পেয়েছি সবাইয়েরই রোজগার দরকার, আমারও দরকার। বাবা যদি ভেতর থে ম্যানেজ করে দেয়, তাতে অপরাধটা কোথায়? আর একজন চাকরিটা পে আমিও তো বঞ্চিত হতুম।

প্রবীর অনেক ভেবেও আর কোন অপরাধ খুঁজে পেল না। ট্রাম-বাসে ভা না দিয়ে অনেকবারই কণ্ডাক্টরকে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছে, দিয়েছে। কিন্তু সেটা অপরাধের মধ্যে গণ্য করবে কিনা তাই নিয়ে একটুখানি ভাবল। এতই তুচ্ছ, মা কয়েকটা পয়সার ব্যাপার। লক্ষ লক্ষ টাকা ফাঁকি দিচ্ছে কত লোক! এই সেদিন খবরের কাগজে লিস্ট বেরিয়েছিল কারা কারা ইনকাম ট্যাক্স দেয়নি প্রবীর ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে নিজের চুল মুঠিতে চেপে ধরল। তাইতে কনুয়ে ধাক্কা লাগল বউয়ের কাঁধে। 'উঁউঁ' বলে বউ পাশ ফিরে ওকে জড়িয়ে ধরল প্রবীর বিরক্ত হয়ে হাতটা সরিয়ে দিয়ে আবার তার চিন্তায় প্রবেশ করল। কি এর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কী? আমি সকলের সঙ্গে মিছিলে গেছি, ইউনিয় যখনি ম্যানেজারের ঘরের সামনে অ্যাজিটেশন করার ডাক দিয়েছে সবায়ের স সীট ছেড়ে উঠে গেছি! কয়েক টাকা মাইনে যদি বাড়ে, তাহলে যাব না কেন হরিদাস গুহ, কমল পোদ্দারও তো যায়। একবার মিছিল থেকে সটকে ওদে সঙ্গে সিনেমায় গেছলুম, কিন্তু তাইতে জমায়েতের এক বিন্দুও কমেনি। পনের পয়সা বাস ভাড়া ফাঁকি দেওয়াতে নিশ্চয় গভরমেণ্ট ভিখিরি হয়ে যায়নি। অথ যারা দেশকে ভিখিরি করছে সেই সব কালোবাজারী, ট্যাক্স ফাঁকি দেও শয়তানগুলো—।

প্রবীর কিছুক্ষণ উত্তেজিত অবস্থায় থেকে ধীরে ধীরে ক্রমশ নিস্তেজ পড়তে লাগল। মাথা ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে তাকাল একবার। সামনের বাড়ি দেওয়ালে বহুদিন আগে লেখা আলকাতরার অক্ষরগুলো বিবর্ণ হয়ে গেছে মাথা তুলে সে পড়ার চেষ্টা করল: 'চলছে, চল—' এইটুকু মাত্র দেখেই মনে পড়ল, এর আগেই লেখা আছে, 'খতম'। তার উপর আছে, 'খতম মানে খুন নয়। ঘৃণার চরম প্রকাশ।'

হঠাৎ তার মনে হল বারান্দায় কার যেন পায়ের শব্দ হচ্ছে। দরজার পর্দা চৌকাঠ থেকে এক হাত উপরে ঝুলছে। পর্দার নিচে আবছা মেঝেটার দিয়ে

:কদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল, একজোড়া পা দেখতে পাবে।
বর্ণ চামড়া, মোটা মোটা দশটা আঙুল, শিরাবহুল থ্যাবড়া পাতা আর ভারি
গোছ। নিঃশব্দে এসে পর্দার পিছনে পা জোড়া অপেক্ষা করে থাকবে।

প্রবীরের কপালে ঘাম ফুটল। শরীর থেকে লেপটা ফেলে দেবার জন্য হাতটা
তুলেও নামিয়ে নিল। বাইরে কি আবার শব্দ হল? অত্যন্ত মনোযোগে শুনতে
গিয়ে সে গুম গুম একটা ভয়াবহ শব্দ শুনল। ড্রাম বাজাতে বাজাতে তালে
তালে পা ফেলে কেউ যেন এগিয়ে আসছে। প্রবীর একদৃষ্টে পর্দার নিচের
ফাঁকটুকুতে তাকিয়ে বলল, "আমার বুকের মধ্যেই এটা হার্ট বিটের শব্দ, এতে
ভয় পাবার কি আছে!" এবং সকাতর প্রশ্ন করল নিজের কাছেই, "আমি কি
অপরাধ করেছি যে জন্য ঘৃণার চরম প্রকাশ আমার উপর ঘটবে?" কোন জবাব
পেতে না পেরে গভীর অসহায়তার মধ্যে ডুবতে ডুবতে শেষ অবলম্বনটি আঁকড়ে
ধরার মত সে বলল, "আমি তো কিছুই করিনি, তবে!"

প্রবীর পরদিন খবরের কাগজে চার লাইনে ছাপা বিবরণ থেকে জানল,
একজন যুবক এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে পালিয়ে যায় এবং জোর
পুলিশী তদন্ত চলছে। নিহত ব্যক্তি একজন পুলিশ কর্মচারী। প্রবীর আরো দুটি
খবরের কাগজ থেকে জানল, দিবালোকে, জনাকীর্ণ রাজপথে, নৃশংসভাবে
সমাধিত এই হত্যাকাণ্ডে এলাকার লোক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

বাজারে যাওয়ার পথে প্রবীর কয়েকবার পিছু ফিরে তাকাল। পিছন থেকে
একটি ছেলে আসছে। প্রবীর মন্থর হয়ে লক্ষ্য করল ছেলেটিও মন্থর হয় কিনা।
ছেলেটি অতিক্রম করে যাওয়ার পরই তার মনে হল, এইরকম ভয় তো ক্রমশই
আমাকে পাগল করে দেবে, এর হাত থেকে মুক্তি পেতেই হবে। এরপর সেই
জায়গাটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে আড়চোখে তাকাল। কাল সকাল থেকে
হাজার হাজার লোকের যাতায়াতে ঘটনাটা মুছে গেছে। প্রবীর ভাবল, আমার
ভয়টাও যদি এত সহজে মুছে যেত!

বাজার থেকে ফেরার সময় প্রবীরের মনে হল, কালকের চারজনের
একজনকে সে যেন পাশের গলিতে ঢুকতে দেখল এবং সামনে থেকে আসা আর
একটি ছেলেকে দেখেও যখন তার এই রকমই মনে হল তখন সে বুঝতে পারল,
ইতিমধ্যে একটা গণ্ডগোল ঘটে গেছে।

অফিসে বেরবার সময় বউ ওকে আর একবার ছাদের ঘুলঘুলিগুলো বন্ধ
করার কথা মনে করিয়ে দিল। অফিসে এক সহকর্মী ওকে বলল, "কাগজে
পড়লুম। এসব ঘটনা ডিটেলে লিখতে হয়। কি যে পলিসি কাগজগুলোর বুঝি

আর একজন বলল, "ডিটেলে না লিখে ভালই করেছে। নইলে প্রবীরবা
ইনভলভড় হয়ে যেতেন। ওর সামনেই তো ঘটেছে, সুতরাং রিপোর্টার ও
করতই। পেপারে নাম বেরিয়ে গেলে—"

"তা কেন! 'জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন', এইভাবে কাগজে লেখা হত
প্রবীরের সেফটি কাগজওলারা নিশ্চয় দেখত।"

"কিন্তু ওরা তো ঠিকই বুঝতে পারত প্রত্যক্ষদর্শীটি কে। প্রবীরবাবু, একজ
আপনার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল না?

"আরে মশাই অত ভয় করলে চলে না। প্রবীর কোথায় থাকে না-থাকে তা
ওরা জেনে বসে আছে?"

"রোজ বাজার করেন, দু-চারদিন ওয়াচ করলেই তো জানা যাবে

ইতিমধ্যে আরো দুজন এসে আলোচনায় যোগ দিল। তাদের একজন বল
"কিন্তু প্রবীরদা যদি প্রেসম্যানকে ভিভিড বর্ণনা দিতেনই, তা থেকে
কাল্‌প্রিটদের বার করা সম্ভব হতো? একদমই না। ধরে নিচ্ছি ওরা প্রবীরদা
নাড়ি নক্ষত্রই জানে, তাহলেও বাজি ধরে বলতে পারি ওরা এই নিয়ে মা
ঘামাবে না।"

"দ্যাখ, বাজিটাজি ধরার কথা তুমি অন্তত তুলো না। গত বছর দশ টা
বাজি ধরেছিল, নঈম ইস্টবেঙ্গলে যাবে না। সে টাকা আজও দাওনি। তু
যেটা বাজি ধর তার উল্টাটাই তো ঘটে। বলছ মাথা ঘামাবে না, অথচ দ্যাখ
তারা হয়ত প্রবীরের জন্যই বসে আছে। না, না, আমি কথার কথাই বলছি। কি
মনে করলে না তো?"

"আরে আজকাল এইসব কথায় কি কেউ মনে করে নাকি। আমিই যে আ
পেটে ছুরি খাব না, কে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারে, তাই না প্রবীরবাবু

"অকারণে আপনারা প্রবীরদাকে ভয় খাওয়াচ্ছেন। উনি তো কিছু
করেননি।"

প্রবীর এতক্ষণ নিশ্চল হয়ে শুনে যাচ্ছিল। এই বার সে মনে মনে বল
আমি তো কিছুই করিনি, তাহলে ভয় পাই কেন! কেউ তো খতম করবে বলেনি
তাহলে ভয় পাই কেন! আমি তো সব কিছুই মেনে চলি, কখনো কিছু
অস্বীকাব করি না, তাহলে তো আমার অপরাধ হবার কথাও নয়

ছুটির পর অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়েই প্রবীরের মনে হল বা
স্টপে সেই গৌরবর্ণ, টানাটানা চোখ ছেলেটি দাঁড়িয়ে, যাকে লোহার রড
মারতে দেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল এই ভেবে, একটা কি
গণ্ডগোল হয়েছেই নয়ত কাউকে দেখলেই এমন মনে হবে কেন। মুখ ফিরি

সে আনমনে রাস্তার অপর পারে তাকিয়ে রইল। পিঠে বোঁচকা দুজন বিদেশী হিপি রাস্তা পার হচ্ছে। সোনালী এলো চুল, সবুজ লুঙ্গি ও শার্ট পরা মেয়েটিকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করতে করতে প্রবীরের নজর পড়ল বাস স্টপে এবং কিছুক্ষণ গভীরভাবে তাকিয়ে থেকে সে বুঝতে পারল গণ্ডগোলজনিত ভ্রম হয়নি। দ্রুত পায়ে ছেলেটির কাছে এসে চাপাস্বরে সে বলল, "আমি কাল তোমায় দেখেছি, কাল তুমি একজনকে খুন করেছ।"

"তাই নাকি।" ছেলেটি একদম বিস্মিত হল না।

"আমি তোমায় ধরিয়ে দেব না।"

"ভাল কথা।" ছেলেটি নিরুত্তেজিত স্বরে বলল।

"কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি, মনে হচ্ছে আমায় তোমরা খতম করবে। কিন্তু আমি তো ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছি না চরম ঘৃণা পাবার মত কি করেছি?"

"চরম ঘৃণাটা কি জিনিস?" ছেলেটি ডান হাত তুলে কররেখা পরীক্ষায় মন দিল।

"এমন একটা জিনিস যেটা, খুব রেগে গেলে মানুষেই শুধু প্রকাশ করতে পারে। বুকের মধ্যে তখন গনগনে উনুন জ্বলে। 'উনুনটা' বুক থেকে ছুঁড়ে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে

"আপনি কাউকে রাগিয়েছেন কি?" ছেলেটি যেন হতাশ হয়েই হাতটা নামিয়ে রাখল।

"তোমরা কি রাগনি? আমি যে দেখে ফেলেছি!"

"তা তো দেখবেনই। দিনের বেলা, বড় রাস্তায় আপনার মত আরো কত লোকই তো দেখেছে।" বাস আসছে। ছেলেটি রাস্তায় নামল।

"আমি কি তবে চরম ঘৃণা পাবার মত কিছু করিনি?"

"মানুষ যখন নিজেকে ঘৃণা করে, তার থেকে চরম আর কিছু হতে পারে না। আপনি কি নিজেকে—" এই বলে ছেলেটি বাসের দিকে এগোল।

"তেমন কাজ করিনি।"

"তাহলে—" বাসে উঠে চলে যেতে যেতে ছেলেটি বলল।

শোনামাত্র প্রবীর উৎফুল্ল বোধ করল। বাড়ি ফিরে বুবাইয়ের সঙ্গে খেলা করল। বউয়ের নিষেধ অগ্রাহ্য করে লুঙ্গি পরে বাজারে গেল, মাংস কিনতে। বিস্কুটের দোকানে ঢুকে বলল, "আর কিছু হয়-টয়নিতো।" রাত্রে খাওয়ার সময় বাবা-মা-বৌকে বাস স্টপের সাক্ষাৎকারের বিবরণ শুনিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করল এবং নিম্নস্বরে বলল, "ফাইন ছেলে। পড়াশুনো আছে মনে হল। এমনভাবে কথা বলল অ্যাজ ইফ আমি যেন ওর ফ্রেণ্ড

খাওয়াটা বেশি মাত্রায় হওয়ায় জোয়ানের আরক খেয়ে ছাদে ধীর পায়চারি করতে করতে খবরের কাগজে ছাপার জন্য একটা চিঠির খসড়া করে ফেলল। খুনের বর্ণনাটা দিয়ে শেষে একটা প্রশ্ন থাকবে, 'কতদিন আর চোখের সামনে এইসব ঘটনা ঘটবে ?' কিন্তু বাক্যটি শেষ পর্যন্ত মনঃপূত হল না। ছাদটায় বারছয়েক পাক দিয়ে সে স্থির করল—'জামার রক্তের ছিটে লাগিয়ে আমাদের বাড়ি ফেরা কবে বন্ধ হবে ?' এই কথা দিয়ে শেষ করবে। তারপর—প্রবীর এইবার সত্যই ফাঁপরে পড়ল ; 'জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী' না নিজের নাম ? পক্ষে-বিপক্ষে নানারকম যুক্তি দিয়ে অবশেষে একটা রফা করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল—নামটা না দেওয়া খুবই কাপুরুষের মত কাজ হবে তবে, কিছুই বলা যায় না, বাবা, মা, বউ আর বুবাইয়ের কথাটাও ভাবা দরকার, ঠিকানাটা বরং একটা ফল্‌স দেয়াই ভাল। তারপর ছাদ থেকে উঁকি দিয়ে দোতলার শোবার ঘরে তাকিয়ে দেখল, বউ ক্রীম ঘষছে গলায়-ঘাড়ে। প্রবীর তখন সখেদে ভাবল খাওয়াটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে, পেটে চাপ পড়লে বমি হয়ে যাবে না তো।

বস্তুত রাতটা প্রবীরের খুব ভালই কাটল। বমি হয়নি এবং পর্দার নিচে দুটি পা দেখতে পাবে, এমন চিন্তায় একবারও কাতর হল না। সকালে গভীর নিরুপদ্রব ঘুম থেকে বউ ওকে জাগিয়ে তুলল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, "কি বাঁচান বেঁচে গেছ যে ! আজ কাগজে দ্যাখ, কি খবর বেরিয়েছে।"

কাগজটা প্রবীরের হাতে দিয়ে বাবা বলল, "বৌমা, প্রবীরের কোষ্ঠীটা বার করতে বল তো।" প্রবীরের মা ছুটে এসে বলল, "সত্যনারায়ণ করব।" আর প্রবীর খবরটা পড়ে ফ্যালফ্যাল করে ওদের দিকে তাকাল। খবরে আছে : এক পুলিশ অফিসার বাজার করে ফিরছিল। কয়েকটি ছেলে অতর্কিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুরি মারে। খুব কাছেই অমূল্য বাচা নামে একজন লোক দাঁড়িয়েছিলেন। এই দৃশ্য দেখেই তিনি বাধা দিতে এগিয়ে আসেন এবং একটি ছেলেকে জাপটে ধরেন। ছেলেটি ওঁর পেটে ছুরি বসিয়ে দেয় ফলে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। অমূল্য বাচা খুবই দরিদ্র, রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন, চারটি বাচ্চা ছেলেমেয়ের বাবা। পুলিশটি অবশ্য গুলি করে ছেলেটিকে মেরে ফেলে।

প্রবীর অফিসে পৌঁছতেই সহকর্মীরা ছুটে এসে তারিফভরা চোখে ওকে দেখতে লাগল। একজন বলল, "আজ কাগজে খবরটা পড়ে আপনার কথাই প্রথমে মনে পড়ল। অদ্ভুত রিস্ট্রেইনিং পাওয়ার দেখিয়েছেন মশাই। নয়ত অমূল্য বাচার মত কাজ করে ফেলতেন।"

"লোকটা কেন যে এমন বোকামি করল।" আর একজন বলল।

"সম্ভবত খুব আবেগপ্রবণ ছিল। আমাদের নিয়ে এই এক মুশকিল, কিছু

একটা ঘটতে দেখলেই অমনি ঝাঁপিয়ে পড়া।" আর একজন বলল।

"প্রবীরকে দেখলে কিন্তু মনে হয় না ওর কমনসেন্স এত স্ট্রং।" আর একজন বলল।

"আমাদের মনে হয় একটা ফাণ্ড করা উচিত। লোকটা গরিব রাজমিস্ত্রী ছিল। বউ আর চারটে বাচ্চা আছে তো।" আর একজন বলল।

"নিশ্চয় করা উচিত। তবে আজ আমাদের ফিশ ফ্রাই না খাওয়ালে কিন্তু প্রবীরকে খতম করে দেওয়া হবে।" আর একজন বলল।

সকলের কথা শুনে প্রবীর আস্তে আস্তে হেসে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ঘুলঘুলিগুলো বন্ধ করার জন্য কালই একজন রাজমিস্ত্রী ডাকতে হবে। বুবাই বড় দুরন্ত হয়ে উঠেছে।

রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল প্রবীরের। তার মনে হল, বারান্দায় কার যেন পায়ের শব্দ হচ্ছে। পর্দার নিচে চোখ রেখে সে নিথর হয়ে হৃদস্পন্দনের প্রতিটি ভয়ঙ্কর ঘাতের সঙ্গে সঙ্গে, অপেক্ষা করতে লাগল একজোড়া পা-এর জন্য।

শবাগার

মুকুন্দ খবরকাগজেব প্রথম পাতায় চারটি মৃত্যু-সংবাদ দেখল, বাসীমুখেই। দুজন বিদেশী মন্ত্রী, একজন বাঙালি ডাক্তার ও কেরলের জনৈক এম পি। চারজনই করোনারি থ্রম্বসিসে। ওদের বয়স ৭২,৫৫,৫৮ ও ৫৬। মুকুন্দর বয়স ৫১, কিন্তু সে ব্যাঙ্কের প্রবীণ কেবানী। থাকে পৈতৃক বাড়িতে, ছোট সংসার, একতলা ভাড়া দেওয়া।

দোতলায় রান্নাঘব ও কলঘরের লাগোয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে মাজতে সে চিন্তিত স্বরে লীলাবতীকে উদ্দেশ্য করে বলল, "থ্রম্বসিসে আজকাল খুব মরছে।"

লীলাবতী চা তৈরিতে ব্যস্ত। বলল, "কে আবার মরল?"

হাঁ-করে ভিতরের পাটিতে বুরুশ ঘষতে ঘষতে মুকুন্দ বলল, "খওরের কাওজে দিয়েছে, চাজ্জন।"

"থম্বসিস হয়েই তো ছোট্‌ঠাকুরঝির শ্বশুর আপিস যাওয়ার সময় বাসের মধ্যে মরে গেল। পাশের লোকটা পর্যন্ত টের পায়নি। কি পাজি রোগরে বাবা!"

এরপর লীলাবতী যা-যা বলবে মুকুন্দব জানা আছে। কি দশাসই চেহারা ছিল, কি দারুণ রগড করত, কি ভীষণ খাইয়ে ছিল ইত্যাদি। একতলার কলঘরের ছিটকিনি খোলার শব্দ হতেই মুকুন্দ বাবান্দার ধারে সরে এল। শুকনো শাড়িটা আলগা করে সদ্যস্নাত দেহে জড়িয়ে শিপ্রা বেরচ্ছে। হাতে গোছা করে ভিজে কাপড়।শীতলপাটির মত গায়ের চামড়া, দেহটি নধর। লীলাবতী রান্নাঘর থেকে একটানা কথা বলে যাচ্ছে। মীরা স্কুলে যাবার জন্য আয়নার সামনে। মনু তার ঘরে এখন ঘুমোচ্ছে।

শিপ্রা উঠোনের তাবে কাপড় মেলে দিতে দিতে মুকুন্দকে দেখে ভ্রূকুটি করেই হাসল। গোড়ালি, মুখ ও দুটি হাত তোলা। চিবুক এবং বগলের কেশ থেকে জল গড়াচ্ছে। হাসতে গিয়েই ভাবসাম্যটা টলে গেল সামান্য। তাইতে ওর বুক ও পাছার যৎসামান্য কম্পনটুকু উপভোগ করতে করতে মুকুন্দ মাজনের ফেনা গিলে, চেটো দিয়ে কষ মুছে নিয়ে হেসে লীলাবতীকে বলল, "এর থেকেও পাজি

রোগ ক্যানসার।" নিচের ভাড়াটে শিপ্রার স্বামী গৌরাঙ্গকে দিন কুড়ি আগে জবাব দিয়ে ক্যানসার হাসপাতাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন দিন গুনছে। লীলাবতী গলা নামিয়ে বলল, "যা অবস্থা দেখলুম, মনে হচ্ছে এ মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে।বউ মেয়ের যে কি দশা হবে এরপর! মনুকে তুলে দাও তো, চা হয়ে গেছে।"

মনুকে ডাকতে গিয়ে মুকুন্দ দরজার কাছে থমকে গেল। কাত হয়ে খাটে ঘুমোচ্ছে, লুঙ্গিটা হাঁটুর উপরে উঠে রয়েছে। বাইশ বছরের ছেলে, কলেজে পড়ে। ঈষৎ গম্ভীর প্রকৃতির। বাপের সঙ্গে কমই কথা বলে। মুকুন্দ সন্তর্পণে লুঙ্গিটা নামিয়ে মনুর কাঁধে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "ওঠ, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে কলঘরে মুখ ধুতে যাবার সময় মুকুন্দ দেখল, মেয়ের ফ্রকটা তারে মেলবার জন্য শিপ্রা ছুঁড়ে দিল এবং পড়ে গেল উঠোনের মেঝেয়। মুকুন্দর মনে পড়ল, তারটা এত উঁচু করে বেঁধেছিল গৌরাঙ্গই। ও খুব লম্বা। তখন ওর ক্যানসার ধরেনি।

দোতলা থেকে সিঁড়িটা একতলায় এসে ঠেকেছে শিপ্রাদের দরজার পাশেই। ডানদিকে ঘুরে গেছে হাত-পনেরোর একটা গলি সদর দরজা পর্যন্ত, বাঁদিকে উঠোন ও শিপ্রার রান্নাঘর। মুকুন্দ বাজারের থলি হাতে নিচে নামতেই শিপ্রা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "আজ কিন্তু রেশন তোলার শেষদিন, নইলে হপ্তাটা পচে যাবে।"

"অফিস যাবার সময় দেব।" বলেই মুকুন্দ ওর পাছায় হাত রাখল।

"ধ্যাৎ।" শিপ্রা ফাজিল হেসে ছিটকে সরে গেল।

সদর দরজার গায়েই শিপ্রাদের ঘরের জানলা। মুকুন্দ একবার তাকাল। গৌরাঙ্গ বুকের উপর হাত রেখে স্থিরচোখে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে। বাজার থেকে ফেরার সময়ও সে তাকাল। গৌরাঙ্গ জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে, চোখদুটো কঠিন বরফের মত ঝকঝকে। যেন শীতল-ক্রোধ জমাট বেঁধে রয়েছে। অফিসে যাবার সময় মুকুন্দ শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে নামল। শিপ্রা দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে ঘরের দরজাটা ভেজানো। মুকুন্দর হাত থেকে দশ টাকার নোটটা নেওয়া মাত্রই শিপ্রাকে সে জড়িয়ে ধরল। চুমু খেতে যাবে, কিন্তু শিপ্রার দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছন ফিরে তাকিয়েই তার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটল। মনু সদর দরজার কাছে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে। মুকুন্দর শরীরের মধ্যে তখন ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথায় উঠছে, হাড় থেকে মাংস খুলে খুলে পড়ছে।

শিপ্রা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মনু মাথা নিচু করে মুকুন্দর পাশ দিয়েই উপরে উঠে গেল। সদর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মুকুন্দ অসহায় বোধ করে

অবশেষে শিপ্রার ঘরের জানলায় তাকাল। গৌরাঙ্গর চুল ধরে বাচ্চামেয়েটি টানাটানি করছে। গৌরাঙ্গর চোখ থেকে জল গড়িয়ে ঠোঁটের কোল ঘুরে চোয়ালে পৌঁছে টলটলে একটা বিন্দু হয়ে রয়েছে।

বাসে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মুকুন্দর মনে পড়ল, জয়ার শ্বশুর বাসের মধ্যে থ্রম্বসিসে মরে গেছল। তারপর মনে হল, মনু কি আমায় ঘেন্না করবে?

"আজ সকালে আমাদের পাড়ার মধ্যে একটা খুন হয়েছে।" মুকুন্দর পিছনে কে একজন কাকে বলল, "পাইপগান দিয়ে মেরেছে। বছর আঠারো বয়স হবে।"

"রাস্তাতেই?"

"তবে না তো কোথায়? বাড়ি থেকে বার করে এনে রাস্তা ভরতি লোকের সামনেই!"

"কেউ কিছু করল না?"

"পাগল! করতে গিয়ে কে প্রাণ খোয়াবে!"

"পুলিশ?"

"এসে বডিটা নিয়ে গেল।"

"অ্যারেস্ট করেনি তো কাউকে? যা পেটান পেটাচ্ছে তাতে নাকি চিরজীবনের মত পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে!"

বাসের লোকেরা, এরপর, পেটানোর নানান বীভৎস পদ্ধতির আলোচনা শুরু করল। মুকুন্দ তখন ভাবতে লাগল, আরো পনেরো কুড়ি বছর যদি বাঁচি তাহলে মনুকে নিয়েই তো বাঁচতে হবে! কিন্তু কি করে বাঁচব যদি ও ঘেন্না করে?

অফিসের লিফটে পাঁচতলায় ওঠার সময় সে ভাবতে লাগল, মনু কি ওর মাকে ব্যাপারটা বলে দেবে? একেবারে ছেলেমানুষ নয়, সিরিয়াস ধরনের। হয়তো লজ্জায় নাও বলতে পারে। এই সময় মুকুন্দ শুনল, তার সামনের লোকটি পাশেরজনকে বলছে—"না ভাই, শরীর খারাপ নয়। ভাগ্নেটা পরশু মার্ডার হয়েছে, এখনো লাশ পাওয়া যাচ্ছে না। মনটা তাই—" লিফট চারতলায় থামতেই ওরা দুজন বেরিয়ে গেল।

চেয়ারে বসামাত্র পাশের টেবলের অজিত ধর মাথা হেলিয়ে বলল, "মুকুন্দদা আজকের কাগজ দেখেছেন? চার চারটে থ্রম্বসিস ডেথ ফ্রন্ট পেজেই। সবাই অ্যাবাভ ফিফটি।"

"আমার ফিফটি-ওয়ান।" মুকুন্দ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল টেবলের ফাটল থেকে উঠে আসা আরশোলাটার দিকে এবং সেটা একটা ফাইলের মধ্যে সেঁধিয়ে

যাবার পর আবার বলল, "আমার একান্ন শুরু হয়েছে।"

"এবার সাবধান হোন। স্নেহজাতীয় জিনিস খাওয়া কমান আর লাইট ধরনের কিছু ব্যায়াম করুন।"

অজিত ধরের স্বাস্থ্যটি চমৎকার। বছর পনেরো আগে ওয়েটলিফটিং-এ স্টেট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ফেদারওয়েটে। বিয়ে করেনি। এখন তবলা শিখছে। মুকুন্দ ড্রয়ার থেকে দোয়াত বার করে কলমের ক্যাপ খুলতে খুলতে বলল, "তোমার এসব হবে না।"

"কি করে জানলেন?"

"যারা হ্যাপি যাদের উদ্বেগ নেই তাদের হয় না। থ্রম্বসিসে কটা মেয়েমানুষ মরেছে?"

"কিন্তু আমি মেয়েমানুষ নই।" অজিত ধর গম্ভীর হয়ে মুখ ফেরাল মুকুন্দর মনে পড়ল জয়ার শ্বশুরকে পাঁচদিন পর মর্গে পাওয়া যায়, পচ ধরে বীভৎস দেখাচ্ছিল, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বেরিয়ে এসেই জয়ার ভাসুর বমি করে ফেলে। আইডেন্টিফাই করার মত কোনকিছু সঙ্গে থাকলে ভদ্রলোক তার ছেলেকে বমি করাত না।

এবার মুকুন্দ, কৌতূহলবশতই ভাবল, বাসে আজ যদি থ্রম্বসিসে মারা যেতাম, তাহলে আমার লাশটার কি হত? বাসটা নিশ্চয় থেমে যাবে। কেউ বলবে হাসপাতালে, কেউ বলবে থানায় বাসটাকে নিয়ে চল। তার মধ্যে সেই লোকটা—যে বলেছিল, 'পাগল। করতে গিয়ে কে প্রাণ খোয়াবে'—বলবে "একদমই যখন মরে গেছে তখন আমাদের অফিস লেট করিয়ে লাভ কি, বরং এখানেই নামিয়ে দিন, পাবলিক কিংবা পুলিশ ব্যবস্থা করে দেবে।" শুনে মনে মনে সবাই হাঁফ ছাড়বে, তবে দু-একজন আপত্তি জানিয়ে বলবে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়াটা খুবই নিষ্ঠুর দেখাবে, বরং বাসের একটা সীটে বসে থাকুক। সবাই অফিসে নেমে গেলে তারপর থানায় বা হাসপাতালে পৌঁছে দিলেই হবে। এই কথার পর তর্ক বেধে যাবে। তখন ড্রাইভার বিরক্ত হয়ে বাসটা চালিয়ে দেবে। সবাই ড্রাইভারকে তখন, উল্লুক বলবে।

মুকুন্দর মজা লাগছিল এইরকম ভাবতে। কিন্তু সত্যিই যদি থ্রম্বসিসে মারা যেতুম? এই অজিত ধর কি লিফটে উঠতে উঠতে কাউকে বলবে—না মশাই, শরীর আমার ফিট আছে। বারো বছরের কলীগ মুকুন্দ সেন আজ পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ। যা দিনকাল, মার্ডার-টার্ডার হল কিনা কে জানে। লোকটা অবশ্য একদিক থেকে ভালই ছিল, পলিটিক্স করত না, তবে মদ-টদ খেত শুনেছি।

আড়চোখে মুকুন্দ তাকাল অজিত ধরের দিকে। শরীর দুর্বল হয়ে যাবে বলে

বিয়ে করেনি। শরীর গরম হতে পারে বলে ফুটবল খেলা পর্যন্ত দেখে না। আড়াইটে বাজলেই ড্রয়ার থেকে একটা আপেল বার করে খায়। ওর থ্রম্বসিস হবে না। ওর ছেলে থাকত যদি, সে বমি করার সুযোগ পাবে না। পকেট হাতড়ে মুকুন্দ কয়েকটা নোট, খুচরো পয়সা আর এলাচের মোড়ক বার করল। এর কোনটা দিয়েই তাকে আইডেন্টিফাই করা যাবে না। মোড়কটা জনৈক ভোলানাথ শুঁইয়ের লন্ড্রি বিল। সেটা কুচিয়ে ফেলে মুকুন্দ নিজের নাম-ঠিকানা ইংরাজিতে একটা কাগজে লিখে, বুকপকেটে রেখে স্বস্তি বোধ কবল।

অফিস থেকে বেরিয়ে মুকুন্দ শুনল, উত্তর কলকাতায় ট্রাম পুড়েছে তাই ট্রাম বন্ধ। বাস স্টপে গিয়ে দেখল শিশির নামে লীভ-সেকশনের নতুন ছেলেটি দাঁড়িয়ে। বছর পঁচিশ বয়স, ফার্স্ট ডিভিশনে ফুটবল খেলে। অফিস টিমে খেলবে বলেই চাকরি পেয়েছে। আঁটসাঁট প্যান্ট, নাভির নিচে বেল্ট, উঁচু গোড়ালির ছুঁচলো জুতো আর ছিপছিপে শরীর। অফিসের মেয়েরা যে ওর দিকে তাকায় এটা ও জানে। কিন্তু শিশির এখন ধুতি-পাঞ্জাবি-চটি পরে দাঁড়িয়ে।

"ব্যাপার কি ? এই বেশে তোমায় ঠিক মানাচ্ছে না ভাই, কেমন যেন বয়স্ক-বয়স্ক লাগছে।"

শিশিরকে মুহূর্তের জন্য অপ্রতিভ দেখাল। একটি সুঠাম মেয়ে শ্যামবাজারের বাসে ওঠাব জন্য মরিয়া হয়ে ধাক্কা দিতে দিতে এগোল এবং হ্যাণ্ডেল ধরে পা রাখামাত্র বাস ছেড়ে দিল। পা-দানির একটি যুবক তৎক্ষণাৎ মেয়েটির পিঠে বাহুব বেড় দিল। শিশির বাসটার থেকে চোখ সরিয়ে তিক্তস্বরে বলল, "এখন সবথেকে সেফ বুড়ো হয়ে যাওয়া। আমার পাশের বাড়ির ছেলেটাকে মাসখানেক আগে পুলিশ রাস্তা থেকে ধবে নিয়ে এমন মেরেছে যে হাঁটুদুটো এখনও ভাল করে মুড়তে পারে না। আমি জানি ছেলেটা কোন গোলমালে নেই। শুধু ডাঁটো বয়সের জন্যই ওর সর্বনাশ হল।"

মুকুন্দ চিন্তিত স্বরে বলল, "আমার ছেলেও গোলমালে থাকে না, কিন্তু কার সঙ্গে মিশছে তা তো জানি না।"

শিশির আলতো করে চুলে হাত বুলিয়ে বলল, "আমার ভাই কাল বাড়িতে বোমা এনে লুকিয়ে রেখেছিল। জানেন মুকুন্দদা, আমরা খুব গরিব। খেলার জন্যই এই চাকবি। পঙ্গু হয়ে যাই যদি আমায় রাখবে কেন, এখন তো কনফার্মড হইনি। এই শরীরটাই আমার সব।"

মুকুন্দকে আর কিছু বলতে না দিয়ে শিশির প্রায় ছুটেই রাস্তা পার হয়ে ভিড়ে মিশে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে মুকুন্দও হাঁটতে শুরু করল। আধঘন্টা হাঁটার পর তার মনে হল রাস্তা ক্রমশ ফাঁকা দেখাচ্ছে, পথচারী কম, গাড়িগুলি জোরে যাচ্ছে,

সি আর পি ভরতি লরী তিন-চারবার চোখে পড়ল, ক্ষীণ বিস্ফোরণের শব্দও শুনতে পেল। মুকুন্দ স্থির করল, গলি ধরে যাওয়াই ভাল।

মিনিট কয়েক পরেই মুকুন্দর গা ছমছম করতে লাগল। যতই এগোয়, সবকিছু ভূতে পাওয়ার মত ঠেকছে। বাড়িগুলোর দরজা-জানলা বন্ধ। চাপা ফিসফাস শোনা যাচ্ছে। অন্ধকাব ছাদে আবছা মুখের সারি। দূরে দূরে রাস্তার আলো, মাঝেরটা নেভা। দুধারের শ্যাওলাধরা, পলেস্তারা খসা, বিবর্ণ দেওয়ালগুলোর মাঝখানে গর্ত, ঢিপি আর আস্তাকুঁড়ভরা রাস্তাটাকে প্রাচীন সুড়ঙ্গের মত দেখাচ্ছে। নিজের পায়েব শব্দে মুকুন্দর এবার মনে হতে লাগল কেউ পিছু নিয়েছে।

আর একটু এগিয়ে ডানদিকের গলিটা দিয়ে তিন-চার মিনিটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছান যায়। তবু মুকুন্দ আর এগোতে সাহস পেল না। পাশেব সরুগলির মধ্যে ঢুকে বড়রাস্তার দিকে কিছুটা এগিয়ে, আচমকা একটা রাইফেল ও দুটো পিস্তলের মুখোমুখি হয়ে দুহাত তুলে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কোথায় যাচ্ছেন ?" সাদা প্যাণ্ট, হলুদ বুশশার্টপরা লোকটি মুকুন্দব পেটে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করল।

"বাড়ি যাচ্ছি স্যার, পাশের বঙ্কু সরকার লেনে থাকি।"

"তাহলে এখানে কেন ?"

"অফিস থেকে ফিরছি। গোলমাল দেখে গলি দিয়ে যাচ্ছিলুম।" "পাড়ায় কারা কারা বোমা ছোঁড়ে ?"

"জানি না স্যার।"

"নাকি বলবেন না ?"

"সত্যি আমি জানি না।"

ইউনিফর্ম পরা ভারিক্কি ধরনের যে লোকটি এতক্ষণ শুধুই মুকুন্দর দিকে তাকিয়েছিল, বলল, "নিয়ে গিয়ে দেখাও তো, আইডেনন্টিফাই করতে পারে কিনা।"

মুকুন্দর কোমরে পিস্তলের খোঁচা দিয়ে হলুদ বুশশার্ট বলল, "বাঁয়ে।"

সে তখুনি বাঁদিকে ফিবে, দুহাত তুলে, চলতে শুরু করল। রাস্তার যেখানটায় আলো কম এবং দুটো বাড়ির দেয়াল 'দ'-এর মত হয়ে একটা কোণ তৈরি করেছে সেখানে টর্চের আলো ফেলে লোকটি বলল, "ওকে চেনেন ?"

মুকুন্দ দেখল একটা দেহ উপুড় হয়ে পড়ে, মুখটা পাশে ফেরান। দু'হাত তোলা অবস্থায় এগিয়ে এসে ঝুঁকে 'মনু' বলে অস্ফুটে কাতরে উঠেই বুঝল, দেখতে অনেকটা মনুর মতই। চোখের পাতা খোলা, নীল জামাটা ফালা হয়ে

পিঠ উন্মুক্ত, কঠিনভাবে আঙুলগুলো মুঠো করা, ঠোঁটদুটো চেপে রয়েছে, গলায় গভীর ক্ষত। হিঁচড়ে টেনে আনার দাগ প্যান্টে। গলা থেকে চোয়ান রক্ত থকথকে হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

"এর নাম মনু?"

"না, না, আমার ছেলের নাম মনু। একে অনেকটা তার মত দেখতে। একে আমি একদম চিনি না স্যার।"

"কখনো একে দেখেননি? ভাল করে দেখে বলুন।"

মুকুন্দ আবার ঝুঁকে পড়ল। গোড়ালি থেকে মাথার প্রান্ত জমাট বাঁধা আগ্নেয়গিরি লাভার একটা ঢেউ খেলানো খণ্ডের মত। এই খণ্ডটাই উত্তপ্তকালে ওর সর্বস্ব ছিল। ওর যন্ত্রণা, বিস্ময় আর দাপট। এখন খোলা চোখদুটি থেকে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নির্গত হচ্ছে না।

মাথা নেড়ে মুকুন্দ বলল, "না, একে কখনো দেখিনি।"

"আচ্ছা চলে যান, এধার-ওধার করবেন না।"

কিছুদূর গিয়ে মুকুন্দ ফিরে তাকাল। বুশশার্ট তাকে লক্ষ্য করছে। লাশটা এখন অন্ধকারে। মুকুন্দ মনে মনে বলল, আর একটা আনআইডেন্টিফায়েড ডেড বডি। তারপর বুকপকেটে হাত দিয়ে স্বস্তিবোধ করল। এবার গলিটা, আর একটা গলিকে কেটে সোজা মুকুন্দর পাড়ায় ঢুকে গেছে। মোড়টা আধো অন্ধকার। দুটি ছেলে হঠাৎ দেয়াল ফুঁড়েই যেন তার সামনে এসে দাঁড়াল। একজনের হাতে ফুট দুয়েক লম্বা ঝকঝকে ইস্পাত।

"কি জিজ্ঞাসা করছিল?"

মুকুন্দ চিনতে পারল ছেলেটিকে। মনুর বন্ধু ছিল ছোটবেলায়। তখন বাড়িতে আসত, নাম তাজু। না থেমে গঙ্গা পারাপার করে বলে শুনেছে। এখন পাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানেই প্রায়-সময় কাটায়। মনু এখন ওর সঙ্গে আর মেশে না।

"কিছুই না। শুধু জানতে চাইল লাশটাকে চিনি কিনা।"

"আমাদের কারুর কথা জিজ্ঞেস করল?"

"না।"

"খবরদার, বলবেন না কিছু।"

ওরা দুজনে আবার দেয়ালে সেঁধিয়ে গেল। দুটি স্ত্রীলোককে নিয়ে একটি রিকশা আসছে। একজনকে বিরক্তস্বরে মুকুন্দ বলতে শুনল, "ওম্মা, এইতো যাবার সময় দেখে গেলুম সব ঠাণ্ডা।"

জানলায় শিপ্রা দাঁড়িয়েছিল। মুকুন্দকে দেখেই আলো জ্বেলে দরজা খুলে

বলল, "যা ভাবনা হচ্ছিল !"

"আমার জন্যে ?"

"তবে নাতো কি ?"

শুনে মুকুন্দর ভাল লাগল প্রথমে। তারপর ভাবল গৌরাঙ্গর জন্য একদম না ভাবাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তাই বলল, "গৌরাঙ্গ আছে কেমন ? "

"একই রকম !" শিপ্রা সাধারণভাবে বলল এবং সহসা গলা নামিয়ে যোগ করল, "মনু কেমন-কেমন করে তাকাচ্ছিল। কাউকে বলে দেবে না তো ? আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে।"

"বড় হয়েছে। মনে হয় না বলবে।"

মুকুন্দ তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এল। ঘরের জানালাগুলো বন্ধ। মীরা ও লীলাবতী সিঁটিয়ে বসে রয়েছে। তাকে দেখে ওরা হাঁফ ছাড়ল। মীরা বলল, "জান কী কাণ্ড হয়েছে ! একটা ছেলের গলা কেটে ফেলে রেখে গেছে খুদিরাম বসাক **স্ট্রিটে** !" মনু পাশের ঘর থেকে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, "গোলমালের সময় অতুল বোস লেন দিয়ে না ঢুকে শেতলাতলার গলিটা দিয়ে আসাই সেফ্।"

ওর কথা শুনতে শুনতে মুকুন্দর মনে হল, মনু তাহলে এতক্ষণ উদ্বেগের মধ্যে ছিল। ছেলেটা আমার জন্য ভাবে, হয়ত বমি করবে না।

পরদিন অফিসে বেলা বারোটা নাগাদ মুকুন্দকে একজন টেলিফোনে উত্তেজিত স্বরে বলল, "আপনার ছেলে মানবেন্দ্র সেনকে পুলিশ রাস্তা থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।"

"কি বলছেন ! মনুকে ?" মুকুন্দ চিৎকার করে উঠল। "আপনি কি করে জানলেন ?"

"আমার ভাইকেও ধরেছে। থানায় গেছলুম। আমাকে নাম আর ফোন নাম্বার দিয়ে আপনার ছেলে জানিয়ে দিতে বলল। এখুনি থানায় গিয়ে চেষ্টা করুন, ছাড়াতে পারেন কিনা।"

ফোন রেখে দেওয়ার শব্দ পেল মুকুন্দ। তারপরই ওর চোখ-কান দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকতে লাগল। কিছুক্ষণ সে কিছুই দেখতে পেল না, শুনতে পেল না। তারপর কাতর স্বরে অজিত ধরকে বলল, "এইমাত্র একজন খবর দিল, ছেলেটাকে পুলিশে ধরেছে রাস্তা থেকে। কিন্তু মনু তো ওসব করে না, অত্যন্ত ভাল্ ছেলে। এখন কি করি বল তো ?"

"দেরি করবেন না এখুনি থানায় গিয়ে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করুন। কেস লিখিয়ে ফেললে আর উপায় নেই, চালান করে দেবে। শুনেছি প্রচণ্ড মার দিচ্ছে

থানায় ।"

"তোমার কেউ চেনাশুনো থানায় আছে ? অন্তত যাকে বললে, মারধর করবে না। মনুর ভীষণ দুর্বল শরীর।"

অজিত ধর মাথা নাড়ল।

"তুমি যাবে আমার সঙ্গে থানায় ?"

"সাড়ে তিনশো লোকের স্যালারি স্টেটমেন্ট তৈরি করছি, মুকুন্দদা চারদিন পরই মাইনে। এখন তো ফেলে রেখে—"

মুকুন্দ পাঁচতলা থেকে নামল সিঁড়ি দিয়ে। ট্যাক্সিতে বারদুয়েক বলল, "একটু জোরে চালান ভাই।" থানায় আট-দশটি ছেলের সঙ্গে মনুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও-সিকে বলল, "আমার ছেলে কোনকিছুর মধ্যে থাকে না স্যার, ওকে ভুল করে এনেছেন।"

"কোনটি আপনার ছেলে ?" গম্ভীর এবং যেন ক্লান্ত, এমন স্বরে ও-সি বলল।

মুকুন্দ আঙ্গুল তুলে দেখাবার সময় মনুব পাশে দাঁড়ান হাফ-প্যান্ট পরা ছেলেটিকে কনুই তুলে খুব মন দিয়ে বাহুর থ্যাঁতলান জায়গাটা পরীক্ষা কবতে দেখল। মনুর দিকে তাকিয়ে ও-সি বলল, "সব বাপ-মা এসেই বলে, তাদের ছেলে নিবপরাধ। যদি নিবপরাধ হয় তাহলে ছাড়া পাবে। আগে আমবা খোঁজ নিয়ে দেখি।"

"কখন ছাড়বেন তাহলে ?"

ও-সি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মনু হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে বলল, "আমি কিছু করিনি স্যার আমি কিছুই জানি না। বিশ্বাস করুন, আমি শুধু কলেজে যাচ্ছিলুম। খাতা ছাড়া হাতে আর কিছু ছিল না।"

"চুপ কর।" কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ও-সি'র পাশে দাঁড়ান ধুতিপরা লোকটি। থতমত হয়ে মনু তাকাল মুকুন্দের দিকে। দুটি ছেলে পাংশুমুখে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল। লোকটি ধমকে আবার বলল, "তাজু তোমার পাড়ার ছেলে আর তাকে তুমি চেন না ?"

মুকুন্দ ব্যস্ত হয়ে বলল, "আমার ছেলে ওর সঙ্গে মেশে না স্যার।"

"বাজে কথা। আমাদের কাছে খবর আছে আপনার ছেলে ওর বন্ধু। তাজুকে কোথায় পাওয়া যাবে, দলে আর কে কে আছে, বলুক, আপনার ছেলেকে ছেড়ে দোব।"

মুকুন্দ দেখল মনু ঠকঠক করে কাঁপছে। ওকে এত ভয় পেতে দেখে সেও কাতর হয়ে পড়ল। চোখের জল মনুর ঠোঁটেব কোল ঘুরে চোয়ালে পৌঁছে টলটল করছে। মুকুন্দের চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। আবছাভাবে গৌরাঙ্গর

মুখটা ফুটে উঠল তার মনে। কাল সকালে এই রকম একটা বিন্দু টলটল করছিল ওর থুতনির কাছে। মেয়েটা তখন চুলধরে টানছিল। কিন্তু মনুর তো ক্যানসার হয়নি! মুকুন্দ বিষণ্ণচোখে তাকিয়ে রইল মনুর দিকে। শুধু কি শরীরের জন্যই ওর এই কান্না। রাস্তায় কাল বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়েছিল যে ছেলেটি সেও কি শরীরটাকে ভালবাসতো না!

ওসি ঘরের একধারে গিয়ে লোকটির সঙ্গে চাপাস্বরে মিনিট দুয়েক কথা বলে ফিরে এল। "আপনি এখন যান, সন্ধ্যের দিকে এসে খোঁজ নেবেন।"

"বিশ্বাস করুন স্যার, আমার ছেলে জীবনে কখনও পলিটিক্স করেনি। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন।" মুকুন্দ ঝুঁকে ও-সি'র হাঁটুতে হাত রাখল। হাতটা সরিয়ে দিতে দিতে ও-সি বলল, "আচ্ছা, ঘণ্টা দু-তিন পরেই আসুন, নিরপরাধ হলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব।"

বেরিয়ে এসে মুকুন্দ ঠিক করতে পারল না এবার কি করবে। থানার সামনেই একটা বাড়ির রকে বসে পড়ল। এখন অফিসে ফেরা আর এখানে বসে থাকা একই ব্যাপার। লীলাবতীর কান্নাকাটির থেকেও ভাল। বসে থাকতে থাকতে সে অবসন্ন বোধ করতে শুরু করল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে তাকিয়ে রইল থানার ফটকে। ক্লান্ত মস্তিষ্কে এলোপাথাড়ি নানান বীভৎস দৃশ্য এখন সে দেখতে পাচ্ছে, অদ্ভুত করুণ শব্দ শুনতে পাচ্ছে। প্রত্যেকটাই স্নায়ুবিদারক।

ছটফট করে মুকুন্দ উঠে পড়ল। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বারবার সে শিপ্রার দেহে, নানাবিধ অশ্লীল শব্দে এবং থ্রম্বসিসে নিজেকে আবদ্ধ করে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করল। কিন্তু সফল হল না। সবকিছু ছাপিয়ে মনুর কান্নাটা তাকে পেয়ে বসছে। ঘণ্টাখানেক পরে সে আবার থানার সামনে ফিরে এল এবং রকে বসতে গিয়েই দেখল মনু মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসছে।

"মনু।" তীক্ষ্ণস্বরে মুকুন্দ ডাকল। মনু মুখ তুলে তাকাল। মুকুন্দ ছুটে গিয়ে প্রথমেই তন্নতন্ন করে ওর আপাদমস্তক দেখল। তারপর হেসে বলল, "ছেড়ে দিল।"

মাথা নেড়ে মনু ফিকে হাসল।

"মারধর করেনি?"

"হাতটা মুচড়ে দিয়েছিল ধরার সময়।"

ওর কাঁধে আলতো করে হাত রেখে, হাঁটতে হাঁটতে মুকুন্দ বলল, অনেকক্ষণ খাসনি, আয় এই দোকানটায়।"

"আমার খিদে নেই।"

"ধরল কেন তোকে?"

"যে ছেলেগুলোকে থানায় দেখলে, ওরা একটা স্কুলে ভাঙ্গচুর করে বোমা ফাটিয়ে এসে আমার পাশ দিয়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ প্লেন-ড্রেস পুলিশ ঘিরে ধরে মারতে-মারতে ওদের সঙ্গে আমাকেও ভ্যানে তুলল।"

"তুই যদি বুড়োমানুষ হতিস তাহলে ধরত না।"

মনু জবাব দিল না। মিনিটখানেক পর মুকুন্দ বলল, "অফিসে ফোন পেয়েই সোজা থানায় এসেছি। বাড়ির কেউ জানে না, তুই বাড়িতে এ সম্পর্কে কিছু বলিস না, তাহলেই তোর মা কান্না জুড়ে দেবে।

ঘাড় ফিরিয়ে মনু তাকাল ওর দিকে। চোখদুটো দেখে মুকুন্দর বুকের মধ্যে ক্ষীণ একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে আবছাভাবে সে গৌরাঙ্গর চোখদুটি দেখতে পেল। ঠিক এই চাহনিতেই সে চিত হয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়েছিল। মুকন্দর আবার মনে হল, মনুর কেন ক্যানসার হবে!

"তোকে আর কিছু কি জিজ্ঞাসা করেছে?"

চমকে উঠে মনু ভ্রূ কুঁচকে অস্বাভাবিক স্বরে বলল, "কি জিজ্ঞাসা করবে?"

"যা জানতে চাইছিল।"

"কিছু জিজ্ঞাসা করেনি।" মনু দাঁড়িয়ে পড়ল। "আমি এখন বাড়ি যাব না, তুমি কি বাড়ি যাবে?"

"আমি," মুকুন্দ দুধারে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "দেখি কোথাও গিয়ে সময় কাটাতে পারি কিনা।"

মনু ভিড়ে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মুকুন্দ তাকিয়ে রইল। তারপর স্থির করল, ও ক্লাস নাইনে ওঠার পর আর মাতাল হইনি, আজ হব।

রাত প্রায় বারোটায় মুকুন্দ বাড়ি ফিরল। কড়ানাড়ার আগেই সদরদরজা খুলে গেল। অন্ধকারে শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরার জন্য হাত বাড়াতেই চাপাস্বরে মনু বলল, "এখন এত রাত করে বাড়ি ফির না।"

মুকুন্দ অন্ধকারের মধ্যে মনুর মুখটা দুই করতলে একবার চেপে ধরে, কথা না বলে দোতলায় উঠে গেল।

সকালে দেরিতে ঘুম ভাঙল তার। চা খেতে খেতে মনুর খোঁজ করল। দুটি ছেলে তাকে ডেকে নিয়ে গেছে শুনেই চায়ের কাপ রেখে তাড়াতাড়ি মুকুন্দ রাস্তায় বেরিয়ে এসে মনুকে দেখতে পেল না। ভয়ে বুক শুকিয়ে এল তার, শিপ্রাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "কারা ডাকতে এসেছিল?"

"একজনকে দেখেছি, রোগাপানা, ফর্সা, মনুরই বয়সী।"

"হাতে কিছু ছিল?"

"কেন?" ভীতস্বরে শিপ্রা বলল।

ধমকে উঠল মুকুন্দ, "যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও।"

"অতশত দেখিনি।"

মুকুন্দ এবার ছুটে বেরল। পরিচিতদের কাছে খোঁজ নিতে নিতে ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছল। সেখান থেকে দু-তিনটে গলি ঘুরে, গলাকাটা লাশটা যেখানে পড়েছিল সেখানে হাজির হল। এইসময় তার বুকফাটা কান্না পেল। বাড়ি ফিরতেই শিপ্রা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "মনু তো অনেকক্ষণ ফিরেছে।"

একটা করে সিঁড়ি টপকে মুকুন্দ দোতলায় এল। মনু তার ঘরে চেয়ারে বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে। মুকুন্দ ঘরে ঢুকেই বলল, "কেন ওরা এসেছিল?"

"কারা!" মনু স্থির চোখে মুকুন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চাহনিটা তুলে নিয়ে আবার জানলার বাইরে রাখল।

"ওরা কি জেনেছে?" ব্যগ্র স্বরে মুকুন্দ বলল।

"কি জানবে?" মনু এবার তীব্রচোখে তাকাল।

মুকুন্দ ফিসফিস করে বলল, "আমি জানি রে আমি জানি।"

"কি জান তুমি?"

"তোকে ভয় পেতে দেখেছিলুম।"

"কিসের ভয়?"

"শরীরটার জন্য ভয়।"

"তুমি পাও না?" প্রশ্নটি করার জন্যই যেন নিজের উপর অভিমানে মনুর বসার ভঙ্গি কঠিন হয়ে গেল।

"হ্যাঁ পাই।" মুকুন্দ কোমল কণ্ঠে বলল। "আমি তোকে দোষ দিচ্ছি নারে। যদি বলতে না চাস তো বলিস না। কিন্তু তুই আমার ছেলে, তোর জন্য আমি ভয় পাচ্ছি। সব বাবাই পায়। এটা কাপুরুষতা নয়।"

তোমার ভয়টা ছেলের প্রাণের জন্য, তাই সেটা কাপুরুষতা নয়।" মনু যান্ত্রিক স্বরে যেন মুখস্ত বলল।

"এভাবে কথাটা নিচ্ছিস কেন!" মুকুন্দ বিব্রত হয়ে বলল। "আমাকে ঘেন্না করার নিশ্চয় অন্য কারণ আছে কিন্তু এজন্য করিসনি।"

"তুমি কি আমায় ঘেন্না করছ, আমি যা করেছি?"

"মোটেই না। আমি চিরকাল তোকে ভালবাসব।"

"কিন্তু আমি নিজেকে ঘেন্না করছি। থানায় তুমি এমনকরে আমার দিকে তাকালে মনে হল আমি একটা মরামানুষ। কিরকম যেন ভয় করল আমার। নয়ত একটা কথাও বলতাম না, কিছুতেই না।" মনু উঠে দাঁড়াল। টেবলের বইগুলো অযথা ওলট-পালট করতে করতে মোচড়ান স্বরে বলল, "তোমার জন্য,

শুধু তোমার জন্য। তুমি আমায় করাপ্ট করেছ।"

মনু একবার শুধু মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। মুকুন্দ তখন প্রত্যাশামত নিশ্চিতরূপে দেখতে পেল, কঠিন বরফের মত ঝকঝকে ওর চোখদুটি। যেন শীতল ক্রোধে জমাট বেঁধে রয়েছে।

মুকুন্দর অফিসে যাবার সময় শিপ্রা দাঁড়িয়েছিল তার ঘরের দরজায়। সে হাসল। মুকুন্দ ভ্রূক্ষেপ করল না। গলির মোড়ে লাল ডোরাকাটা জামা গায়ে তাজু দাঁড়িয়ে। মুকুন্দ তাকাল না। বাস মাঝপথে বিকল হয়ে থেমে গেল। মুকুন্দ কণ্ডাক্টরের কাছ থেকে ভাড়ার পয়সা ফেরত নিল না। অফিসে অজিত ধরের প্রশ্নের উত্তরে জানাল,খবরটা ভুল। মনুকে ধরেনি। ছুটির পর ট্রাম থেকে নেমে মিনিট তিনেক হেঁটে বাড়ি। নামামাত্র দেখল জটলা করে লোকেরা ভীতচোখে তার পাড়ার দিকে তাকিয়ে বলাবলি করছে। একজন তাকে বলল, "ওদিকে যাবেন না মশাই। এইমাত্র পরপর চারটে গুলির শব্দ হল।" মুকুন্দ সে কাথায় কান দিল না। একটা পুলিশের ভ্যান দাঁড়িয়ে। সেটাকে ঘুরে পার হয়েই সে থমকে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর মাথা নামিয়ে গলিতে ঢুকল। তার পাশ দিয়ে দুটো লোক পিস্তল রাইফেল পরিবৃত একটা লাল ডোরাকাটা নিথরদেহ বহন করে নিয়ে গেল। টপটপ করে রক্ত ঝরছে। মুকুন্দ পিছন ফিরে তাকাল না। থমথমে গলির দুপাশে ভীত, বিস্মিত এবং অব্যক্ত চাহনি ও মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সে বাড়িতে ঢুকল।

মনু তার ঘরে খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে। মুকুন্দ দরজার কাছ থেকে বলল, "তাজুকে পুলিশ নিয়ে গেল। বোধহয় বেঁচে নেই।"

লীলাবতী ও মীরা ছুটে এল বিবরণ শোনার জন্য। মুকুন্দ তখন কলঘরে ঢুকল। হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দে সে ঘাড় ফেরাতেই দেখল মনু ঘর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে কলঘরের দিকেই আসছে। "কি হল !" বলে মুকুন্দ দ্রুত গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। মনু তখন হড়হড় করে মুকুন্দর গায়ে বমি করল।

মধ্যরাত্রে মুকুন্দ নিচে নেমে এসে শিপ্রার ঘরের দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে যেতেই সে ঘরে ঢুকে শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরল।

"একি, একি! ঘরের মধ্যে নয়। ও রয়েছে যে !"

"থাকুকগে।" শিপ্রাকে মেঝেতে শোয়াতে শোয়াতে মুকুন্দ বলল। "ওতো মরে যাচ্ছেই। তাহলে আবার ভয় কিসের।"

সূর্যাস্তে

পরের মুহূর্তে, পরের ঘণ্টায় বা পরের দিনে কি ঘটবে এই নিয়েই যারা ব্যস্ত থাকে উদয় বসাক তাদের অন্তর্গত। তাদের মতই সে কিছুটা ভীরু প্রকৃতির। জীবনে যা কিছু ঘটে. সেগুলো তো ঘটতই, এমন একটা ধারণা বাল্য থেকে তৈরি হয়ে যাওয়ায় অতীত নিয়ে মাথা ঘামায় না। ঘামাবার দরকার বোধ করে না। কিন্তু কোনভাবে যদি মনে পড়ে যায় তাহলে অবশ্যই কিছুক্ষণ সে অতীতে তাকায়। যেমন, তার দুটি ছেলে মেয়ে এটা মনে করে রাখাব কোন দরকারই সে বোধ করে না। মাসকয়েক আগে শুনল গৌরী পঞ্চমবার অন্তঃসত্ত্বা। তখন হুঁশ হল। তখন হিসেব করে দেখে, বছর পনেরো তার বিয়ে হয়েছে। পনেরো বছর বিবাহিত, এটা ভেবে অবাক হতে তার ভাল লাগল। তারপর মনে পড়ল তারাও চার ভাইবোন, একজন মারা গেছে। এরপর নিজেকে সে বলে, "ইস, সময় যে কিভাবে চলে যাচ্ছে, এবার কিছু জমাতে হবে।" উদয় চাকরি করছে সতেরো বছর, এটা তার মনে পড়ে গত মাসে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের টাকা পেয়ে। তারপর একবার মনে পড়েছিল,বাবা মারা যেতে বি এ পরীক্ষা না দিয়েই চাকরিতে ঢুকতে হয়েছিল। যথারীতি সে তারপর নিজেকে বলে, ইস্ সময় যে কিভাবে চলে যাচ্ছে, কিছু জমাতে হবে এবার। এইভাবেই উদয় বসাকের মনে পড়ল, একসময় সে যুবক ছিল।

বাসটায় যথেষ্ট ভিড়। দুটো দরজা দিয়ে ফোড়ার মত মানুষ ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে। হাতলটা ধরে ছুটতে ছুটতে পাদানিতে লাফ দেয় এবং পা-টি পিছলে যায়। অফিসের সহকর্মী দাশগুপ্ত রাস্তায় উবু হয়ে থাকা উদয়কে টেনে তুলেই ধমকায়, "দরকার কি আপনার এই ভিড় বাসে ওঠার। বয়স হয়েছে, আর যে ইয়াং নন, এটা ভুলে যান কেন?"

দাশগুপ্ত আরো অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল কিন্তু উদয় তখন লজ্জায় কালা হয়ে গেছে। বাস স্টপের সবাই তার দিকে তাকিয়ে, অফিসের দুটি মেয়েও রয়েছে। হাসবার চেষ্টা করে উদয় বলল, "এই রকম ভিড়েই তো রোজ উঠি।"

"তাহলে পড়ে গেলেন কেন?"

উদয় চট করে জবাব দিতে পারল না। ··· কি কারণ সে দাখিল করতে পারে ! দাশগুপ্ত তো নিজের চোখেই দেখল পাদানি থেকে পা পিছলে গেল। "ধাক্কা দিয়েছিল।"

"মোটেই না। আপনি ছুটতেই পারেননি। বাসের স্পীডের সঙ্গে আপনার স্পীডটা মেলেনি। তাই আপনি পিছিয়ে পড়েছিলেন। তাই আপনার পা ফুটবোর্ড মিস্ করে। এভাবে বাসে উঠতে হলে আপনার বয়সটাকে কুড়ি-পঁচিশ বছর কমাতে হবে।"

প্যান্টে হাঁটুর কাছটা পিজে গেছে। গৌরী গজগজানি শুরু করল। হিসেবী কর্ত্রী, শক্ত হাতে সংসার চালায়, বাজে খরচ দেখলে তার মাথাগরম হয়ে যায়।

"আশি টাকা দিয়ে এই সেদিন করালে, দু'মাসও হয়নি, দরকার কি ছিল লাফিয়ে বাসে ওঠার ? বয়স কমছে না বাড়ছে, সে খেয়াল থাকে না কেন ?"

উদয় লুঙ্গি পরে খালি গায়ে চুপচাপ খাটে শুয়ে কাগজ পড়ে যায়। মাঝরাতে কলঘরে যাবার জন্য আলো জ্বেলেই সুইচের পাশে আয়নাটায় তার চোখ পড়ল। ইতস্তত করে তাকাল। অবশেষে এক পা এগিয়ে ঝুঁকে মুখটা আয়নাব কাছে আনল। গভীরভাবে সে নিজের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। মনে করতে পারল না শেষবার কবে সে এইভাবে নিজেকে দেখেছে। উদয় এখন নিজেকে অপরিচিত একজনের মুখোমুখি ভেবে নিজেকে বলল, এই লোকটা কবে থেকে আমি হলাম ! তার কাছে পুরো মুখটাই নতুন লাগল। কপাল থেকে চুল ইঞ্চি দুয়েক পিছিয়ে গেছে, পাক ধরেছে কানের উপরের চুলে, সকালে কামানো গালে হাত বোলাতে ঝিকিয়ে উঠল শাদা দাড়ি, থুতনির নিচের চামড়া দু' আঙুলে টানতেই বিনা যন্ত্রণায় অনেকটা লম্বা হল। নাকের পাশ দিয়ে ঠোঁটের কোল পর্যন্ত দুটো গভীর রেখা মাংসে ডেবে বসেছে। উদয় আরো লক্ষ্য করল, চোখদুটি যেন ঘোলাটে এবং ক্লান্ত। সে নিঃশব্দে বারদুয়েক হেসে উঠে দেখল, সারা মুখটা ভেঙেচুরে ধসে যাচ্ছে। চোখে একধরনের ভয় ফুটে উঠেছে।

উদয় আলো নিবিয়ে দিল। অদ্ভুত উত্তেজনার চাপে সে এখন অসহায় বোধ করছে। নিজেকে ফিসফিস করে শোনাল, "তাহলে এই রকমই কি ছিলাম ! হতেই পারে না। রোজই তো আয়নার সামনে চুল আঁচড়াই, দাড়ি কামাই। খেয়ালই হয়নি বদলে গেছি, আশ্চর্য তো !"

কলঘর থেকে ফিরে বিছানায় শোবার আগে অন্ধকারে আবার সে আয়নার সামনে দাঁড়াল। একবার মনে হল, ফট্ করে যদি এখন আলো জ্বলে ওঠে তাহলে সে অন্য একটা লোককে আয়নায় দেখতে পাবে। অনেক কম বয়স, দেখতে অনেকটা তারই মত।

উদয় তার কমবয়সী অবয়বের রূপটি তৈরি করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হবার পর মনে করতে পারল তার একটা ফোটো আছে। বিয়ের পরদিন গৌরীদের পাশের বাড়ির উঠোনে তোলা, চেয়ারে গৌরী কনের সাজে, তার পাশে দাঁড়িয়ে বরবেশে উদয়।

সকালে ছবিটা খুঁজে বার করল মেজছেলে খাটের তলার তোরঙ্গের পিছন থেকে। দালানে টাঙানো ছবিটা ওখানে গেল কি ভাবে? দেয়ালে রবারের বল মেরে ক্যাচ ধরা রপ্ত করতে গিয়ে বড় ছেলে ছবির কাঁচ ভাঙে। ভয় পেয়ে ছবিটা সে খাটের নিচে লুকিয়ে রাখে। সাত-আট-মাস সে বা গৌরী লক্ষ্যই করেনি দেয়ালে রেশন কার্ড মাপের ছবিটার জায়গা ফাঁকা রয়েছে। উদয় বিব্রত হল এবং হতাশও। মেঝেয় পড়ে থাকা, কাচভাঙা ছবিতে তার মুখটি, এবং আশ্চর্য শুধু তারই মুখটি ঝাপসা হয়ে চেনার অযোগ্য হয়ে আছে। ধুতি-পাঞ্জাবিতে ঢাকা দেহকাণ্ডটি কিছুই বোঝাচ্ছে না তার সম্পর্কে। তবে গৌরীর মুখটি অক্ষতই রয়েছে। ছেলেদের ধমক-ধামক দিয়ে গৌরী ফ্রেম থেকে ছবিটি খুলে আলমারিতে শাড়ির ভাঁজে রেখে দিল।

অফিসে তার সামনের টেবলে বসে রঞ্জিত কর। কথা বলে তড়বড়িয়ে, চেয়ারে খুব কম সময়ই পাওয়া যায়: ঘাড় পর্যন্ত চুল, পুরু গালপাট্টা, সরু কোমর। অ্যাজিটেশনের সময় স্লোগান দেওয়ায়, অফিসের স্পোর্টস, নাটকের রিহারসেলে বা অফিসারদের সঙ্গে চোটপাটে রঞ্জিতের সাহায্যের বা ঔদ্ধত্যের তুলনায়, অফিসে কেউ নেই। ফাইলে চোখ রেখে উদয় শুনছিল ওর কথা।

"আমাকে কিনা ছুরি চমকায়! সেদিনের ছোঁড়া সব, গলা টিপলে দুধ বেরবে, ছুরি দেখিয়ে বলে কিনা, বেশি হেঁক্কোড় দেখাবেন না। একটাকে মারলুম থাপ্পড় আরেকটাকে লাথি। যন্তর আনতে যাচ্ছি বলে সেই যে কেটে পড়ল, আসেনি।"

"ভাল কাজ করলে না রঞ্জিত।" অবনী চাটুজ্যে মাথা নেড়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, "এসব ছেলেছোকরাদের বিশ্বাস নেই। একটা কিছু করেও ফেলতে পারে। তখন কেউ তোমায় সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। তাছাড়া পাশের বাড়ির মেয়েকে উত্ত্যক্ত করছে কি না করছে তাতে তোমার কি আসে যায় বাপু। খোঁজ নিয়ে দেখ দোষ মেয়েটারও আছে।"

অবনী চারদিকে দৃষ্টি বোলাতে তিন-চারটি মাথা সায় দিয়ে দুলে উঠল।

"দোষ কার আছে তা নিয়ে তো আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু ব্যাপারটা বড় দৃষ্টিকটু, মানসম্মান ছিবড়ে হয়ে যায়। এ ধরনের অসভ্যতা সহ্য করা যায় না।"

"সে আর কি করবে, যা দিনকাল মুখ বুজে সহ্য করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তুমি আর মাথা গরম কর না বরং ওদের সঙ্গে কমপ্রোমাইজ করে নিও।

ছেলেপুলে নিয়ে তোমাকেও বাস করতে হয় তো, ঠিক কিনা ?"

অবনী চারদিকে তাকাতেই তিন-চারটি মাথা হেলে পড়ল।

উদয় উঠে গেল স্টাফ সেকশনে। দাশগুপ্তর টেবলে দোতলার দুটি ছেলে এসে গল্প করছে। ইন্টার-অফিস-টেবল টেনিস টুর্নামেন্ট শুরু হবে। অফিসের নামী প্লেয়ার দাশগুপ্ত।

"একটু দরকার পড়ে গেল দাশগুপ্ত, রঞ্জিত করের সার্ভিস ফোল্ডারটা একবার দেখতে হবে।"

"উদয়দার যত দরকার ঠিক এই সময়টাতেই। এখন আর আমি খোঁজাখুঁজি করতে পারব না, আলমারি খোলাই আছে আপনি বার করে নিন্।"

ফোল্ডার খোঁজার সময় উদয় ওদের কথায় দু-তিনবার কান পেতে বুঝল, এবারে তেমন একটা কেউ নেই যে দাশগুপ্তকে আটকাতে পারে। তবে প্রিয়তোষ আর দিব্যেন্দু ঘটক নামে নতুন ছেলেটি নাকি প্র্যাকটিস ভালই করছে। "ছুটির পর আজ যাব। ব্যাটের রবারটা একটু নরম নরম হয়ে গেছে। খোঁজ রাখিস তো কেউ যদি রবার বিক্রি করে, ষাট পর্যন্ত দিতে রাজি আছি।"

এরপর হাতের খোলা ফোল্ডারটিতে উদয়ের চোখ আটকে রইল। রঞ্জিত কর আর তার জন্মমাসটা একই। নিজেকে বলল, আমরা সমবয়সী, আশচর্য তো। অথচ ও কেমন যুবক। বাস থেকে পড়ে গেলে দাশগুপ্ত নিশ্চয় ওকে বলবে না 'আর যে ইয়াং নন এটা ভুলে যান কেন।' বললে হয়ত রঞ্জিত কর থাপ্পড় কষিয়ে দেবে। একদা যুবক ছিল প্রতিপন্ন করার জন্য ওর প্রমাণ দাখিলের দরকার হবে না। কিন্তু আমার ? এমন একটা কিছুও জমানো নেই যেটা সামনে ধরা যায়।

ছুটির পর কিছুক্ষণ স্টপে দাঁড়িয়ে থেকে উদয় ভাবল, এত ভিড়ে না ওঠাই ভাল। একটু এধার ওধার ঘুরে ফাঁকা বাসে উঠব। সে হাঁটতে শুরু করল ইডেনের পাশ দিয়ে গঙ্গার ধারে যাবার জন্য। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর ভিড় কিছুটা ফাঁকা হতে সে দেখতে পেল রঞ্জিত অন্তত পঁচিশ মিটার আগে চলেছে এবং পাশে একটি মেয়ে। ওরাও গঙ্গার দিকে যাচ্ছে।

উদয় কৌতূহলী হয়ে পড়ল। ওদের মন্থরতার সঙ্গে সমতা রেখে নিজেও মন্থর হল। রঞ্জিতের ডানদিকে মেয়েটি। হাতে একটি ব্যাগ ঝুলছে, কোন অফিসে হয়ত কাজ করে। অবিবাহিতা কিনা বোঝা যাচ্ছে না। বেশ নধর গড়নটি। লম্বা, ফরসা। উদয়ের মনে হল রঞ্জিতের ডান হাত মেয়েটির বাম উরুতে ধাক্কা দিচ্ছে। একটা ছোট রাস্তা পার হবার জন্য ওদের একবার থমকে দাঁড়াতে হল, তখন রঞ্জিতের ডান হাত মেয়েটির ডান কাঁধটা ধরেছিল, সেইভাবেই রাস্তাটা পার হয়ে হাতটা নামাবার সময়, উদয় স্পষ্টই দেখল,

মেয়েটির পাছায় বুলিয়ে নিল রঞ্জিত।

মনে মনে কুঁকড়ে গিয়ে উদয় চারপাশে তাকাল। এখনও দিনের আলো, রাস্তায়ও যথেষ্ট লোক কিন্তু কেউ লক্ষ্যাই করেনি ব্যাপারটা। ভয় পেল সে, এমন দৃশ্য আবার হয়ত দেখতে হবে। কিংবা রঞ্জিত মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে ভাববে, ফলো করছি। উদয় দ্রুত পাশের রাস্তায় ঢুকে পড়ে নিশ্চিন্ত হল এবং তখন মনে পড়ল মাত্র চারদিন আগে সে ঘুমন্ত গৌরীব পাছায় হাত রেখেছিল।একটু পরেই সে বিমর্ষ বোধ করে আবার আগের রাস্তায় ফিরে এসে রঞ্জিতদের দেখতে পেল না। দ্রুত হেঁটে গঙ্গার ধারে পৌঁছে খুঁজল এবং দেখতে না পেয়ে একটি বেঞ্চে বসে সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে সে বারকয়েক কেঁপে উঠল। রঞ্জিত আব আমি একই সালে জন্মেছি, এই কথাটি সে বারংবার নিজেকে শোনাল।

পরদিন উদয় ফাইলে চোখ রেখে উৎকর্ণ হল।

"না অবনীদা, ঝামেলা বোধহয় বাধাল। কাল রাতে বাড়ি ফিরে তোমার বৌমার কাছে শুনলুম ছোঁড়াগুলো বিকেলে বাড়ির সামনে খিস্তিখাস্তা করেছে, আমার নাম ধরেও অনেক কিছু বলেছে।"

"বলেছিলুম কিনা, সেই আজকালকাব ছেলে-ছোকরাদের বিশ্বাস নেই রঞ্জিত, এরা ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু করতে পারে।"

"দেখা যাক কি করতে পারে।"

"না না, ওসব দেখাদেখিতে আর যেও না, কমপ্রোমাইজ করে ফেল। বুঝলে কিনা, জীবন তো একটা বই দুটো নয়।"

অনেকক্ষণ পর সন্তর্পণে চোখ তুলে উদয় দেখল রঞ্জিত একদৃষ্টে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। চোয়াল দুটি শক্ত, দেখে উদয়ের বুকের মধ্যে বাতাস আটকে গেল। ছুটির পর দাশগুপ্তর সঙ্গে ওর দেখা হল সিঁড়িতে, ওর হাতে টেবলটেনিস ব্যাট।

"যাই একটু হাত-পা ছাড়িয়ে আসি। মাসদুয়েক ব্যাট ছুঁইনি।"

"দু-মাস এ আর এমন কি বেশি সময়। মানুষ কি স্কিল ভোলে কখন, মাজাঘষা করে নিলেই ঝকঝকে হয়ে ওঠে।"

"না উদয়দা, স্যাণ্ডুইচ রাবার ব্যাটে রেগুলার প্র্যাকটিস না থাকলে মুশকিলে পড়তে হবে। বছর কুড়ি আগে কাঠের ব্যাটে এসব ভাবনা ছিল না।"

দাশগুপ্ত দোতলার ক্লাবঘরের দিকে চলে গেল। তখন উদযের মনে পড়ল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ার সময় সে কলেজে চ্যামপিয়ন হয়েছিল টেবল টেনিসে। হিসেব করে দেখল আঠারো বছর আগের ঘটনা। রাস্তায় হাঁটিতে

হাঁটতে তার মনে পড়ল, কমনরুমে খেলাটা হয়েছিল। ফাইনালে সে আর থার্ড ইয়ার কেমিস্ট্রি অনার্সের অমলেন্দু, সম্ভবত মিত্তিরই, অমলেন্দু মিত্তির খেলেছিল। স্কোরটা সে ভুলে গেছে শুধু মনে পড়ছে শেষ গেমটা ডিউসে জিতেছিল। কুড়ি-কুড়ি, বাইশ-বাইশ তারপর চোখ বুজে বেপরোয়া দুটো স্ম্যাশ। ভাবলে অবাক লাগে, বোর্ডেই পড়েছিল। ক্লাসের তিন-চার জন কোলে তুলে নাচানাচির চেষ্টা করেছিল তখন চোখ ধাঁধিয়ে গেছল ফ্ল্যাশ বালবের আলোয়, চিন্ময় ছবি তুলেছিল কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপাবার জন্য। ওদের ফোটোগ্রাফির দোকান ছিল কলেজ স্ট্রিটে, এখনো হয়ত আছে। ছবিটা ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল কিনা উদয় জানে না। সেই ফাইনালের এক সপ্তাহ পরেই বাবা মারা যান। তারপর আর সে কলেজে যায়নি।

উদয়ের খেয়াল হল সে গঙ্গার দিকে এগোচ্ছে আর কিছু একটা দেখার জন্য এধার ওধার তাকাচ্ছে। লজ্জা পেল সে, ভাবল এটা বোধহয় একধরনের বিকার। থাকা উচিত নয়। সে গঙ্গার ধাবে একটি বেঞ্চে বসল প্রশান্ত চিত্তে সূর্যাস্ত দেখার ইচ্ছায়। ধীরে ধীরে রৌদ্রের তাপ, আলো, রাস্তায় যানবাহনের শব্দ, ফিরিওলার ডাক, নরনারীর কণ্ঠস্বর তার কাছ থেকে সরে গেল। ওপারে তাকিয়ে, সে নিঃসঙ্গ বোধ করল। অভিজ্ঞতাটা তার কাছে নতুন প্রায়। ব্যস্ত থাকার মত কিছুই আর নেই বলে মনে হচ্ছে। স্ত্রী সন্তান পরিবাব আর চাকরি এই মুহূর্তে একঘেয়ে অপ্রয়োজনের হয়ে উঠল। মাথা নেড়ে নিজেকে বলল, "কিছুই নেই, জমাবার কিছুই নেই, জমানাও কিছুই নেই। রঞ্জিত করই বেশ আছে।"

উদয় উঠে পডল বুকের মধ্যে মৃদু জ্বালা অনুভব করে।

কলেজ স্ট্রিটে ফোটোর দোকানটা খুঁজে নিতে উদয়ের অসুবিধা হল না। আগের দোকানের দবজার দুধারে ঝোলানো কাঁচের শো-কেসে অজস্র ফোটো। ময়লা চিটচিটে একটা সোফা। পালিশ-ওঠা বিবর্ণ কাঠের কাউন্টার। একটা লোক হেঁট হয়ে তুলি দিয়ে ফোটো রি-টাচ করছে। মাথার মাঝখানে টাক শুরু হয়েছে। দোকানে আর কেউ নেই।

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

লোকটি মাথা তুলল। উদয়ের দিকে তাকিয়ে ঘাড় হেলাল।

"বছর আঠারো আগে একটা ছবি তুলেছিল চিন্ময় নামে আপনাদেরই একজন। বোধহয় মালিকের ছেলে।"

উদয় বলতে বলতে থেমে গেল, তার মনে হচ্ছে সে চিন্ময়ের সঙ্গে কথা বলছে। তাকে থেমে যেতে দেখে লোকটি বলল, "হ্যাঁ আমিই চিন্ময়।"

"তাহলে তো ভালই হল। কলেজের টেবলটেনিস ফাইনালে একটা ছবি তুলেছিলেন—উইনারকে তিন-চারজন তুলে ধরেছে। পাওয়া যাবে ছবিটা ?"

"আঠারো বছর !" চিন্ময় সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ছবিটা বা ঘটনাটার কথা ভাবতে লাগল। উদয়ের ইচ্ছে করল বলতে, "আমিই সেই উইনার।"

"অতদিনের পুরনো নেগেটিভ আছে কিনা দেখতে হবে। সময় লাগবে।"

"কতদিন ?"

"কবে চাই আপনার ?"

"কাল কি পরশু।"

চিন্ময় মাথা নাড়ল, "অনেক খুঁজতে হবে, খরচও পড়বে।"

"তা দেব।"।

"ছবিটা আপনার নিজের ?"

নিরুত্তাপ ব্যবসায়িক কণ্ঠস্বর। অথচ একই ক্লাসের সহপাঠী। দোকান থেকে ক্যামেরা এনেছিল ক্লাসের ছেলে চ্যাম্পিয়ন হলে ছবি তুলবে বলে।

"না আমার এক বন্ধুর।"

তুলিটা উঁচু করে চিন্ময় হাতের ছবিটাব ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। উদয় ইতস্তত করে বলল, "তাহলে—"

"আসবেন, হপ্তাখানেক পর। আছে কিনা দেখতে হবে।"

উদয় সন্তর্পণে দোকান থেকে নেমে এল, যেন চিন্ময় টের না পায় সেদিনের উইনারের সঙ্গেই সে কথা বলেছে। কয়েক পা এগোতেই পিছনে দাশগুপ্তর ডাক শুনল।

"এখানে যে !"

"এসেছিলাম এই ফোটোর দোকানে।"

"ছবি তোলাতে ?"

দাশগুপ্তর সঙ্গে অফিসেরই একটি ছেলে। দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চাপা হাসল। মাথাটা গরম হয়ে উঠল উদয়ের। একটু তীব্রস্বরেই বলল, "দাশগুপ্ত, আমিও একসময় টেবলটেনিস খেলেছি। কলেজে আমি চ্যামপিয়ন হয়েছিলাম।"

"সেকি ! কই অ্যাদ্দিন একথাটা বলেননি তো ? উদয়দা, তা হলে এবার ইন্টার-অফিসে খেলুন। না না, কোন ওজর আপত্তি নয়। আপনারই কথা, মাজাঘষা করে নিলেই ঝকঝকে হয়ে যায়। কাল থেকে প্র্যাকটিসে আসুন।"

বাড়ি ফেরার পথে উদয় বিব্রত হয়ে ভাবল, রাজি হয়ে গেলাম ? এমন

বোকামি করার ইচ্ছা কেন হল !

উদয় পরদিনই অফিস ছুটির পর দোতলার ক্লাব ঘরে গেল।

দাশগুপ্ত সবাইকে শুনিয়ে বলল, "উদয়দা কিন্তু কলেজ চ্যামপিয়ন হয়েছিলেন। অনেকদিন তারপর আর খেলেননি। প্র্যাকটিসে আজ ওঁকে ধরে এনেছি। ইন্টার-অফিসে এবার খেলবেন।"

দাশগুপ্তই তার ব্যাটটা দিল খেলার জন্য। টেবলের ওধারে প্রিয়তোষ। ঘরের বারো-তেরো জোড়া কৌতূহলী চোখের সামনে মিনিট খানেকের মধ্যেই উদয় বুঝে গেল, ব্যাটের সঙ্গে বলের সম্পর্ক স্থাপনের কোন হদিশ সে পাচ্ছে না। অসহায় চোখে দাশগুপ্তর দিকে তাকাতেই সে বলল, "আপনি বোধহয় স্যাণ্ডুইচ রাবার ব্যাটে কখনও খেলেননি। আপনাদের সময় এ ব্যাট ছিল না।"

উদয় মাথা নাড়ল। চার বার সে ব্যাটে বল ঠেকিয়েছে, চার বারই ছিটকে বোর্ডের বাইরে পড়েছে। ব্যাটটা দাশগুপ্তকে ফিরিয়ে দিয়ে সে বলল, "আমার দ্বারা হবে না ভাই।"

"হবে হবে, যান্ খেলুন তো।"

ব্যাটটা উদয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে ধমকে উঠল দাশগুপ্ত। "আস্তে আস্তে বোর্ডে বল রাখার চেষ্টা করুন, শট নিতে যাবেন না।"

দশ মিনিট পর উদয় বোর্ডের উপর ব্যাটটা রেখে বলল, "আজ থাক্ বাড়িতে কাজ আছে।"

রাস্তায় বেরিয়ে এসে উদয়ের মনে হল, ওরা যেন তাকে নিয়ে আমোদ পাচ্ছিল। মনে হওয়ামাত্র সে রেগে উঠল। রাত্রে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে চোয়াল শক্ত করে দেখল, যেমনটি দেখবে ভেবেছিল তা হয়নি।

পরদিন উদয় ক্লাবঘরের পথ মাড়াল না। দাশগুপ্ত এসে অনুযোগ করল, "বলছি তো আপনাকে দিন চারেকের মধ্যে সড়গড় করিয়ে দেব, বিশ্বাস করুন, কোয়ার্টার ফাইনাল পযন্ত পৌঁছে যাবেনই।"

রঞ্জিত হঠাৎ মুখ তুলে বলল, "কিসের কোয়ার্টার ফাইনাল ?"

"উদয়দাকে বলছি টেবলটেনিস টুর্নামেন্ট খেলুন। একসময় কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন, তা জানেন কি ?"

"তাই নাকি ! কবে ?"

দাশগুপ্ত প্রশ্নটা চাহনি দ্বারা রিলে করে দিল উদয়কে।

"এই বছর আঠারো হল।"

"বাহ্, আমিও তো তখন কলেজে পড়তুম। আরে খেলুন খেলুন অফিস ছুটির পর আর করবেন কি ?"

উদয় ভাবল, সত্যিই আমার কিছু করার নেই। একা সূর্যাস্ত দেখা ছাড়া।

"ছুটির পর আপনি কি করেন?"

প্রশ্নটা করে উদয় নিজেই বিব্রত হল। রঞ্জিত কর কি জানতে পারবে, সে দেখেছে সঙ্গিনীর পাছায় হাত দেওয়া।

"কি আর করব, প্রেমিকাকে নিয়ে ঘুবি নয়ত মাল খেতে যাই।"

উদয় চট করে দাশগুপ্তর দিকে তাকাল। হাসছে দাশগুপ্ত, তার মনে পড়ল, চতুর্থ সন্তান ও গৌরীকে হাসপাতাল থেকে আনার সময় ডাক্তার তাকে বলেছিল এবার ভ্যাসেকটমি করে ফেলুন। গৌরীর দিকে তাকিয়ে সে হেসেছিল। নিশ্চয় দাশগুপ্তর মতই তখন দেখিয়ে ছিল। উদয় হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, "মাস্তানদের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করলেন?"

রঞ্জিত অবাক হয়ে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, "বলেন কি?"

তারপর রঞ্জিতের সারা মুখ, উদয়ের মনে হল, তার প্রতি ধিক্কারে ভর্ৎসনায় বা ঘৃণায় ফুলে উঠল ঘাড় থেকে দুটি পেশী লাফিয়ে ওঠায়।

ফাইলে চোখ নামিয়ে উদয় বলল, "দাশগুপ্ত, আজ যাব।"

বিকেলে জনা দশেক ছিল ক্লাব ঘরে। দাশগুপ্ত বলল, "ম্যাচ প্র্যাকটিস না করলে ঠিক সিরিয়াস চেষ্টাটা হয় না। উদয়কে নিয়ে সে তিন গেমের ম্যাচ শুরু করল। একজন বলল, "উদয়দা বাজি রেখে খেলুন, এক রাউণ্ড চা, দেখবেন তাহলে আরো এফর্ট দিয়ে খেলবেন।"

"বেশ, কিসের ওপর বাজি?"

"স্ট্রেট গেমে হারবেন না। হারলেই এক রাউণ্ড চা।"

আর একজন তাকে বাধা দিয়ে বলল, "না না অত সহজে চা খাওয়া চলবে না। পয়সা অত সস্তা নয়, উদয়দা আপনি রাজি হবেন না।"

দুজনের মধ্যে কৃত্রিম তর্ক শুরু হল। ব্যাট হাতে উদয় সকলের মুখের দিকে তাকাল। প্রত্যেকটি মুখে আমোদ। চাপা হাসিতে ভরা। ঘাড়ের কাছে পেশীগুলোর লাফিয়ে ওঠার জন্য উদয় অপেক্ষা করতে করতে বুঝতে পারল তার মুখেও কিরকম একটা হাসি নড়াচড়া করছে। ভয় তার বুকের মধ্যে থরথর করে উঠল।

"তাহলে ওই কথাই রইল, দশ নয় দাশগুপ্তকে প্রত্যেক গেম সাতের কমে নিতে হবে। নয়ত উদয়দা চা খাওয়াবেন না।"

মিনিট ছয়েকের মধ্যে দাশগুপ্ত প্রথম গেম জিতল ২১-৪। চারটি পয়েন্ট সে দিয়েছে দূর থেকে বোর্ডের লাইন ঘেঁষে স্ম্যাশ আয়ত্ত করার চেষ্টায় বাইরে বল ফেলে। উদয় সকলের মুখে সহানুভূতি দেখল। একজন বলল, "স্টেডি স্টেডি।

সাতটা পয়েন্ট যেভাবে হোক নিতেই হবে।"

বিড়বিড় করে উদয় বলল, "তোমাদের এই ব্যাটে কখন খেলিনি। বল এত জোরে যে যায়।"

দ্বিতীয় গেম উদয়ের সারভিস দিয়ে শুরু হল। পাঁচটি সারভিসে পাঁচ পয়েন্ট। পাঁচবারেই দাশগুপ্ত ইচ্ছে করে বল বাইরে মেরেছে। তবু উল্লাস ফেটে পড়ল ঘরটায়।

"উদয়দা, আর দুটো, শুধু দুটো পয়েন্ট চাই।" গেম জিততে হবে কেউ বলল না। ওরা বাজিরক্ষার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবছে না। হঠাৎ উদয়ের মনে হল, সে বড় একা। সূর্যাস্তের সামনে একা দাঁড়িয়ে। কোন শব্দ কোন বর্ণ, কোন স্পর্শ তার নাগালের মধ্যে নেই। শুধু দেখতে পাচ্ছে টেবলের ওধারে দাশগুপ্তর মুখটা অবহেলা আর তাচ্ছিল্যে রঞ্জিতের মতই হয়ে রয়েছে। একসময় সে শুনল কে চেঁচিয়ে বলছে, "সিকস-নাইনটিন, এবার দাশগুপ্তর সারভিস।"

"কাম অন উদয়দা, আর একটা পয়েন্ট।"

"হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। স্টেডি থাকুন, ওকে দুটো পয়েন্ট করতে দেবেন না।"

"কাম অন কলেজ চ্যাম্পিয়ন।"

দাশগুপ্তর মুখটা আর উদয় দেখতে পাচ্ছে না। শাদা ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। ঘাড়ের দুটো জায়গা দপদপ করছে। অন্ধের মত সে ব্যাট চালালো দুবার। দুটি স্ম্যাশেই বল পাশের দেয়ালে গিয়ে লেগেছে।

বাড়ি ফেরার সময় সে কাতরভাবে আশা করল নেগেটিভটা যেন চিন্ময় খুঁজে না পায়।

দুদিন পরেই উদয়ের খেলা। ফিক্সচার দেখিয়ে দাশগুপ্ত বলে গেল, আপনার অপোনেন্ট দিব্যেন্দু ঘটক, চেষ্টা করবেন ফাইট দেবার।

রঞ্জিত চেঁচিয়ে উঠল, "চেষ্টা মানে? চেঁচিয়ে ফাইট করিয়ে দোব! খেলা কখন, ছ'টায়? ঠিক আছে হাজির থাকব।"

খেলার দিন উদয় অফিসে এল না। দেড় বছর পর এই প্রথম কামাই। উদয় সারাদিনই বিছানায় শুয়ে কাটাল। তার প্রায়ই মনে হচ্ছিল সত্যিই বোধহয় জ্বর হয়েছে।

পরদিন অফিসে ঢোকার আগে সে নিজেকে জ্বরগ্রস্ত এবং বিমর্ষ দেখাবার চেষ্টা করতে করতে আর একবার মনে করে নিল দাশগুপ্তকে কি কি বলবে। অফিসের হলটা অন্যদিনের থেকে চুপচুপ। অবনী চাটুজ্যের টেবলে পাঁচ-ছ জন কথা না বলে বসে আছে। উদয় চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলে টেবলে জিনিস বার

করে রাখার সময় দেখল অবনী চাটুজ্যে ওর দিকে তাকিয়ে।

"জ্বর হয়েছিল।" উদয় সঙ্কুচিত হয়ে বলল।

"তাহলে তুমি শোননি। রঞ্জিত বোধ হয় আর বাঁচবে না।"

কয়েকটা ফ্ল্যাশবালব জ্বলে উঠল উদয়ের চোখের সামনে। অন্ধের মত সে তাকিয়ে বলল, "পাইপগান না ছোরায়?"

"পিঠে বোমা মারে। সেই অবস্থায় ঝাঁপিয়ে একজনের ছোরা কেড়ে নিয়ে তার পেটে বসিয়ে দেয়। তখন ওর মাথায় বোমা মারে।"

"তা হলে লড়েছিল।"

"হ্যাঁ লড়েছিল।"

"একজনকে তাহলে মেরেছে।"

"হ্যাঁ মেরেছে, সেও কাল রাত থেকে ওর সঙ্গে হাসপাতালে। দুজনই বোধহয় বাঁচবে না। অফিসের অনেকেই খবর পেয়ে নীলরতন হাসপাতালে গেছে। তুমিও যাবে নাকি?"

"হ্যাঁ যাব, আমরা একই সালে জন্মেছি।"

অফিস থেকে বেরিয়ে মন্থরভাবে হেঁটে উদয় গঙ্গার ধারে এল। দরদর করে সে ঘামছে। ধারে কাছে মানুষ দেখতে পেল না। ছাতি মাথায় দু-চারজন পথে চলেছে। গাছের ছায়া পাওয়া একটা বেঞ্চে বসে সে ঝিরঝির হাওয়ায় চোখ বন্ধ করে আরামে 'আহ্' বলে উঠল। কিছুক্ষণ পরে সে বেঞ্চে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

একটি মহাদেশের জন্য

আগামীকাল মধ্যরাত্রের ট্রেনে, এই মফঃস্বল শহর থেকে সরকারি কলেজের ইতিহাসের প্রধান ডঃ প্রফুল্ল ঘোষাল ও তাঁর স্ত্রী করবী চলে যাবেন। ট্রেনে চার ঘন্টার পথ, বিহার সীমান্তে একটি ক্ষুদ্র কলেজে অধ্যক্ষের পদ নিয়ে যাচ্ছেন। বিকেল থেকে ওরা গোছগাছ করছেন। আসবাব এবং ব্যবহার্য জিনিস নামমাত্র। এখানে এসে যে আসবাব কিনেছিলেন সেগুলি ওরা নিয়ে যাচ্ছেন না। বইয়ের র‍্যাক ও টেবলটি দিয়ে যাবেন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাইমারী বিভাগের হেডমিস্ট্রেস কুমারী গীতা বিশ্বাসকে ; চৌকি ও টুল নেবে মুন্সেফ অরুণ সোম, বেঞ্চ ও চেয়ারগুলি চেয়েছে এখানকার বৃহত্তম ওষুধের দোকান ও আড়তের মালিক পরিমল সাঁপুই ; উকিল মৃগাঙ্ক বসুমল্লিক মৃদু হেসে মাথা নেড়েছে। দু বছর এখানে থেকে ঘোষাল-দম্পতির সঙ্গে এই কজনেরই শুধু পরিচয়।

বিকেল উতরে গেছে। ঘরে আলো জ্বলছে। প্রফুল্ল র‍্যাক থেকে বইগুলি নামিয়ে মেঝেয় রাখছেন। করবী সেগুলি গুছিয়ে একটি চটের থলিতে ভরছেন। প্রফুল্ল নাতিউচ্চ, বলিষ্ঠদেহী, কাঁচাপাকা অবিন্যস্ত চুলে মাথা ভরা। চশমার কাচ পুরু। চোয়াল ভারি ও চওড়া। কথা বলেন ধীর ও মৃদু স্বরে ; আচরণে শান্ত ও গম্ভীর। ছাত্ররা কলেজে ওকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে সরে যায়।

পরিচিত কয়জনেই সন্ধ্যাবেলায় শহরের প্রান্তবর্তী এই একতলা বাড়িতে গল্প করতে আসে। যেদিন কেউ আসে না ওরা স্বামী-স্ত্রী বাইরের বারান্দায় চেয়ারে বসে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাসন্তীর মা রাত্রির আহার ঢাকা দিয়ে রেখে গৃহে ফেরার সময় অস্ফুটে 'মা যাচ্ছি' বলে চলে যায়। করবী তখন বলে, "গেটটা বন্ধ করে যেও।" করবীর কণ্ঠস্বর মিষ্টি, হাসিটিও। হাসলে দুই গালে টোল পড়ে। সে ছিপছিপে, দীর্ঘাঙ্গী, প্রফুল্লর সমানই লম্বা। বোধহয় উচ্চতা লুকোবার জন্যই ঈষৎ কুঁজো হয়ে থাকে। চুল কিছু পেকেছে। শ্যামবর্ণ গাত্রত্বক তৈলমসৃণ ও উজ্জ্বল, দীর্ঘ চোখ জোড়ায় কিছুক্ষণ তাকালে দর্শক ক্লান্তি ও বিষাদ অনুভব করে। প্রথম স্বামী মারা যাবার দেড় বছরের মধ্যে ওর দুটি ছেলেই মারা যায়। বড়টি বিমান বাহিনীতে শিক্ষার্থী পাইলট ছিল, পুণার কাছে তার বিমান

ভেঙে পড়ে ; ছোটটি ডায়মণ্ড হারবারে কলেজ-বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে যায়। এর ছয়মাস পর করবী তার কলেজের সহপাঠী প্রফুল্ল ঘোষালকে বিয়ে করে এই মফঃস্বল শহরে আসে।

"এভাবে হবে না", ভ্রূ কুঁচকে প্রফুল্ল বলল। "বইগুলো বাঁধতে হবে, দড়ি আনি।"

রান্নাঘরের পিছনে কলঘরসংলগ্ন অন্ধকার কুঠুরীটা অব্যবহৃত হঠাৎ দরকারী বিবিধ জিনিসে ভরা। সেখান থেকে প্রফুল্ল চেঁচিয়ে বলল, "টর্চটা আনতো, কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

টর্চ নিয়ে আসার সময় করবীর মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠল। রান্নাঘরে বাসন্তীর মা ব্যস্ত। কুঠুরীর সামনে এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে করবী বলল, "এই যে।"

প্রফুল্ল পাশ থেকে নিঃসাড়ে দ্রুত ওর গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে টান করে এঁটে ধরল। করবী ফাঁসটা আলগা করার চেষ্টায় দশ-বারো সেকেণ্ড টানাটানি করে ক্রমশ শিথিল হতে শুরু করল। প্রফুল্ল তখন চাপাস্বরে হেসে উঠে 'এটা চৌত্রিশ' বলে ধীরে ধীরে ওকে ছেড়ে দিতেই করবী কাত হয়ে দেয়ালে হেলে পড়ল। ঠিক এই সময়ই বাইরের বারান্দা থেকে উচ্চ পুরুষকণ্ঠে কে বলল, "ডক্টর ঘোষাল আছেন নাকি ?" প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার দিকে যেতে যেতে বলল, "অরুণবাবু নাকি, আসুন আসুন।"

প্রফুল্ল দরজা খুলে দিতেই টর্চ নিভিয়ে অরুণ সোম বলল, "মীরাও সঙ্গে এল দেখা করে যেতে।" বৈঠকখানার ভিতরে এসে বলল "ওরা কেউ আসেনি ?" প্রফুল্ল একথার উত্তর না দিয়ে স্মিত হেসে মীরাকে বলল, "আসুন, আপনি তো অনেকদিন পর এলেন। করবী বইগুলো গোছাচ্ছে এখনি আসবে।"

ঘোমটা আর একটু টেনে মীরা স্বামীর দিকে তাকিয়ে তারপর প্রফুল্লকে বলল, "রোজই আসব-আসব করি কিন্তু বাচ্চাদের জ্বর-জ্বারি তো নিত্যি লেগেই আছে। এখানকার দুধ-জল কিছুই ওদের সহ্য হচ্ছে না। ছোটটা কাল থেকে আবার পড়েছে পেটের অসুখে।" মীরার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ এবং ফ্যাঁসফেসে। সরু হাতে সোনার চুড়িগুলি এবং শাঁখাটি ঢলঢল করছে। সিঁথির চওড়া সিঁদুরে ও কপালের টিপে ওর শুভ্র দেহের রক্তাল্পতা ও শীর্ণতা প্রকট। তুলনায় ছত্রিশ বছরের সুদর্শন অরুণকে অন্তত দশ বছরের ছোট দেখায়। অরুণ প্রতিদিন ভোরে এক মাইল দৌড়ে এসে আধ সের দুধ খায়, রাতে ইংরেজি ডিটেক্টিভ বই পড়ে এবং নিয়মিত গল্প লিখে সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোয় পাঠায়, দু-একটি ছাপাও হয়েছে।

'শুনেছেন তো আজকের ঘটনাটা ?" চেয়ারে বসে অরুণ বলল। প্রফুল্ল

অবাক চোখে তাকাতেই সে উত্তেজিত হয়ে সিগারটে বাব করল। "স্টেশনের গায়েই সারি সারি দরমার তৈরি রিফিউজিদের যে দোকানগুলো রয়েছে তাব মধ্যে একটা চায়ের দোকানও আছে। প্রায় দেড় মাস আগে সেই দোকানদারের বৌ থানায় গিয়ে বলে তাব স্বামী তিন দিন যাবত নিখোঁজ। পুলিশ খোঁজ নিয়ে দেখল ওখানকার একটা যুবতী বিধবাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং দুই আর দুইয়ে চার ধরে নিয়ে ব্যাপারটা ওখানেই ধামাচাপা পড়ে। আজ সকালে দোকানের মাটির মেঝে খুঁড়ে দুটো লাশ পাওয়া গেছে। দুটোরই মাথার খুলিব পিছন দিকটা চুরমার অর্থাৎ পিছন থেকে ভারি কিছু দিয়ে—"

করবীকে ঢুকতে দেখে অরুণ থেমে গেল। সিগারেটের কাগজ ও তামাক প্রফুল্লর হাতে তুলে দিয়ে করবী হেসে মীরাকে বলল, "বাচ্চারা কেমন আছে? আপনার শরীরও তো ভাল মনে হচ্ছে না।"

শোনামাত্র খুশিতে নড়েচড়ে বসল মীরা। কিন্তু অরুণের বিরক্ত চোখে চোখ পড়ামাত্র নিরাসক্ত স্বরে বলল, "আমি ভালই আছি। কাল আপনারা চলে যাবেন তাই দেখা করতে এলুম।"

অরুণ ইতিমধ্যে সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছে। প্রফুল্ল মাথা নিচু কবে সিগারেট বানাতে ব্যস্ত। অরুণ গলা খাঁকারি দিল। করবী বলল, "গল্পটা শেয না কবা পর্যন্ত অরুণবাবু স্বস্তি পাবেন না, বরং শেষ করেই ফেলুন।"

"গল্প নয় মিসেস ঘোষাল, ফ্যাক্ট! আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি। বৌটাকে অ্যারেস্ট করে থানায় যখন ইন্টারোগেট করা হচ্ছে তখন আমি ছিলাম, এস-ডি-ও সাহেবও ছিলেন। নিজে থেকেই স্বীকার করল খুন করেছে। কী বীভৎস ব্যাপাব ভাবুন, দোকানটাব পিছনে একটা খুপবিতে থাকত আর খুন করে তারই তলায় মেঝের মাত্র দেডহাত নিচে দুটো ডেড বডি পুঁতে রেখে দেড়মাস তার উপর শুয়েছে! ভাবতে পারেন? অথচ এমন কোয়ায়েটলি সব কথা বলে গেল যেন—" অরুণ যুৎসই উপমা খোঁজার জন্য মুহূর্তেক অবসর নিতেই মীরা বলল "পাপ কখন কি চাপা থাকে!"

প্রফুল্ল বলল, "কার পাপ?"

মীরার বসার ভঙ্গিটা কঠিন হয়ে গেল। মেঝের দিকে তাকিয়ে হাত মুঠো করল এবং কাঁপা গলায় বলল, "কার আবার, স্বামীর পাপ।"

"আর যে খুন করল তার বুঝি পাপ হয় না!"

চোখ তুলে করবীর দিকে একবার তাকিয়ে মীরা একটু ভেবে বলল, "কি জানি।

তিনজনের কেউ কিছুক্ষণ কথা বলল না। নীরবতা ভাঙার জন্য প্রফুল্ল বলল,

"অরুণবাবু কাল সকালেই ভারি মালগুলো স্টেশনে পাঠাব বুকিংয়ের জন্য। আপনাব চৌকিটা নিতে কালই কিন্তু লোক পাঠাবেন।"

অরুণ অন্যমনস্কের মত মাথা কাত করল। বাইরে গেট খোলার শব্দ হল। গেট থেকে বারান্দা পর্যন্ত প্রায় পনেরো মিটার ইট-বাঁধান পথেব উপর দিয়ে জুতোর শব্দ এগিয়ে আসতেই অরুণ বলল, "পরিমলবাবু।"

দশাসই লম্বা মধ্যবয়সী পরিমল সাঁপুই ঘরে ঢুকেই বলল, "উকিলবাবু হেড দিদিমণি, ওরা এখনো আসেনি? একটু আগেই দোকান থেকে যেন দেখলুম দুজনকে রিক্শায় আসতে।"

শুনেই মুখ কাল হয়ে গেল অরুণের। বলল, "আপনি বোধহয় ভুল দেখেছেন।"

"আর যাই ভুল হক অরুণবাবু, চোখেব ভুল আমার হবে না। আগের মাসেও একজোড়া বুনো শুয়োর মেরেছি পঞ্চাশ গজ দূর থেকে। আব দুটো চেনামানুষকে পঞ্চাশ হাত দূর থেকে চিনতে পারব না?" পরিমল শেষ পর্যন্ত বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না।

অরুণ জবাব দিল না। প্রফুল্ল বলল, "আজ রোমহর্ষক একটা ব্যাপার নাকি শহরে আবিষ্কৃত হয়েছে?'

পরিমল তাচ্ছিল্যসূচক একটা শব্দ করে বলল, "ওরকম আকছারই ঘটে। আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বসব না, দোকানে একজনের আসার কথা। যেজন্য এসেছি বলিনি, একটা বড প্যাকিং বাক্সে মাল এসেছে, মজবুত খুব। আপনার দরকার লাগে যদি কাল পাঠিয়ে দেব।"

"ভীষণ দরকার, তাহলে দামী বইগুলো আর থলেয় ভরতে হয় না।" করবী উৎসাহভরে বলল।

"তাহলে চা খাওয়ান।" পরিমল হাত বাড়িয়ে অরুণের সিগারেট প্যাকেটটা তুলে নিল।

রিক্শার ভেঁপু বাজল রাস্তা থেকে। অরুণ চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে শরীরটাকে তুলে বাইরে তাকিয়েই আবার বসে পড়ল। পরিমল মুচকি হাসল। মীরা হাত মুঠো করে দেয়ালে তাকিয়ে রইল।

প্রথমে ঘরে ঢুকল গীতা। ত্রিশের কাছাকাছি বয়স। বাল্যে পোলিওয় ডান পা-টি পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ চিকিৎসায় সেরে উঠলেও এখন সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে। এই ঘাটতি অবশ্য দেহের অন্যান্য অংশ মনোরমভাবে পুষিয়ে দিয়েছে। মোটা ভুরুর নিচে ওর চোখদুটি সতত চঞ্চল। ঠোঁটদুটি পুরু এবং টসটসে, নাক চাপা, গলায় রক্তাভ জড়ুল। কণ্ঠস্বর ঈষৎ কর্কশ।

গীতার পিছনে পাঞ্জাবি ও ঢোলা পায়জামা পরা মৃগাঙ্ক, রুমাল দিয়ে ঘা মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে বলল, "আজ বড্ড গুমোট।" ধনী বনেদী পরিবারে সন্তান, প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সী মৃগাঙ্ক স্থূলকায়, টকটকে গায়ের রঙ, মাথায় অ টাক পড়েছে।

"ঠিক সময়েই এসেছে গীতা, চা করতে যাচ্ছিলাম আর অরুণবাবুও একা খুনের গল্প বলছিলেন।"

"কী খুনের?" বলেই গীতা খালি চেয়ারের দিকে এগোল।

"বাঃ শোননি", করবী বিস্মিত স্বরে বলল। "স্টেশনের ধারে এক চায়ে দোকানের মেঝে খুঁড়ে একজোড়া লাশ পাওয়া গেছে?"

"না তো! কি ব্যাপার অরুণবাবু?"

মীরা আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে করবীকে বলল,"এইসব গল্প দুবার শুনতে আমা ভাল লাগে না। চা করতে যাবেন তো চলুন, আমিও যাব।"

মীরা এবং কববী ঘব ছেড়ে যাবার পরও সবাই ভিতরের দরজার দিবে তাকিয়ে থাকল। মৃগাঙ্ক বলল, "আমি অবশ্য শুনেছি, কিন্তু এইরকম বীভৎস নোংরা একটা ব্যাপার নিয়ে কোন মহিলার সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছে হয়নি

গলা খাকারি দিয়ে অরুণ তিক্তস্বরে বলল, "এটা যে একটা বীভৎস ভালগা ব্যাপার তা আমি জানি। আমার পয়েন্ট হচ্ছে, একটি মেয়েমানুষ নিজের হাতে খুন করা দুটি লাশের উপর দেড় মাস শান্ত অচঞ্চল হয়ে কাটিয়ে দিল। কিভাবে সে পারল? ওই সময় সে নিজেই চায়ের দোকানটা চালিয়েছে, খদ্দেরদের সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলেছে, ঝগড়া করেছে, স্বামীর খোঁজ পাচ্ছে না বলে অনেকে কাছে উদ্বেগ পর্যন্ত প্রকাশ করেছে।"

প্রফুল্লব দিকে তাকিয়ে চাপা হেসে মৃগাঙ্ক বলল, "এটাকে সাবজেক্ট করেই অরুণবাবু একটা গল্প লিখে ফেলতে পারবেন।"

প্রফুল্ল বলল, "মন্দ কি, গল্প হয় না অরুণবাবু?"

অরুণ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। দ্বিধাজড়িত স্বরে সাবধানে বলল, "হতে পারে তবে এই দেড় মাস যে রকম স্বাভাবিকভাবে কাটিয়েছে তার একটা ব্যাখ্যা, মনে মধ্যে কি ঘটছিল, তার উৎপত্তি কোন উৎস থেকে এসব না বোঝা পর্যন্ত ধরনের সাবজেক্ট নিয়ে গল্প লেখা যায় না।"

"আমাদের মধ্যে নরহত্যা কেউই বোধহয় করেনি, তবে প্রাণী হত্যাকারী আছেন একজন।" প্রফুল্ল ঘাড় নেড়ে সহাস্যে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "হত্যা করার পর মনের মধ্যে কি কি ব্যাপার ঘটে তিনিই বলতে পারবেন।"

"আমি কিন্তু মশা মাছি ছারপোকা ছাড়া জীবনে আর কিছু হত্যা করিনি।

গীতা নকল গাম্ভীর্য দ্বারা আবহাওয়া লঘু করার চেষ্টা করল।

"কিস্‌সু ঘটে না। তখন একটা দারুণ একসাইটমেন্ট হয় বটে, তারপর যে কে সেই।" পরিমল ঝুঁকে অরুণের সিগারেট প্যাকেট আবার তুলে নিল। "জন্তু জানোয়ার মারা আর মানুষ খুন তো এক জিনিস নয়। মানুষ মারার উত্তেজনাটা অনেকদিন থাকে, হয়ত সারা জীবনই, যদি ধরা না পড়ে।"

মৃগাঙ্ক মন্থর স্বরে কাউকে উদ্দেশ্য না করে বলল, "এই উত্তেজনার উৎপত্তি কোন উৎস থেকে?"

ঘরটা চুপ করে রইল। এই সময় দূর থেকে পরপর তিন-চারটি বোমা ফাটার শব্দ এল। গীতা বলল, "এই এক ব্যাপার শুরু হয়েছে, সন্ধ্যের পর রোজ আওয়াজ করা। কি যে এর মানে বুঝি না।"

নড়েচড়ে বসল অরুণ। "এস ডি ও সাহেবের কাছে শুনলাম, কাল বড় তালপুরে জমি দখলের আন্দোলন শুরু হচ্ছে। জোতদাররাও তৈরি আছে। অনেকগুলো লাশ পড়বে মনে হয়।"

"কাল মিসেস বসুমল্লিককে দেখলাম ফুটবল গ্রাউণ্ডের মিটিং-এ বক্তৃতা দিচ্ছেন। মাঠটা কিন্তু ভরে গেছল।" গীতা এই বলে সপ্রশংস চোখে তাকাতে মৃগাঙ্কের মুখে বিরক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অরুণ জানে মৃগাঙ্ক তার স্ত্রীকে নিয়ে আলোচনা একদমই পছন্দ করে না। তাই বলল, "পরশু ওনাকে সিদ্ধেশ্বরীতলায় বক্তৃতা দিতে দেখলাম। দারুণ বলেন, লোকেরা খুব মন দিয়ে শুনছিল। কালকে উনিও নাকি বড় তালপুরে যাবেন।"

"সেকি! না না বারণ করে দিন মৃগাঙ্কবাবু।" গীতা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "খুনোখুনি হতে পারে। বলা যায় না—"

অরুণ বলল, "আমি এরকম একজন ফিয়ারলেস ওম্যান উইথ স্ট্রং পারসোনালিটি, সত্যি বলছি, কখনো দেখিনি। শুনলাম, বটারহাটে সেদিন জমি দখলের যে মারপিট হল, উনি নাকি তখন কাছাকাছিই ছিলেন। যেমন স্পিরিটেড তেমনি পরিশ্রমও করেন দিনরাত। আচ্ছা ক'বছর জেল খেটেছেন উনি, মৃগাঙ্কবাবু?"

টর্চের ব্যাটারি দুটো বার করে মৃগাঙ্ক তখন খোলের ভিতরটা গভীর মনোযোগে পরীক্ষায় ব্যস্ত। জবাব দিল না। অরুণ খুশি হল এবং বিষণ্ণ ভঙ্গিতে বলল, "শুনেছি জেল থেকেই নাকি ওনার শরীর ভেঙে যায়।"

পরিমল চুপচাপ সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। শেষ টান দিয়ে জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে হঠাৎ বলল, "এটা একটা নেশা, বুঝলেন মুন্সেফবাবু, পলিটিকসে

অনেক ভয় আছে। শিকারে যাই কেন, যেহেতু সেখানে ভয় আছে। জানোয়ার আমাকেও মেরে দিতে পারে। ওই ভয় থেকেই তো আসে উত্তেজনা। তখন ঝাঁ ঝাঁ করে শরীরের মধ্যে রক্ত ছোটাছুটি করে, ভারি আরাম হয়, নেশা-নেশা লাগে। তবে কি জানেন, শিকার তো আর রোজ রোজ করা হয় না।"

"তাহলে আপনি কি বলতে চান, মিসেস বসুমল্লিক—" অরুণ যোগ্য একটি শব্দের জন্য প্রফুল্লর দিকে তাকিয়ে দেখল, প্রফুল্ল এক দৃষ্টে জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। তখন সে গীতার দিকে তাকাল।

"আমার ধারণা, বাচ্চা থাকলে উনি এসব করতেন না।" গীতা গলা নামিয়ে কথাগুলো বলার সময় মৃগাঙ্ক এবং পরিমলকে দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করতে দেখল।

"ইয়েস, আমারও তাই মনে হয়", অরুণ হাঁফ ছেড়ে বলল। "একটা ভ্যাকুয়াম ওনার মধ্যে নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছে যেটাকে ভরাবার জন্য উনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন।"

"অরুণবাবু", গম্ভীর এবং নিস্পৃহ স্বরে মৃগাঙ্ক বলল। "আমরা মোটামুটি ভাবে শিক্ষিত এবং রুচির একটা স্তরেও পৌঁছেছি। আমরা নিশ্চয় কিছু কিছু বিধিনিষেধও মেনে থাকি, যেমন অপরের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে অযথা ও অনাবশ্যক আলোচনা প্রকাশ্যে না করা।"

অরুণ সকলের মুখের দিকে তাকাল. গীতা বিস্মিত, প্রফুল্ল বিব্রত, পরিমল কৌতূহলী। মুখ নিচু করে অরুণ বলল, "আই অ্যাম সরি, আমি মাপ চাইছি।"

ঘরে অস্বস্তিকর একটা আবহাওয়ার সঞ্চার হয়েছে। কি করে সেটা কাটান যায়, চারজনেই তা নিয়ে মনে মনে ভাবছে। গীতা হঠাৎ বলে উঠল, "এই যাঃ যেজন্য আসা সেটাই বলা হয়নি এতক্ষণ। কাল রাতে আপনারা দুজন কিন্তু আমার ওখানে খাবেন।"

"আবার কেন ঝঞ্ঝাট করা।" প্রফুল্ল আড়ষ্টভঙ্গিতে ক্ষীণ আপত্তি জানাল।

"হোক ঝঞ্ঝাট, একবারই তো। আপনাদের রাতের রান্নার পাট আর তাহলে থাকবে না।"

অরুণ ব্যস্ত হয়ে বলল, "দিনেও থাকা উচিত নয়। সকালে তাহলে আমার ওখানেই দুটি ঝোল-ভাত খেয়ে নেবেন।"

"না না অরুণবাবু, সকালে আমরা সময় পাব না। অনেকগুলো কাজ সেরে ফেলার আছে। বইগুলো এখনো বাইরে পড়ে। তাছাড়া ভারি মালপত্তর বিকেলের মধ্যেই স্টেশনে পাঠিয়ে দেব বুক করার জন্য। পরিমলবাবু আপনার প্যাকিং বাক্সটা কাল কখন পাঠাবেন?"

পরিমল কিছু বলার আগে ঘরে ঢুকল করবী এবং মীরা। পিছনে ট্রে হাতে

বাসন্তীর মা। ওর হাত থেকে ট্রে-টা নিয়ে টেবলে রাখতে রাখতে করবী বলল, "অরুণবাবুর গল্প বলা হয়ে গেছে তো ?

"গল্প নয় মিসেস ঘোষাল, ফ্যাক্ট।" অরুণ ঈষৎ আহত কণ্ঠে বলল, "বরং এটার উপর রঙ দিয়ে একটা গল্প লেখা হতে পারে। আপনি ভাবতে পারেন, একজন স্ত্রীলোক তার স্বামী আর একজন স্ত্রীলোকের মৃতদেহের দেড়হাত উপরে বিছানা পেতে দেড়মাস ধরে শুয়েছে ' কি করে পারল ? ইয়েস, মাত্র দেড়হাত !"

অরুণ থামামাত্র মীরা চাপা কণ্ঠে বলল, "এইসব খুনোখুনির গল্প কি করে যে আপনারা শোনেন। কেমন গা শিবশির করে শুনলে।"

মীরার কথাগুলো যেন শুনতে পায়নি এমনভাবে অরুণ বলে চলল, "আমি নিজে সেই স্ত্রীলোকটিকে থানায় আজ দেখেছি। অতি স্বাভাবিক মনে হল। একদম উত্তেজনা নেই, ভয়ও নেই। ঘোমটা দিয়ে বসে, যা জিজ্ঞাসা করছে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। একদম নির্লিপ্ত। অথচ দেড়মাস ধরে অপরাধটা লুকিয়ে রেখেছিল, অ্যাকসিডেন্টলি ধরা না পড়লে তো জানাই যেত না।"

"কি করে খুনটা করল ?" গীতার কৌতূহলে কিঞ্চিৎ উত্তেজনাও প্রকাশ পেল।

"আহ্।" মীরা চায়ের কাপ নেবার জন্য করবীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "আবার এইসব গল্প।'

গীতা ঘাড় ফিরিয়ে মীরার দিকে তাকাল। অরুণ রাগে মুখ লাল করে, অনাবশ্যক গলা চড়িয়ে বলল, "পিছন থেকে মাথায় কয়লাভাঙার লোহা দিয়ে মেরেছিল।"

"থাকগে এ সব আলোচনা।" মৃগাঙ্ক হেসে বলল। "মিসেস সোমের বোধহয় ভাল লাগছে না।"

"সারারাত ধরে গর্তটা খোঁড়ে একটা শাবল দিয়ে।"

"আমি এখন চলি। দোকানে একজনের আসার কথা। বাক্সটা কাল পাঠিয়ে দেব।" পরিমল খালি চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

"ছোট গর্ত, ওরই মধ্যে দুমড়ে মুচড়ে বডি দুটোকে কোনরকমে ভরে, মাটি চাপা দিয়ে বিছানাটা পেতে ঢেকে রাখে।"

"ভাল কথা", প্রফুল্ল তাকাল করবীর দিকে। "গীতা কাল আমাদের নেমন্তন্ন করেছে রাত্রে।"

"ওমা, আমিও তো করবীদিকে রান্নাঘরে বললুম আমাদের ওখানে খাওয়ার জন্য, কাল রাতেই।" মীরা উত্তেজিত হয়ে প্রফুল্লর দিকে তাকাল।

অরুণ দাঁতচাপা স্বরে বলল, "মিস বিশ্বাস আগে বলেছেন এবং ডঃ ঘোষাল অ্যাকসেপ্টও করেছেন।"

"তোমাকে ওর হয়ে ওকালতি করতে হবে না।" মীরা ক্ষিপ্তের চাহনিতে স্বামীকে বিদ্ধ করে রাখল কিছুক্ষণ। এই পরিস্থিতি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করার জন্য গীতা ঝুঁকে মৃগাঙ্ককে বলল, "আপনার তো বন্দুক আছে, শিকার-টিকার করেন না?"

"মাঝে মাঝে বেরই, তাও পাখিটাখি! আসলে আমি খুব ভীতু লোক তো।" মৃগাঙ্ক এমনভাবে হেসে উঠল যেটা এখন বিদ্রূপের মত ধ্বনিত হল। প্রফুল্ল আর করবী অসহায়ভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে লক্ষ্য করে অরুণ গোঁয়ারের মত বলল, "না, মিস বিশ্বাসের নেমন্তন্নই ওরা নেবেন, নেওয়া উচিতও।"

"কেন, আমার নেমন্তন্ন কি অপরাধ করল? আমি কি রাঁধতে জানি না ওর মত, না লোকের সঙ্গে কথা বলতে কি মিশতে পারি না?" বলতে বলতে মীরার ঠোঁটের দুই কোণে থুতু জমে উঠে।

গীতা কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে, কঠিন গলায় বলল, "সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে একটু বেশিই ছেলেমানুষী হচ্ছে যেন। আমি ববং আমার নেমন্তন্ন উইথড্র করছি।"

অরুণ ব্যস্ত হয়ে বলল, "সেকি, তা কেন হবে!"

"আমার স্কুলের কিছু কাজ বয়ে গেছে, আজ চলি।" গীতা উঠে দাঁড়াল। সাধারণভাবে হেসেই পবমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে সে তার পঙ্গু ডান পা টানতে টানতে বেরিয়ে গেল। ওর পায়ের শব্দ গেটের কাছে পৌঁছবার আগেই মীরা দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে বলে উঠল, "তুমি চাও আমার অপমান, আমি বুঝতে পারি, সব বুঝতে পারি।"

"চুপ কর!" কর্কশ স্বরে অরুণ ধমকে উঠল। হিংস্র দেখাচ্ছে ওকে। মীরা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। "বাড়ি চল।" অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে কারুর দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘব থেকে। মীরা ভীত চোখে ঘরের তিনটি লোকের উপর দিয়ে চাহনি বুলিয়ে দ্রুত স্বামীর অনুসরণ করল।

প্রত্যাশিত অপ্রতিভতা কাটিয়ে মৃগাঙ্কই প্রথম কথা বলল। "মিসেস সোম অরুণবাবুকে খুব ভয় করেন।" তারপর হেসে বলল, "অর্থাৎ পরিমল সাঁপুইয়ের যুক্তি অনুযায়ী নেশার ঘোরে আছেন।"

প্রফুল্ল তামাক দিয়ে কাগজ পাকাতে পাকাতে মাথা নিচু করে বলল, "এটা একটা গতানুগতিক ভয়। নেশা হবার মত উত্তেজনা এতে নেই। নেশা হয় সেই ধরনের ভয়ে যা দিয়ে অনুভব করা যায় জীবনকে। আপনার কি মনে হয়?"

প্রফুল্ল মুখ তুলে শান্ত চোখে মৃগাঙ্কের বদলে করবীর দিকে তাকাল। চেয়ারে বসে করবী। হাতদুটি কোলের উপর দুর্বলভাবে রেখে ক্লান্ত প্রফুল্লর দিকে তাকিয়ে।

"মানুষের শ্রেষ্ঠ ভয় মৃত্যুভয়। সেটা সামনে এসে দাঁড়ালে তখনই শ্রেষ্ঠ জীবনযাপন সম্ভব। মৃগাঙ্ক নিচু স্বরে কথাগুলো বলে থামল এবং কয়েক মুহূর্ত পরই দ্রুত যোগ করল, "কিন্তু ভয়েরও রকমফের আছে।"

"কি রকম?" পুরু লেন্সের ওধারে চকচক করে উঠল প্রফুল্লর চোখদুটি। মৃগাঙ্ক চুপ করে রইল।

"আপনি কখন ভয়ের মুখোমুখি হয়েছেন?" প্রফুল্ল আবার বলল।

অস্পষ্ট স্বরে মৃগাঙ্ক বলল, "আমার সন্তান নেই, হবার সম্ভাবনাও নেই।"

করবীর ভ্রূ কুঞ্চিত হল মৃগাঙ্কের কথায়। প্রফুল্ল দেশলাই জ্বালতে একটু দেরি করল। প্রথম ধোঁয়া ছেড়ে সে অনেকক্ষণ ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "সেই স্ত্রীলোকটি দেড়মাসের প্রতিটি মুহূর্তে জীবনের স্বাদ পেয়েছে। আমার মনে হয় না অরুণবাবুর পক্ষে গল্প লেখা সম্ভব।"

"মৃগাঙ্কবাবু, আপনি তো আবার বিয়ে করতে পারেন।" করবী ধীর সহানুভূতিসূচক স্বরে বলল।

"না।" মৃগাঙ্ক মাথা নেড়ে হাসল।

করবী বলল, "আপনি কি ভয়টাকে জীইয়ে রাখতে চান! কিন্তু এটা তো মোটেই ভয় নয়। মৃত্যুর মত এ ভয় অমোঘ নয়। ইচ্ছে করলেই আপনি এটা কাটিয়ে উঠতে পারেন।"

মৃগাঙ্ক শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। বাসন্তীর মা দরজার বাইরে থেকে ফিসফিস করে কি বলতেই করবী বলল, "কাল একটু সকাল-সকাল এস।" মৃগাঙ্ক চেয়ারে সিধে হয়ে টেবল থেকে টর্চটা নিয়ে কব্জি তুলে ঘড়ি দেখল।

"মৃগাঙ্কবাবু বোধহয় মানবিকতার শিকার হয়েছেন।" প্রফুল্ল তার ভারি গলায় লঘু সুরে হেসে উঠল। "কিন্তু আপনি কি অনুভব করেন না, এবার মানবিক বোধগুলোকে তাড়া করে হটাতে হটাতে তার ডায়মেনশ্যানকে বাড়িয়ে এমন কিছু জিনিস-এর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যাতে মনে হবে আমার মধ্যে গাঢ়-উষ্ণ একটা জীবন সব সময় নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে? এক ধরনের ফিজিকাল ভয়ের মধ্যে আমার মনে হয়, সব সময় বাস করা উচিত, সেটা পরমাণু বোমাই হোক আর কয়লাভাঙার হাতুড়িই হোক। বেঁচে থাকার এটাই শেষ অবলম্বন।"

মৃগাঙ্ক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনার কথাগুলো আমি ভেবে দেখব।"

রাস্তায় বেরিয়ে মৃগাঙ্ক টর্চ জ্বালার আগে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর মিনিট পাঁচেক হেঁটে খালের অন্ধকার নির্জন বাঁধে পৌঁছে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কিছুক্ষণ পর বাঁধ থেকে নেমে সে রওনা হল পরিমলের দোকানের উদ্দেশে।

রাস্তার টিমটিমে ইলেকট্রিক আলোয় মৃগাঙ্ক দেখতে পায়নি, কাছাকাছি হতেই সে অবাক হয়ে বলল, "একি, বাড়ি যাননি ?"

অরুণের হাঁটার ভঙ্গিতে মানসিক বিপর্যয়ের বিধ্বস্ততা স্পষ্ট। কণ্ঠস্বরে আরো স্পষ্ট। "মিস বিশ্বাসের কাছে অ্যাপোলজি চাইতে যাব ভাবছি, মীরার ব্যবহারের জন্য।"

"ওহ্।"

"কিন্তু চাওয়াটা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, আপনি এখন কোথায় যাবেন ? বাড়ি ?"

"পরিমলবাবুর দোকানে যাব।" মৃগাঙ্ক হাসল। এখন সেখানে যাওয়ার অর্থ অরুণ জানে। দোকানের পিছন দিকে একটা খুপরি আছে। রাত্রে সেখানে বসে পরিমল মদ খায়। তখন কেউ কেউ যায় সেখানে।

"চলুন আমিও যাব।"

মৃগাঙ্ক ইতস্তত করায়, অরুণ অধৈর্য হয়ে বলল, "এখন বাড়ি ফিরতে পারব না। আমার মাথার মধ্যে এখনও আগুন জ্বলছে। আপনি অনেক ভাগ্যবান যে আমার মত স্ত্রী পাননি।"

দোকানের পিছনের দরজা দিয়ে ওরা খুপরিতে ঢুকল। পরিমলের মুখোমুখি বসে গোলগাল বেঁটে একটি লোক। বেশবাসে সম্পন্নতার পরিচয়, মুখে উদ্বেগ। ওদের দুজনকে দেখেই সে টেবল থেকে হাতটা নামিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে পরিমলের দিকে তাকাল। পরিমল **অস্বস্তিভরে** এধার ওধার তাকিয়ে তারপর স্ফূর্তিবাজের মত হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "আরে আসুন আসুন।"

টেবলের উপর অর্ধ নিঃশেষিত রামের একটি বড় বোতল ও দুটি সদ্য সমাপ্ত গ্লাস। টেবলের নিচে কয়েকটি সোডার বোতল, দেয়ালের ধারে পাঁচ-ছটি প্যাকিং বাক্স। ওরা দুজন তার উপর বসল। পরিমল উঠে তাক থেকে দুটি গ্লাস এনে মদ ঢালতে ঢালতে লোকটিকে বলল, "মধু সোডা খোল্" তারপর অরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, "কি ব্যাপার ?"

অরুণ শুধু হাসল। মৃগাঙ্ক বলল, "ওঁরটা একটু কম করে দিও পরিমল, প্রথম দিনেই যেন গোলমাল করে না বসেন।"

পরিমল ভ্রূ কুঁচকে কিছু বলতে যাচ্ছে, তার আগেই অরুণ ব্যস্ত হয়ে বলল,

“কলেজ পড়ার সময় কয়েকবার খেয়েছি, কোন গোলমাল হয়নি।”

“বিয়ের পর নিশ্চয় খাননি ?” মৃগাঙ্ক গ্লাসটা পরিমলের হাত থেকে নেবার সময় মিটমিটিয়ে হাসল, অরুণ জবাব দিল না। হাত বাড়িয়ে সে টেবল থেকে গ্লাস তুলে নিয়ে দুই চুমুকে শেষ করে ফ্যালফ্যাল চোখে সকলের দিকে তাকাল।

পরিমল বিরক্ত হয়ে বলল, “কি ব্যাপার ?”

“মিস বিশ্বাসের কাছে ক্ষমা চাইবেন বলে রাস্তায় এতক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।” গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিয়ে মৃগাঙ্ক বলল।

পরিমল ‘অ্যাঁ’ বলে অরুণের গ্লাসে আবার মদ ঢেলে দিল। ওরা কথা না বলে খেয়ে চলল। এক সময় পরিমল বলল, “এ আমার বাল্যবন্ধু মধুসূদন দাস।”

লোকটি কাঁচুমাচু হয়ে বুকে দুই মুঠো ঠেকিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

“বস্।” পরিমল তর্জনী নাড়িয়ে নির্দেশ জানাল। টসটসে মুখ নিয়ে অরুণ তাকাল মধুসূদনের দিকে। তারপর পরিমলকে বলল, “ইনি বড় তালপুরের জোতদার, তাই না ?”

মৃগাঙ্কর গ্লাস ধরা মুঠোটা হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল, পরিমল অনেকক্ষণ সময় নিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল, মধুসূদন বিভ্রান্ত চোখে অরুণের দিকে তাকিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল টেবলে।

“আপনি কাল এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আপনার বন্দুক আছে কিন্তু আরো চাই। আপনি গুলি চালিয়ে মানুষ মারলে রেহাই পাবেন। আপনাকে এক হাজার লোক ঘেরাও করে কুপিয়ে কুপিয়ে মারলে তারাও রেহাই পাবে। সবাই রেহাই পাবে, শুধু আমি ছাড়া।” পাঠশালার পড়ুয়াদের মত দুলে দুলে অরুণ বলে গেল। মৃগাঙ্ক ও পরিমল তখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে।

“মধু আমার বন্দুকটা নিতে এসেছে, আমাকেও।” পরিমল মৃদুস্বরে বলল। “কিন্তু স্প্রিংটা সারাতে, দিন পাঁচেক আগে কলকাতায় পাঠিয়েছি। ও বলছিল কোথাও থেকে বন্দুক যোগাড় করে দিতে।”

অরুণ বলল, “উকিলবাবুর তো আছে।”

মৃগাঙ্ক অনেকক্ষণ সময় নিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল। পরিমলের গ্লাস ধরা মুঠোটা শক্ত হয়ে গেল। মধুসূদন বিভ্রান্ত চোখে অরুণের দিকে তাকিয়ে গ্লাসটা টেবলে নামিয়ে রাখল।

“তোর বউকে কাল যেতে বারণ করিস। এখানে কাল অনেক কিছু ঘটতে পারে।” পরিমল স্কুলজীবনের পর প্রকাশ্যে এই প্রথম মৃগাঙ্ককে ‘তুই’ বলল।

অরুণ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ে যেতে যেতে টেবলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। “সাবস্টিটিউট চলবে ? উকিলবাবুর বউয়ের বদলে আমার বউ

যদি ফিলডিং দেয়, আপত্তি আছে ?"

অরুণকে রূঢ়ভাবে টেনে তুলে পরিমল বসিয়ে দিল প্যাকিং বাক্সের উপর। মৃগাঙ্ক ধীর অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "বন্দুকটা কি এখুনি চাই ?"

মধুসূদন অস্বস্তিতে নড়েচড়ে, গলা খাঁকারি দিয়ে পরিমলের দিকে তাকাল। অরুণ হাঁটুগেড়ে বসে মৃগাঙ্কের পা জড়িয়ে ধরল। "আমার কিছু নেশা হয়নি মৃগাঙ্কবাবু, আমি বলছি সাবস্টিটিউট নেওয়ার অধিকার আছে। মীরা ক্যাচ-ট্যাচ ফেলবে না...জাস্ট ওয়ান বুলেট...আমি দাম দেব—"

পরিমল ওকে টেনে তুলে বলল, "এবার বাড়ি যান। আপনার নেশা হয়েছে।" তারপর অরুণকে ঠেলতে ঠেলতে দরজার বাইরে এনে বলল, "হেঁটে যেতে পারবেন তো ?"

"আমাকে আপনারা কি ভাবেন ? য়্যা, একটা কাওয়ার্ড ? আমি পারি, গীতা বিশ্বাসের সঙ্গে যা খুশি করতে পারি, কাউকে পরোয়া করি না। দেখবেন ? পারি কিনা দেখবেন ?"

অরুণ ঘুরে তাকিয়ে দেখল পরিমল নেই এবং দরজাটা বন্ধ। ঘাড় কাত করে সে কিছুক্ষণ একটানা ঝিঁঝির ডাক শুনল। চারদিকের অন্ধকারে চোখ বুলিয়ে, "কাওয়ার্ডস, অল আর কাওয়ার্ডস।" বলে ধমকে উঠে, কুচকাওয়াজের কায়দায় বাড়ির রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। ওকে দেখে হতভম্ব মীরা যখন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না তখন কাঁধ থেকে কাল্পনিক রাইফেলটি নামিয়ে, হাঁটু ভেঙে বসে, কাঁধে বাঁট রেখে, একচোখ বুঁজে অনেকক্ষণ তাক করে অরুণ চিৎকার করে উঠল, "দুম্ম।"

*   *   *   *

প্রফুল্ল আর করবী তখন বারান্দায় পাশাপাশি চেয়ারে বসে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। বাড়ির সব আলো নেবান। এক সময় প্রফুল্ল আলতো স্পর্শ করল করবীর বাহু। করবী ঘাড় ফেরাল।

"আর ভাল লাগে না।"

প্রফুল্ল বলল, "তোমার সাকসেস চব্বিশ, আমার চৌত্রিশ। তুমি কিন্তু একসময় এগিয়েছিলে"

"সংখ্যা দিয়ে কি হবে। জানি তো এটা সত্যি নয় শুধুই খেলামাত্র। সারাজীবনই এভাবে খেলা যায় না।"

প্রফুল্ল হাত সরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,

"আমার যেন মনে হচ্ছে ভ্রমণ করার মত আর কোন মহাদেশ আমাদের জন্য অনাবিষ্কৃত নেই।"

ক্লান্ত স্বরে করবী বলল, "কিন্তু আমাদের বেরতেই হবে নইলে বাঁচা যাবে না। আমি ব্যবধান বাড়াতে চাই অতীতের সঙ্গে। নেকড়ের মত ওরা খালি তাড়া করে, ধরতে পারলে ছিঁড়ে খেয়ে নেবে।"

এই সময় মৃগাঙ্ক তার শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে বন্দুকটা তুলে দেওয়ালে টাঙান নিজের ছবিটাকে তাক করছিল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আসার পায়ের শব্দ পেয়েই আলো নিবিয়ে সন্তর্পণে দরজার পাশে দাঁড়াল। বারান্দার অপর প্রান্তের ঘরটি ক্ষণপ্রভার। মৃগাঙ্ক আজ সারাদিন ওকে দেখেনি।

শীর্ণ বালিকার মত দেহ, হাতদুটি দড়ির মত ঝুলছে, মাথাটি এক পাশে হেলান, মৃগাঙ্কের সামনে দিয়েই নিঃশব্দে চলে গেল নিজের ঘরে। বন্দুকটি বিছানার উপর রেখে জানলার ধারের ইজি চেয়ারটাতে দেহ এলিয়ে দিল মৃগাঙ্ক। ধীরে ধীরে চিন্তার মধ্যে সে ডুবে গিয়েছিল, হঠাৎ তার মনে হল ঘরে কে ঢুকছে।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে ক্ষণপ্রভার অবয়বটি চিনতে পারল। বন্দুকের বাক্স আলমারির নিচেই থাকে। মৃগাঙ্ক দেখল, ও নিচু হয়ে বাক্সটি টেনে বার করল। হাতে তুলেই বোধহয় লঘু ভাবের জন্য বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন চাপাস্বরে মৃগাঙ্ক বলল, "আমি বার করে সরিয়ে রেখেছি। ওটা মধুসূদন দাসের লোক একটু পরে এসে নিয়ে যাবে।"

"কেন? তাতে আমাদের আন্দোলনের ক্ষতি হবে।"

"আমার কিছু আসে যায় না।"

ক্ষণপ্রভা বাক্সটা নামিয়ে রেখে মৃগাঙ্কের দিকে এগিয়ে এল। "বন্দুকটা আমাদের দরকার। এখন তর্কাতর্কি করার সময় আমার নেই, কোথায় রেখেছ?"

"কি লাভ এইসবের দ্বারা তুমি পাবে? কাল তুমি মারা যেতে পার।"

"হ্যাঁ", ক্ষণপ্রভার ঝকঝকে দাঁত অন্ধকারেও মৃগাঙ্ক দেখতে পেল। "মরার সম্ভাবনা কাল অনেকেরই আছে। তবে একটা শর্তে আমি যাওয়া বন্ধ করতে পারি।"

"কি শর্ত?" মৃগাঙ্ক উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল।

"সকলকে জানিয়ে দেব যে আমি বন্ধ্যা নই।"

"না না।" মৃগাঙ্ক কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে উঠল, "তা যদি কর আমি নিজে

তোমায় গুলি করে মারব।"

"কি লাভ তার দ্বারা তুমি পাবে ?"

মৃগাঙ্ক অবসন্নের মত বসে পড়ল। মাথা নাড়তে নাড়তে কাতর স্বরে বলল, "বোঝাতে পারব না তা, বোঝান যায় না। পুরুষ হলে বুঝতে পারতে।"

"আর তোমাকে পুরুষ করে রাখতে আমাকে সাজতে হয়েছে বন্ধ্যা।" ক্ষণপ্রভার স্বর ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠল। "কোথায় রেখেছ ?"

মৃগাঙ্ক অস্ফুটে বলল "খাটের ওপর।"

পরদিন সকালে মীরাকে হাসপাতালে পাঠাতে হল। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে অরুণ কলঘরে গিয়ে অর্ধ-দগ্ধ অচেতন দেহটি দেখতে পায়। ডাক্তার জানিয়েছে বাঁচবে কিনা কাল বলা যাবে।

দুপুরে ক্ষণপ্রভা ফিরে আসে পুলিশের সঙ্গে। বড় তালপুর যাবার পথেই সে গ্রেফতার হয়েছে। মৃগাঙ্ক জামিনে ছাড়িয়ে আনতে গিয়েছিল, ক্ষণপ্রভা রাজি হয়নি।

রাত্রে গীতার বাড়িতে আহারের পর প্রফুল্ল বলল, "ভেবেছিলাম তোমার এখানেই গল্প করে বাকি সময়টা কাটিয়ে দুজনে স্টেশনে রওনা হব। মালপত্র তো সবই পাঠান হয়ে গেছে।"

গীতা বলল, "তাহলে থেকে যান। ট্রেন তো মাঝরাতে, আমার কিচ্ছু অসুবিধা হবে না।"

করবী মাথা নিচু করে তালুতে মৌরী বাছতে বাছতে বলল, "পরিমলবাবু প্যাকিং কেসটা এমন সময়ে পাঠালেন যে বইগুলো ভরে পেরেক এঁটে সেটা অন্য জিনিসগুলোর সঙ্গে আর স্টেশনে পাঠান গেল না। ওটার জন্যই আমাদের যেতে হবে। রিকশা বলা আছে, পৌনে বারোটায় তুলে নিয়ে যাবে।"

"তাহলে এখন বাড়ি ফিরে আপনাদের তো অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার নেই! চলুন সঙ্গে যাই খানিকক্ষণ গল্প করে আসা যাবে।" গীতা টেবল থেকে টর্চটা নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঝি-কে বলল, "বেরচ্ছি গো। ফিরতে দেরি হলে তুমি আর জেগে বসে থেক না।"

ওরা তিনজন প্রধানত মীরা ও অরুণের কথা বলাবলি করতে করতে পৌঁছে গেল। গেট বন্ধ, বাড়িটা অন্ধকার। তালা খুলে ওরা বসার ঘরে ঢুকল। ঘরের আলো জ্বলতেই গীতা কাঠের বাক্সটা দেখে বলল, "বেশ বড় তো একটা মানুষ

প্রায় ধরে যেতে পারে।"

করবী হেসে বলল, "ছোটখাট মানুষ হলে ধরে যাবে তোমায় ধরবে না।"

"আমি এমন কিছু বিরাট নই, ঠেলেঠুলে এর মধ্যে ঠিক এঁটে যাব।" এই বলে গীতা প্যাকিং বাক্সটার উপর বসল এবং সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "উফ্ পেরেক। ঠিক মত বসান হয়নি।"

মুঠোয় মৌরী রয়ে গেছে। করবী হাত বাড়িয়ে প্রফুল্লকে বলল, "খাবে ?"

দু আঙুলে মৌরী নিয়ে প্রফুল্ল বাক্সটার উপর ঝুঁকে লক্ষ্য করতে করতে বলল, "তাই তো তিন চারটে পেরেক দেখছি বেরিয়ে রয়েছে ! পথে খোঁচা লাগতে পারে, খুলে বেরিয়ে যেতেও পারে।"

"লোহা-টোহা কিছু নেই ? বসিয়ে দেওয়া উচিত " গীতা ঘরের এধার ওধার তাকাল লোহার খোঁজে।

"দেখি আছে কিনা !" প্রফুল্ল ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের পিছন দিকে চলে গেল, এবং চেঁচিয়ে বলল, "টর্চটা আন তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

"গীতা তোমার টর্চটা দিয়ে আসবে ভাই।" মৃদু শান্তস্বরে করবী বলল, তারপর হাতের শেষ কয়েকটি মৌরী মুখে ছুঁড়ে দিল। গীতা বেরিয়ে যেতেই করবীর মুখ ধীরে ধীরে টসটসে হয়ে উঠল জ্বরগ্রস্তের মত। দুহাতে কপাল চেপে সে মাথা নিচু করে বসে রইল।

মিনিট পাঁচেক পর পায়ের শব্দে করবী মুখ তুলল। কয়লাভাঙা হাতুড়ি হাতে প্রফুল্ল দাঁড়িয়ে। ওর জিজ্ঞাসু চাহনির জবাবে প্রফুল্ল বলল, "বাক্সটা একবার খুলতে হবে। থলিটা আন বইগুলো তাতেই বরং ভরে নেওয়া যাবে।"

ক্লান্তি বিনিয়োগ

সিঁড়িতে দুজন উঠছে। শব্দের প্রকারে বোঝা যায় প্রতিযোগিতা হচ্ছে ওঠার। তিনতলাব ল্যাণ্ডিংয়ে একজন থেমে খিলখিল হেসে চারতলার সিঁড়ি ধরল। পিছনে তাকিয়ে উঠছেন দুহাতে আঁচলটাকে বুকে চেপে। তবু বাম বাহু উপচে আঁচল লুটোচ্ছে। উত্তেজনার ঝাপটে মুখ রক্তিম। চারতলায় পৌঁছবার মুখে সামনে তাকিয়ে দেখলেন পাশের ফ্ল্যাটের নির্মলবাবু সঙ্গে একটি পুরুষ ও স্ত্রীলোক ওর দিকেই তাকিয়ে চোখে কৌতূহল। সেই সময় সিঁড়ি থেকে অপর প্রতিযোগী হাঁসফাঁস করে বললেন, "রানু, আস্তে। তোমার হার্টের ট্রাবলটা কাল রাতেও···এভাবে তোমার কিন্তু···।" উনি পিছনে তাকিয়ে শেষ ধাপ অতিক্রম করে পা রাখতেই আঁচল জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

নির্মল এগিয়ে যাচ্ছিল। তার আগেই মহিলা চটপট উঠে লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটেব দরজায় প্রথমেই দুমদাম কিল বসালেন, কলিংবেল বোতাম টিপলে তাবপব।

"রানু কোথায় লাগল ?" বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে ওর স্বামী উঠে এলেন। প্রথমেই নজরে আসে মাথাজোড়া টাক ও দেহের হৃষ্টপুষ্ট আয়তন। বেড়িয়ে ফিরছেন তাই পরনে হাফপ্যাণ্ট, স্পোর্টস শার্ট ও কেডস।

"ডাক্তারের বারণ তবুও তুমি" উবু হয়ে তিনি স্ত্রীর গোড়ালিতে হাত রাখলেন।

"কিছু হয়নি, কিছু হয়নি।" আবও কয়েকটা অধৈর্য কিল দরজায় পড়ল। কলিংবেলও বাজল। এরমধ্যেই চাপা গলায় একবার বললেন, " পা ছাড়"।

ঝি দবজা খুলে ভীত মুখে তাকাল।

"ঘুমোচ্ছিলিস নাকি ?"

দরজা বন্ধ হবার পর নির্মল বলল, "আমার প্রতিবেশী। বেশ সুখেই আছে।"

অনন্তর স্ত্রী বলল, "দুজনের মধ্যে কিন্তু বয়সের তফাত অনেক।"

নির্মল জানাল, "প্রায় আঠারো বছরের। মিস্টার গুহ নিজেই বলেছেন উনি এখন পঞ্চান্ন, স্ত্রী আটত্রিশ। বিয়ে হয়েছে প্রায় সাত বছর।"

স্বামীকে লক্ষ্য করে অনন্তর স্ত্রী বলল, "কিরকম ভাইবোনের মত লাগছে না ?"

অনন্ত এতক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে ছিল। স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত না করে নির্মলকে বলল, "ওকে কিন্তু চেনা চেনা লাগল, নাম কিরে ?"

"কার ?"

"মহিলাটির।"

"মালতী গুহ।"

অনন্ত যেরকম মুখভঙ্গি করল তাতে যেন একটা রহস্য ঢুকে গেল।"সুখে থাকলেই ভাল। এবার তাহলে চলি। তুই কিন্তু বুধবার অবশ্যই যাবি, কেমন ?"

নির্মল ঘাড় নাড়ল। স্ত্রীকে নিয়ে অনন্ত সিঁড়ি ধরল। কয়েক ধাপ নেমেই হঠাৎ ফিবল। নির্মল তখন দাঁড়িয়ে। বালবটা কম পাওয়ারের। দেয়াল বিবর্ণ। জানলা দিয়ে বাস্তার গাছগুলো দেখা যায়। এত বড ফ্ল্যাট বাড়িটায় কোন সাড়াশব্দ নেই। অনন্তর মনটা ছমছম করে উঠল।

"তোর ভয় করে না একা থাকতে ?" হেসে নির্মল মাথা নাড়ল। অনন্ত নেমে গেল।

ঘরে আলো জ্বলছে। নিবিয়ে দুটো টেবলল্যাম্পই নির্মল জ্বালল। লম্বা টেবল। অভিধানগুলো সার দিয়ে হেলিয়ে রাখা। পাতাগুলো মৃতের চোখের মত খোলা। ল্যাম্পদুটো বইগুলোর মাঝে ঘাড় নুইয়ে। ঘরের অধিকাংশই চাপা অন্ধকারে ছাওয়া। দেয়াল ঘড়িটা টকটক শব্দ করে চলেছে। অতি ধীবে মাথার উপবে পাখা ঘুরছে। জানলা দিয়ে হাওয়া এলে পদার্টা ফুলে উঠে থরথর করে কাঁপে। নির্মল তখন সন্তর্পণে তাকায়। ষ্টীলের আলমারিটা অন্ধকারের কোণায় গায যেন অপেক্ষা কবছে।

দেয়ালজোড়া বইয়েব শেলফ। সে কলম রেখে বইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাইরের দরজায় খুটখুট শব্দ হয়। গয়ারাম দরজা খুলে দিল।

"নির্মলবাবু কি কাজে বসে গেছেন ?" বলতে বলতে পাঞ্জাবি-পাজামাপরা গুহ ঘরে ঢুকলেন।

নির্মল কুঁজো হয়ে বসেছিল। ঘাড় ফিরিয়ে হাসল।

"তখন দেখলেন তো কি জোরে পড়ল।" চেয়ার টেনে গুহ শুরু করলেন, "এই নিয়ে একচোট হয়ে গেল।"

"আপনাদের তো রোজই একচোট হয়।"

"কথা তো শুনবে না। ডক্টর সেনগুপ্ত তো বলেই দিয়েছেন পরিশ্রম একদম

চলবে না, কমপ্লিট রেস্ট। অথচ দেখলেন তো কিভাবে দৌড়ে উঠল।"

গুহ সুগন্ধি রুমালে ঘাম মুছলেন। নির্মল কলমটা টেবলে ঠুকল।

"আপনার এই ঘরটা কিরকম স্যাঁতসেঁতে লাগে বোধহয় অন্ধকার অন্ধকার বলেই, না ?"

"আপনি প্রত্যেকদিনই একথা বলেন।"

"প্রত্যেকদিনই যে এইরকম মনে হয়।" হঠাৎ টেবলের দিকে ঝুঁকে গুহ বললেন, "কদ্দূর এগোলেন।" একটুখানি উঠে টেবলে রাখা পাণ্ডুলিপি দেখতে দেখতে "ওরে বাবা, ডেথ-এ পৌঁছে গেছেন। অ্যাঁ এখুনি ডেথ, মৃত্যু ? নাউন বিশেষ্য, মরণ : জীবনাবসান ; হত, ধ্বংসকারী শক্তি ; অধ্যাত্মজীবনের অভাব...এটার মানে কি ?"

"কিসের ?"

"এই অধ্যাত্মজীবনের অভাব ?"

চেয়ারে মাথা এলিয়ে নির্মল বলল, "মানে আর কি, এমনিই।"

"বাঃ অভিধানে কি এমনি এমনি কোন কথা থাকে ?"

"থাকে না ? সব কথাই কি আমরা ব্যবহার করি !"

নির্মলের মনে হল, কথা বলতে শুরু করলে এ লোকটা জমিয়ে বসবে। এমনিতেই ক্লান্ত লাগে; তারপর বোকার মত প্রশ্ন করে যাবে। কাল বলেছিল, আপনি বিয়ে করেননি কেন ?

'শব্দ শুনে শুনেই তো পাবলিশার টাকা দেয়, তাই একটু বাড়িয়ে দিলাম।'

গুহ দুই হাঁটু নাড়তে শুরু করলেন। ব্যাপারটা যেন এখন বুঝে ফেলেছেন। "ফাঁকি দিয়ে লাভ করছেন তাই অধ্যাত্মজীবনের অভাব।"

"আচ্ছা মিষ্টার গুহ।" নির্মল কলম দিয়ে টেবলে টোকা দিতে শুরু করল। গুহ হাঁটু নাড়ান বন্ধ করলেন। "আচ্ছা, আপনার কি মৃত্যু-ইচ্ছা হয়েছে ?"

সঙ্গে সঙ্গে গুহ সিধে হয়ে বসলেন। ব্যগ্র হয়ে বললেন, "কেন, কেন, একথা বলার অর্থ ?"

"অভিধানে কথাটা আছে তো তাই বললাম।'

নির্মল সন্তর্পণে কলমে ঢাকনা পরাল। ধীরে ধীরে ঘুরে বসল। টেবলল্যাম্প ঘুরিয়ে দিল গুহর দিকে। অস্বস্তিতে চোখ পিটপিট করল গুহ।

"দেয়ালের আলোটা জ্বাললে হয় না ?"

নির্মল যেন শুনতেই পেল না। বারান্দার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে বলল, "একদিন তো মরতেই হবে আমাকে আপনাকে আপনার স্ত্রীকে সবাইকেই। সে কথাটা কি ভেবে দেখেছেন ? নিশ্চয় ভেবেছেন, কোন না কোনদিন ভাববেনই।

ত'ন কি মনে হবে ?"

"আলোটা একটু ঘুরিয়ে দিন না।"

নির্মল একদৃষ্টে গুহর দিকে তাকিয়ে রইল। গুহ হাত বাড়িয়ে ল্যাম্পটা সরিয়ে দিতে গেল। নির্মল ওব নাগালের বাইরে টেনে নিল।

"মনে হবে ভীষণ একা। পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপাবই নিরর্থক। যে দৃশ্যকে তারিফ করছি, যে নারীকে ভালবাসছি, যে সন্তানের মঙ্গল কামনা করছি এসবই ক্ষণস্থায়ী। এব পিছনেই ওৎ পেতে রয়েছে ধ্বংস, তাই না ?"

নির্মলের কণ্ঠস্বর ড্যাপচ্যাপে শোনাল। গুহ সুগন্ধি রুমালে মুখ মুছে অস্ফুটে বললেন, "আজ কেমন যেন গরম পড়েছে।"

"হ্যাঁ পাখাটা বাড়িয়ে দিন না।"

গুহ রেগুলেটর টেনে পাখার বেগ বাড়িয়ে এলেন।

"আপনার ঘরে বাইরের হাওয়াও আসে না!"

"হ্যাঁ।" নির্মল আলোটা ঘুরিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে গুহ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

"কি সব আজে বাজে কথা যে বলেন। সবই যদি নিরর্থক তাহলে এতসব গড়ে উঠত না।"

নির্মল চেয়ারে মাথা হেলিয়ে ক্লান্তভাবে বসে রইল। গুহ আর একটু উৎসাহভরে বললেন, "আপনার মত করে যদি সবাই ভাবত, তাহলে এর কিছুই হত না।"

"কি হত না ?"

"এই বাড়ি ঘর, রাস্তাঘাট, ছেলেপুলে।"

গুহব গাল ভরতি হয়ে গেছে কথার প্রাচুর্যে, বার-কয়েক ঢোঁক গিলে আবার বললেন, "আসলে কি জানেন, দিনরাত কুঁজো হয়ে চেয়ারে বসে এই একঘেঁয়ে কাজ করেন, বাইরে তো আমাদের মত বেরোন না, তাই। একটা কিছু করুন যাতে সুখ-শান্তি পাবেন।"

"সুখী লোকেরাই তো মৃত্যু-ইচ্ছার শিকার হয়। আপনারও হয় ?"

গুহ যেন ছুরিকাহত হলেন। "কি বলছেন, আমি!"

"নিশ্চয় আপনি সুখী একথা অস্বীকার করবেন ?"

নির্মল ঝুঁকে পড়ল। যেন ভূপতিত শিকারকে পর্যবেক্ষণ করছে। "আপনি সুখী নন ? আপনার স্ত্রী সুখী নন ?"

"নিশ্চয়।" গুহ শেষ চেষ্টার মত প্রায় চিৎকার করে উঠলেন। "কেন সুখী হওয়াটা কি দোষের ?"

"সুখ নিয়ে আপনারা কি করেন ? সর্বদাই তো ব্যস্ত সুখকে আগলে রাখতে।

এতে কি ক্লান্তি আসে না ? তখন কি মনে হয় না আরো বড় সুখ যাতে ক্লান্তি নেই, উদ্বেগ নেই, তার আশ্রয় নেওয়াই ভাল ?"

গুহ চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। একটি কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন।

নির্মল দেওয়াল ঘড়ি দেখল। আজ ওকে বিদায় করতে বেশি সময় লাগেনি। লেখার মাঝে এইভাবে এসে সব গুলিয়ে দিয়ে যায়। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন। নির্মল কলম খুলে লেখার দিকে তাকাল। ডেথ শব্দটির সঠিক ব্যবহার কিভাবে হয় উদাহরণ দিয়ে একটা বাক্য রচনা করতে হবে।

বইয়ের তাকগুলোর দিকে সে তাকাল। যে কোন একটা বই খুললে একটি বাক্য পাওয়া যাবেই। উঠে নামিয়ে আনতে হবে। খুঁজে বার করে লিখতে হবে, অনুবাদ করতে হবে। এর থেকে বরং বানিয়ে একটা বাক্য রচনা করে ফেলা যায়। কিন্তু বাক্যের শেষে ব্র্যাকেটে তাহলে কোন বড় লেখকের নাম দেওয়া যাবে না। লোকের ধারণা বড় লেখকরাই শুধু শব্দের যথাযথ ব্যবহার জানে। উজবুগ আর কাকে বলে। একটা চমৎকার বাক্য লিখে পাশে যদি শেকসপীয়রের নাম বসিয়ে দিই! চিটিং, ঠকানো হবে ? কাকে ? শেকসপীয়র, না এই অভিধানের পাঠককে! লোকটা তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে, মানহানির মামলা করতে আসবে না।

নির্মল হাসল। বানিয়ে লিখলে মন্দ হয় না। অন্যায় হবে বটে নিজের লেখা অন্যের নামে চালিয়ে দেওয়ায়। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি ? এতে আমারই সুবিধে কষ্ট করে উঠে তাক থেকে বই আনতে হবে না।

উঠতে হবে না এই ভেবেই নির্মল আরাম বোধ করল। একবার বাথরুমে যাওয়া দরকার। একটু পরে গেলেও চলবে। দুটো পা তুলে দিল, যে চেয়ারে গুহ বসেছিলেন। শব্দ করে আঙুল মটকালো। তারপর শূন্য দৃষ্টিতে পাণ্ডুলিপির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় চোখ বুঁজল।

হঠাৎ চটক ভাঙ্গল প্রচণ্ড শব্দে। একটা জেট বিমান নিচু হয়ে উড়ে যাচ্ছে। পিছনে যেন বিরাট পাথরের চাঙ্গড় বাঁধা। তারই ধাক্কায় বিশ্ব চরাচর চুরমার করতে করতে বিমানটি চলে গেল। সিধে হয়ে বসতে গিয়ে নির্মল টের পায় স্নায়ুকোষের প্রাচীরগুলো ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। বুকের মধ্যে দপদপ করছে।

কিছুক্ষণ পরেই এই বিধ্বস্তভাব কেটে গেল। ঘড়িটা টকটক করছে। দূরের কোন বাড়িতে নাছোড়বান্দা বেহালা-বাদকটি আজও সাধনা শুরু করেছে। এই দুটি শব্দ উদ্ধারকারীর মত, নির্মলকে টেনে তুলল। চোখে-মুখে জল দেবার জন্য সে বাথরুমে এল।

দুটি ফ্ল্যাটের বাথরুম পাশাপাশি। এ বাড়ির প্রতি তলাতেই তাই। বাথরুমের জানলায় গরাদ নেই, পাল্লায় ঘষা কাচ লাগানো। জানালা খোলা দেখে নির্মল বিরক্ত হল। পাশের ফ্ল্যাটে চোর ঢুকলে এই জানালা গলে কার্নিশে নামতে পারে। ড্রেন পাইপ ধরে ওপাশে হাত বাড়ালেই পাশের বাথরুমের জানলায় পৌঁছন যায়। গয়ারামকে জাগিয়ে তুলে বকুনি দেবার ইচ্ছাটি মুলতুবি রেখে সে জানালা বন্ধ করল। চৌবাচ্চায় মুখ ডুবিয়ে দিল।

জলে সন্তর্পণে নির্মল চোখ খুলল। ঘোলাটে আবছা। চৌবাচ্চার তলায় কালো কালো কি সব, সম্ভবত শ্যাওলা। ডান হাতটা নাড়তেই পর্দার মত কাল কাল শ্যাওলা দুলতে থাকল। মুখ তুলে নিল সে। দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

হাওয়ার জন্য নির্মল রাস্তায় ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সারি দেওয়া গাছের ডালপালা রাস্তার আলোকে চেপে ধরেছে ভূপৃষ্ঠে। ক্লান্ত হয়ে রাস্তা দিয়ে কেউ চলেছে। ঝুঁকে দেখল, পা টেনে টেনে একটা ষাঁড়। অজস্র নক্ষত্র। কেউ যেন একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে আকাশে চেপে নিবিয়েছে। নির্মল ঠাণ্ডা রেলিংয়ে কপাল ঠেকাল। এই গভীর রাত্রে নিঃসঙ্গতা প্রকট হয় অতি ধীরে।

গুহদের ফ্ল্যাটে নীল আলো জ্বলছে। প্রতিটি ঘরে, দালানেও। মিসেস গুহর ভূতের ভয়। রাত্রে ওর নাকি মনে হয় কে এসে গলা টিপে দেবে। মাসদুয়েক আগে ঠিক এইভাবেই নির্মল দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন মিসেস গুহ। নির্মল অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে যায়। গুহর টর্চের আলোয় বারান্দাটা তোলপাড় হয়। পরদিন তিনি জানান কেউ যেন বারান্দা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল বলে ওর স্ত্রীর মনে হয়েছিল। নির্মল বলেছিল উনি কি রাত্রে জেগে থাকেন এইসব দেখার জন্য? গুহ বলেন প্রতি রাত্রেই ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

একটা কুকুর তারস্বরে চিৎকার করতেই নির্মল শুতে গেল। শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ল। গয়ারাম তুলে দিল ভোরবেলাতেই। প্রকাশক এসেছে। দশ মিনিটেই কথা সেরে নির্মল আবার ঘুমিয়ে পড়ল। এ লোকটিকে আরও একটি হায়ার সেকেণ্ডারির নোট বই লিখে দিতে হবে।

বুধবার অনন্তর বড়ছেলের উপনয়ন। সেখানে পরিচিত একজনকে মাত্র নির্মল দেখতে পেল। সুধাংশু ষোল বছর কলেজে পড়াচ্ছে। পাঞ্জাবির গলার বোতাম আঁটা, কাঁধে পাট করা চাদর। গালদুটি তোবড়ানো।

"আমাদের আর থাকা না থাকা।"

নির্মলের প্রশ্নের জবাবে উত্তর দিয়েই সে বলল, "তুমি কলেজ ছাড়লে কেন?"

"এমনি। রোজ একঘেয়ে বকতে ভাল লাগছিল না।"

"বইগুলো তো বেশ ভালই চলছে।"

নির্মল হাসল। প্রায় চার বছর পরে দেখা।

"ছেলেপুলে কটি ?"

নির্মল হেসে মাথা নাড়ল।

"একটিও না।" এবং সঙ্গে সঙ্গে পালটা জিজ্ঞাসা, "শুনছিলাম একটা টিউটেরিয়াল করেছ ?"

সুধাংশু ঘাড় নাড়ল।

"কি রকম রোজগার হচ্ছে ?"

"বড্ড খাটুনির কাজ। দুজন পোষ্ট গ্রাজুয়েটকে রেখেছি। আমার বউও পড়ায়। অঙ্কটা ভালই পারে। বি-এতে তো অনার্স ছিল।"

সুধাংশুর স্তিমিত চোখে ঔজ্জ্বল্য দেখা দিয়েছে। নির্মল মুখ ফিরিয়ে ঘরের আর এক কোণের আলোচনায় মন দিল। হাসির কথা হচ্ছে।

"অসীমকে তো বললুম এবার তোব বউকে রেস্ট দে, তা হতচ্ছাড়া বলল··· ।"

বক্তা নিচুস্বরে কিছু বলল, হৈ চৈ করে উঠল বাকিরা।

"ওকে তো দেখি সন্ধ্যের পর চৌরঙ্গিতে ঘুরঘুর করে। বউ তো অনেক দিন শয্যাশায়ী।"

অনন্ত ভিতর থেকে এল। ঘামে টসটস করছে। গল্পগুজবের মাঝখানে বসল।

নির্মল মাথা হেলিয়ে সুধাংশুকে জিজ্ঞাসা করল, "সারাদিনে কি কর ?" কথাটা মাথায় ঢুকল না। সুধাংশু তাকাল অবাক হয়ে "কি করি মানে ?"

"টাকা রোজগার ছাড়া ?"

"আবার কি করব ?"

হঠাৎ অনন্ত চিৎকার করল, "এই নির্মল শুনে যা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তোর প্রতিবেশিনী সম্পর্কে।"

চমকে উঠল নির্মল। এরকম আসরে মিসেস গুহর কথা উঠল কি করে ! বলল,—"তুই তো আমার প্রতিবেশিনীকে সেদিন এক মিনিট মাত্র দেখলি।"

"আমাদের আগেব পাড়ায় ওরা যে ভাড়া থাকত। বেশ অবস্থাপন্ন, বাপ কোলিয়ারির ম্যানেজার ছিল।"

অনন্তর বন্ধু বলাই যোগ করল—"ওর বড় ভাই তখন বিলেতে গেছে ডাক্তারি পড়তে।"

"তখন ও মালতী দত্ত।" অনন্ত শুরু করল। "এখন যেবকম দেখতে তখনও ঠিক হুবহু তাই ছিল। প্রায় কুড়ি বছর তো হোল। চেহারা কিন্তু একটুও বদলায় নি। ইণ্টারমিডিয়েট পড়ত, ভবদেব নামে একটা ছেলে তখন এম-এ পড়ছে, ওকে পড়াত, ছাত্র ভাল। স্কলারশিপের টাকায় পড়ছে।"

"দেখতেও সুন্দর ছিল।" বলাই যোগ করল।

"তারপর যা হয় প্রেমে পড়ল দুজনেই। জানতে পেরে ধানবাদ থেকে বাপ ছুটে এল। ভবদেবের চাকরি গেল। কলেজে গিয়ে দেখা করত সে সুতরাং মালতীকে তখন পাটনায় পিসির কাছে পাঠান হল।

সেখান থেকেই একদিন ভবদেবের সঙ্গে সটকান দিল।"

"এই তোর গপ্পো! দ্যাখ, ওদিকে কদ্দূর, নটা বেজে গেল।" বক্তা হাতঘড়ি দেখল। অন্যান্যরাও ব্যস্ততা দেখাল। এইভাবে থামিয়ে দেওয়ায় অনন্ত অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল। এদের খেতে বসানর উদ্যোগ করতে, তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেবিয়ে গেল। নির্মল ঠিক করে ফেলল, বলাইয়ের পাশে বসে খেতে খেতে বাকিটুকু জেনে নেবে।

ফিরতে রাত হল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ই নির্মল টের পেল। গুহদের ফ্ল্যাটে গ্রামোফোন বাজছে। ওদের দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলল বাচ্চা চাকরটা।

"সায়েব আছে?"

নেই শুনে নির্মল ভাবল মালতী গুহর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলবে কিনা। অনন্তর বাড়ি থেকে এতটা পথ হেঁটে এসে ফুরফুরে লাগছে। গ্রামোফোন বন্ধ হল। খসখস চটির শব্দ। মিসেস গুহ এলেন।

"কি ব্যাপার, উনি তো এখনও আসেননি। অফিসে মিটিং আছে।"

নির্মল এই প্রথম লক্ষ্য করল মালতী গুহ বাড়িতেও ঠোঁটে রং ব্যবহার করেন।

"না, খুব কিছু দরকার নয়। সেদিন আপনার পায়ে লাগল, কেমন আছেন?"

"কোথায় লাগল!" মালতী গুহ বিস্মিত হলেন। "ওঁর কথা আর বলবেন না। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি, ভেতরে আসুন।"

নির্মল দেখল, বসবার ঘরে আগেরবার আসবাবের অবস্থান যেরকম দেখেছিল, এখন আর তা নেই।

"দেখছি, অন্য রকম করে সাজিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, এক রকম দেখতে দেখতে চোখ পচে যায়। নতুন করে অ্যারেঞ্জ করলে হয়কি নিজেকেই নতুন লাগে, তাই না?"

জবাব না দিয়ে নির্মল ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল।

"মিস্টার গুহর শিকারের শখটখ এখন আর নেই বোধহয়।"

মালতী গুহও ছবিটাব দিকে তাকালেন। বন্দুক হাতে বীরোচিত ভঙ্গিতে তাঁর স্বামী একটা মৃত চিতাব মাথায় পা দিয়ে। লক্ষ্য করার বিষয়, গুহর মাথা তখন চুলে ভরা।

"আমিই ওর শখটা ছাড়িয়েছি। আপনিই বলুন বিশ্রি নয়কি, এই অর্থহীন হত্যা ?"

"অর্থহীন বলছেন কেন, ওরা তো হিংস্র।"

"ওটা একটা অজুহাত মাত্র। বিবেককে সান্ত্বনা দেওয়া।"

উনি মিটমিট করে হাসছেন। বাবান্দা থেকে নিখিল এক সন্ধ্যায় দেখেছিল, গুহ শোবার ঘরের মেঝেয় বাঘ হযে হামাগুড়ি দিচ্ছে। খাটে দাঁড়িয়ে মালতী গুহ বন্দুকের মত ছড়িটাকে বাগিয়ে দুম করলেন। গুহ লুটিযে পড়লেন।

খাওয়াটা ভবপেট হয়ে গেছে।

এখন বিবেক-টিবেক নিয়ে তর্ক পোষায় না। ওটা তো আর বাইবের জিনিস নয় যে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া চলে।

"বুঝলেন, মিস্টার গুহ আমার ওপর খুব চটেছেন।"

"কেন ?"

"ওকে বলেছিলাম মানুষমাত্রেই কোন না কোন সময়ে মরতে চায়। বিশেষত যারা সুখী। তাইতেই উনি চটেমটে বেরিযে গেলেন।"

"ওর কথা আর বলবেন না।"

মালতী গুহ উঠে গেলেন ঘবেব কোণে টেবলে রাখা কাচের খাঁচার কাছে। ঝুঁকে রঙিন মাছগুলিকে দেখতে থাকলেন। নির্মলের মনে হল, স্বামীর কথায় অস্বস্তিতে পড়েছেন।

"তখন কি রেকর্ড বাজাচ্ছিলেন ? আমি অবশ্য ক্লাসিক গানের কিছুই বুঝি না।"

"আব্দুল করিমেব ঠুংরি।"

উনি সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। দীর্ঘ দেহ, ঋজু। পাতলা বাদামী চামড়া। দুটি হাত যেন রাজহাঁসের গলা। কুড়ি বছর আগে এই মহিলাটি কতটা আকর্ষণীয়া ছিলেন নির্মল তা অনুমানের চেষ্টা করল। ভবদেবকে দোষ দিলে অন্যায় হবে। ওব জন্যে এখনো মৃতেও চোখ খুলবে, কাপুরুষেও আত্মহননের সামর্থ্য দেখাবে।

নির্মলকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখে মালতী গুহ আঁচলটাকে বুকে আরো জড়িয়ে বাম বাহু পর্যন্ত টেনে নিলেন। চাবুক খেল নির্মল। কুঁকড়ে গেল সে।

সন্দেহ নেই, উনি ভেবেছেন এই লোকটা কলুষ চিন্তা করছে। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ভারি ভিজে কাঁথায় সে জড়িয়ে গেল। প্রাণপণে তা টেনে ফেলার চেষ্টায় বলল, "আপনার মত আমার এক বোন ছিল। মারা গেছে।"

"আহ্।"

মালতী গুহ যেন আঘাত পেলেন। "কি হয়েছিল?"

"নিউমোনিয়া। তখন আঠারো-উনিশ বয়েস। কলেজে পড়ত।"

"ভারি দুঃখের কথা। কেউ মারা গেছে শুনলে এত কষ্ট হয়।"

উনি আলতোভাবে সোফায় বসলেন। চোখে স্নিগ্ধ সহানুভূতি।

"আপনাকে দেখলেই ওর কথা মনে পড়ে। ওর মরার মুহূর্তে আমি পাশে ছিলাম।"

নির্মলের দম বন্ধ হয়ে আসছে। উনি কি বুঝতে পারছেন তার সামনে একটা লোক ভরপেট খেয়ে এসে ডাহা মিথ্যা বলে যাচ্ছে! প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে সে সচ্চরিত্র।

"আপনাকে খুব ভালবাসতো?"

"হ্যাঁ।"

"এখন কত বয়স হত?"

'আপনারই বয়সী। ঠিক আপনার মতই লম্বা, গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গিটাও। যখন ওখানে ঝুঁকে মাছ দেখছিলেন, চমকে উঠেছিলাম। মনে হল ও এসে যেন দাঁড়িয়েছে। ভীষণ ভয় লেগেছিল। প্রায় কুড়ি বছর আগে শেষ দেখেছি।"

নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে সে যেন আরো জড়িয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে বানিয়ে বানিয়ে এক ঘণ্টা ধরেও বলা যায়। কিন্তু কেন তা বলতে হবে! নির্মল নিজের ওপর রাগতে শুরু করল। এ ধরনের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। কৈফিয়তের মত এত কথা বলতে হচ্ছে কেন?

"আপনার বোনের নাম কি ছিল?"

"মিনু, মৃন্ময়ী।"

"অসুখ হল কেন?"

"যেভাবে হয়, ঠাণ্ডা লেগে। রাগ করে সারারাত ছাদে শুয়েছিল। ঝগড়াটা হয়েছিল আমার সঙ্গেই, একটা গল্পের বই নিয়ে।"

"খুব অভিমানী ছিল?"

"হ্যাঁ। জেদীও।"

"নিশ্চয় খুব আদর পেত।"

"বাড়ীর একমাত্র মেয়ে ছিল।"

বলেই নির্মল উঠে দাঁড়াল। একটা পচা গন্ধ পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে।

"যাচ্ছেন।"

মালতী গুহও উঠে দাঁড়ালেন। নির্মল অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। ওর কাঁধ রাজহাঁসের গলাব মত। তবে এখন তাকালে ভাববেন না যে লোকটার দৃষ্টিতে নোংরামি আছে। বরং ভাববেন আহা, মৃত বোনকেই দেখছে। এই দেখায় সাহায্য করে বেশ খুশিও বোধ করবেন।

"হ্যাঁ যাই।"

"চা-ও দেওয়া হল না।"

"তাতে কি হয়েছে? তাছাড়া এইমাত্র একটা নেমন্তন্ন খেয়ে আসছি।"

মালতী গুহ দরজা পর্যন্ত এগিযে এসে বললেন, "মাঝে মাঝে তো আসলেই পারেন।"

নির্মল হাসল মাত্র।

গয়ারাম দরজা খুলে দিল। নির্মল ফিরে এসে শুয়ে পড়ল।

সে মাঝরাতে অন্ধকার হাতড়ে টেবলল্যাম্প জ্বালল। ড্রয়ার থেকে নীল প্যাড ও লাল কালিব কলম বাব করল। কয়েক মুহূর্ত ভেবে বাঁ হাতে ধরে ধরে কয়েকটা কথা লিখল : মালতী, শান্তি পাচ্ছি না কেন। বারবার তোমাকেই শুধু মনে পড়ে। ভবদেব।

শুধু এই কটি কথা। লেখাটার দিকে তাকিয়ে নির্মল হাসছে। কুড়ি বছর আগে ভবদেব আত্মহত্যা কবে মরেছে নারীহরণ মামলার আসামী হতে না চেয়ে। মালতী এ চিঠি পাওয়ামাত্রই জানবে অন্য কেউ লিখেছে। অভিধানের খোলা পাতায় চোখ পড়তেই থেমে গেল। দ্রুত বইগুলো বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর তার মনে হল, কেউ যখন দেখতে পাচ্ছে না তখন ভয় পাওয়াটা অহেতুক।

সকালে গুহ এলেন। ভারি চিন্তিত।

"ট্যুরে যেতে হবে কিন্তু কি মুশকিলে পড়লুম বলুন তো! রাণু কান্নাকাটি শুরু করেছে।"

"কেন এর আগেও তো গেছেন।"

"তাই তো বললুম। কিন্তু কি হয়েছে, কিছুতেই যেতে দেবে না। খুব জরুরি ব্যাপার। মার্কেটিং-কন্ট্রোলার নিজে কাল বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে বললেন।"

গুহ শিশুর মত তাকিয়ে রইলেন। রাগ চড়তে শুরু করেছে নির্মলের। কিন্তু হেসে বলল, "কারণটা কি?"

"কি জানি। এরকম মাঝে মাঝে একগুঁয়ে হয়ে যায়। কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চায় না। তাছাড়া জানেনই তো ভূতের ভয় আছে। প্রত্যেক রাতেই চমকে চমকে ওঠে।"

"নির্দিষ্ট কারণ যখন নেই, এক্ষেত্রে আমিই বা আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি!"

গুহ চলে গেলেন। নির্মল ড্রয়ার তন্ন তন্ন করেও একটা খাম পেল না। নীল চিঠিটা নিয়ে সে বেরল ডাকঘরের দিকে।

ডাকপিওন সকাল দশটা নাগাদ এ বাড়িতে চিঠি বিলি করতে আসে। পরদিন সাড়ে নটা থেকে নির্মল বারান্দায়। রাত্রে চমৎকার ঘুম হয়েছে। সকালটাও ঝরঝরে। তাছাড়া এইমাত্র একটা স্কুলের বাস গেল। ফুটফুটে একটা ছেলে তার দিকে হাত নেড়ে গেছে।

পিওন আসছে। এ বাড়িতে না ঢোকা পর্যন্ত নির্মল বারান্দায় রইল। তারপরেই ছুটে এসে দরজা প্রায় সিকি ইঞ্চি ফাঁক করে অপেক্ষা করতে লাগল। গুহদের দরজায় লেটার বকসটা দেখা যাচ্ছে।

দোতলায় কলিংবেলের শব্দ হচ্ছে। সায়গলদের চিঠি, ডেকে দিতে হয়। হঠাৎ দরজাটা খুলে যেতেই নির্মল চমকে সরে গেল। গুহ অফিস যাচ্ছেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সে আবার দরজার ফাঁকে চোখ রাখল। তার এই উপস্থিতি বাইরে থেকে টের পাওয়া সম্ভব নয়।

মালতী গুহ দাঁড়িয়ে। খসখস শব্দটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। ওদের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নির্মল পিওনের পায়ের শব্দের অপেক্ষায় থেকে বুঝল এতক্ষণে তার ওপরে আসা উচিত ছিল। হতাশ হয়ে সবে আসামাত্র রাস্তা থেকে গুহর চিৎকার শুনল। পা টিপে বারান্দায় এসে নির্মল উঁকি দিল। পিওন চলে যাচ্ছে। গুহর হাতে একটা খাম।

"তোমার চিঠি।"

গুহ খামটা মাথায় তুলে নাড়ল। মিসেস গুহ বারান্দায়। নির্মল ভিতরে সরে এল। একটা বুরুশ যেন শিরাগুলোর মধ্যে ঘষে যাচ্ছে। ময়লা পলি সাফ হয়ে যাওয়ায় রক্তের ছোটাছুটি বেড়ে গেছে, তাই ঠকঠক করে তার হাত পা কেঁপে উঠল। চেয়ারে হেলান দিয়ে কাঁপাগলায় আর এক কাপ গরম চা দেবার জন্য গয়ারামকে হুকুম দিল।

গুহ আবার এলেন সন্ধ্যেবেলায়। খুব ব্যস্ত।

"আপনার ওডিকোলন আছে? দুপুর থেকেই রাণুর ভীষণ মাথা ধরেছে। উঠতে পারছে না।"

"না, নেই।"

গুহ দ্রুত চলে গেলেন। নির্মল মুচড়ে পাক দিয়ে টেবিলের উপর মুখ গুঁজরে পড়ল। কাকপক্ষীতেও ওর হাসি টের পেল না। ঘড়িতে সাতটা বাজল। নির্মল খবরের কাগজ খুলে সিনেমার পাতাটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকল। আধ ঘণ্টা পর শিস দিতে দিতে সে ফ্ল্যাট থেকে বেরল।

ফিরল প্রায় বারোটায়। রাস্তা থেকে দেখল গুহদেব শোবার ঘরে সাদা আলো জ্বলছে। বোধহয় মাথাধরাটা সারেনি। সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে উঠল। টের পেলেই গুহ হয়ত মাথাধরা সারানোর পবামর্শ চাইতে বেরিয়ে আসবে। নির্মল ওদের লেটার বক্সটায় আস্তে একটা টোকা মারল।

শুতে যাবার আগে সে নীল প্যাড আর লাল কলম নিয়ে বসল। আটটি খাম কিনেছিল, সাতটা রয়েছে। বাঁ হাতে ধরে ধরে সাতটি চিঠি লিখল। প্রতিটিতে একই কথা। দুদিন অন্তর একটি করে ডাকে ফেললেই দু-সপ্তাহ কেটে যাবে। নির্মল একটি ব্যাপারে ফাঁপরে পড়ল। গুহ ফ্ল্যাটে থাকাকালীন যদি দেখেন দুদিন অন্তর বউয়ের নামে চিঠি আসছে তাহলে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবেন, নিশ্চয় কৌতূহলী হয়ে লুকিয়ে পড়বার চেষ্টা করবেন। নির্মলেব তা মোটেই অভিপ্রেত নয়। দুপুরের শেষে একবার পিওন আসে। সেই ডাকটাকে কাজে লাগাতে হলে কোন সময়ে চিঠি ফেলা দরকার সেটা আবিষ্কার করতে হবে।

বিছানায় শুয়ে নির্মল এই সমস্যাটার কথা ভাবছিল তখন খুব শব্দ করে একটা জেটবিমান উড়ে গেল। বহুক্ষণ ধরে বেহালার যে ক্যানক্যানে সুরটা আসছে তার অবশ্য কোন হেরফের ঘটল না।

এরপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে পিওন আসার সময় হলেই নির্মল বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দরজাটা সামান্য ফাঁক করে চোখ পেতে দেয়। পিওন বাক্সে খামটা ফেলে যায়। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে সে। ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারি শুরু করে। আবার দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। বাক্সেব পাল্লায় চৌকো একটা কাচ লাগান। ফিকে নীল খামটা রয়েছে বোঝা যায়। নির্মলের তখন ইচ্ছে করে ওদের দরজায় টোকা দিয়ে বলে আসে আপনাদের একটা চিঠি এসেছে। কিংবা একটু পরেই হাজির হয়ে বলে, এই যে এলাম। না এসে থাকতে পারি না। আপনাকে হুবহু আমার বোনের মত দেখতে।

এর মধ্যে একদিন সে লক্ষ্য করল মিসেস গুহ দুপুর থেকে তাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। স্নান করেননি। চুলে জট। মুখে প্রসাধনের স্পর্শ নেই। দেহটি নুয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে চোখ সরু করে রাস্তার বহুদূর পর্যন্ত দেখছেন। চোখের কোলে অনিদ্রার কালি। রৌদ্রে পুড়তে পুড়তে তিনি কয়েকবার চোখ বুঁজলেন।

নির্মলের মনে হল, মালতী গুহের অজস্র বয়স। যেন পোকা লেগেছে। ভেতরটা ফোঁপরা হলেও কোন রকমে খাড়া রয়েছেন। কিন্তু টের পেয়ে গেছেন আর প্রয়োজন নেই। ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে চলে যাবার তোড়জোড় চোখের চাউনিতে।

নির্মল ওর অবয়বটিকে চোখে ধরে রেখেছে। হঠাৎ মনে হল ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে ওর মুখ। চোখদুটি অনুসবণ করছে ক্রমশ এগিয়ে আসা মানুষটিকে। নির্মল বুঝল ডাকপিওন। চতুর্থ চিঠিটি নিয়ে আসছে। প্রবলভাবে রেলিংটা আঁকড়ে ধরেছেন। মাথাটা একটু একটু কবে ঘুরে হেঁট হচ্ছে।

তারপর অনেকক্ষণ মিসেস গুহ মাথা তুললেন না। নির্মল স্পষ্ট দেখল, হাঁপাচ্ছেন। একটু পরে হাতে বুক চেপে টলতে টলতে ঘরে চলে গেলেন। নির্মল বারান্দায় এসে বাড়ি থেকে বেবতে দেখল পিওনকে।

পরদিন দুপুরে গুহ হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন। নির্মল তখন বেরুচ্ছিল।

"কি ব্যাপার আপনি এখন ?"

"ডক্টর সেনগুপ্তকে কল দিয়ে অফিস থেকে চলে এলাম। রাণুর হার্টের ট্রাবলটা আবাব...।"

লাফাতে লাফাতে গুহ উঠে গেলেন।

ট্রাম স্টপ থেকে নির্মল ফিরে এল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠায় বসে থেকে ঠিক করল কয়েকদিন একদম কাজে বসা হয়নি. শুরু করা যাক। বইগুলো বন্ধ। প্রতিটির পাতা উল্টিয়ে খুঁজে খুঁজে ডেথ বার করল। উদাহরণ প্রয়োগ করে দেখান হয়নি। উঠে এগিয়ে খুঁজে খুঁজে শেকসপীয়ব বার করল। চেয়ারে বসে পাতা উল্টাতে উল্টাতে মনে হল বোধহয় আমার জন্যই মিসেস গুহ অসুস্থ হয়েছেন। কুঁজো হয়ে বসেছিল, মাথাটা টেবলে ঠেকাল। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন রাত প্রায় একটা। দরজার করাঘাতে নির্মলের ঘুম ভাঙ্গল। খুলে দেখে গুহ।

"কি রকম যেন কচ্ছে!"

নির্মলের চোখে তখনো ঘুম। গুহর টাকটাকে তার টুপির মত মনে হল। বুকে পিঠে লোমগুলো যেন আঠা দিয়ে আঁটা।

"এখন কি করি ?"

"ডাক্তারকে কল দিন।"

"দুপুরে গিয়েছিলাম, পাইনি। সকালেই রুগী দেখতে পাটনা চলে গেছেন।"

"আরো তো ডাক্তার আছে। আমাদের এই রাস্তাতেই তো গোটা পাঁচ-ছয়

বাড়ির পর একজন আছে। চটপট ডেকে আনুন।" নির্মল ওকে কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে দিল। "রাতটা তো কাটুক। কালকে স্পেশালিস্ট আনবেন।"

ঠেলে দিল সিঁড়ির দিকে। কলের পুতুলের মত গুহ নেমে গেলেন। ওদের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। নীল আলোগুলো জ্বলছে। সিধে দালানটা অন্ধকার প্রায়। শোবার ঘরে জানালার পর্দায় ছেঁকে সাদা আলোর তলানি দালানে পড়েছে। নির্মলকে পেছন থেকে ঠেলতে ঠেলতে কেউ গুহদের ফ্ল্যাটে ঢুকিয়ে দিল।

পর্দার নিচে কিছুটা ফাঁক রয়েছে। পর্দা সরিয়েই দেখা যেত কিন্তু তা না করে সে উবু হয়ে বসল। খাটটা জানালা থেকে দূরে। বালিশে হেলান দিয়ে মালতী গুহ আধশোয়া। চোখ বন্ধ। দু-হাত বুকে জড়ো করা। মাথা নামান।

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করার দরকার বোধ করল নির্মল। বদলে ঢোক গিলল। মুখ বিকৃত করে বুক চেপে মালতী গুহ কাত হলেন। অস্ফুট কয়েকটি শব্দ হল। শরীর শ্বাস প্রশ্বাসে কাঁপছে।

নির্মল অকারণে নিজের পিছন দিকে তাকাল। মনে হয়েছিল কেউ যেন পিছনে। খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ওখানকার আলো ম্লান।

আর একবার কাত্‌রালেন মালতী গুহ। নির্মল শিউরে উঠল। হঠাৎ ওর মনে হল, যদি মরে যায়। ভাবামাত্রই সে অবশ হতে শুরু করল। শিরাগুলোকে যেন বেছে বেছে আঁটি বেঁধে আলাদা করে রাখা হয়েছে। হাড় আর মাংসের স্তূপ এখন সে। এখন যদি ওকে জানিয়ে দিই, নির্মল ভাবল, আসলে চিঠিগুলো পাশের ফ্ল্যাটের নির্মলবাবুর লেখা। বিশ্বাস না হয় ওর বাঁ হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পাবেন। ওর ড্রয়ার খুলে নীল প্যাড আর লাল কালির কলম পাওয়া যাবে। এখনো তিনটে চিঠি ওর তোষকের নিচে ডাকে দেবার জন্য রয়েছে। তাতে মালতী গুহর নাম লেখা। এই তথ্যগুলো জানালে কি ওর অসুখ সেরে যাবে?

নির্মল বুঝতে চেষ্টা করল, মারা যাচ্ছেন কিনা। এত বোকা হয় মানুষ, একটুও বুঝল না এ চিঠি কোন নষ্ট-ভ্রষ্ট জীবিতের লেখা।

"শুনছেন।"

নির্মল আস্তে ডাকল। মনে হচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে কারা উঠে আসছে। দরজার দিকে তাকাল। করিডোরে ম্লান আলো, বিবর্ণ দেওয়াল। সারা বাড়িটা নিঝুম।

"শুনছেন, আমি নির্মল, পাশের ফ্ল্যাটের।"

এবার আর একটু জোরে বলল। বলার সময় মাথাটা দুই গরাদের ফাঁকে

চেপে ধরল।

"কে, কে ?"

উঠে বসেছেন মালতী গুহ। বিস্ফারিত চোখে জানালার দিকে তাকিয়ে। াহিনীর অগ্রবর্তী ড্রামবাদকের মত পদধ্বনি সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। উত্তেজিত গুহব ণ্ঠস্বর চেনা যায়।

মালতীর চোখ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে। ঝিমোবার মত হয়ে মাথাটা নমে এল বুকের দিকে। খুঁজে খুঁজে হাত বাড়িয়ে বালিশটাকে কোলের উপর রখে কুঁজো হয়ে রইলেন।

"আমি নির্মল। আমিই—আমিই।"

"নাহ্!" মালতী মুখ তুললেন। "আমি বড় ক্লান্ত ভবদেব। আমি অনেক দিন নাগলে রেখেছি তোমায়, আর পারছি না।"

মাথাটা আবার বালিশে উনি নাড়তে থাকলেন। নির্মল ঘাড় ফিরিয়ে দেখল াক্তারকে নিয়ে গুহ ফ্ল্যাটে ঢুকেছে।

সেই রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নির্মল দেখল, প্রায় ষাট ফুট গভীর অন্ধকার খাদ াবান্দা থেকে রাস্তা পর্যন্ত নেমে গেছে। লাফিয়ে পড়ার কি কোন যুক্তি আছে ? নর্মল বহুক্ষণ ভেবেও বুঝে উঠতে পারল না, নিশ্চিত নির্বিঘ্নে সুখের আশ্রয় নবার মত আদৌ সে ক্লান্ত কিনা!

ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন

মাঘের দুপুরে, যদি, তকতকে ঘাসে পা দিয়েই মৃদু তাপ লাগে, পোড পেট্রলের গন্ধ আসে, একটি কি দুটি লোক বিরাট মাঠটা একাকী পার হতে থাকে উবুড় হয়ে পুকুরধারে কেউ ঘুমোয় এবং হঠাৎ শঙ্খচিলের ডাক শোন যায়—তখন ইচ্ছা করে 'এবার একটু বসা যাক।' বিনোদ গড়ের মাঠের দিবে মুখ-করা বেঞ্চটা দেখিয়ে বলল।

"হ্যাঁ, অনেক হেঁটেছি।" বলেই কমলা আগে গিয়ে বসল। সিঁথিতে, কপালে দগদগে তেল-সিঁদুর। খোকা এবার স্কুল-ফাইনাল দেবে। তার জন্যই কালিঘাটে পুজো দিতে কলকাতায় আসা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে জাদুঘর পর্যন্ত সবাই হেঁটে গেছে। এবার মনুমেন্ট দেখার কথা। সীতা আঙুল দিয়ে পীতু-নীতুকে তা দেখিয়ে দিল, 'ওই যে।'

"একজন ফিসফিস করে বলল, আমরা ওর কাছে যাব না?"

"এখান থেকেই তো দেখা যাচ্ছে।"

ওরা দুজনে আর কথা বলেনি। মুখ ফিরিয়ে বসে রাস্তায় গাড়ি চলাচল দেখতে লাগল। কিছুদূরে গাছের ছায়ায় একজোড়া ছেলে-মেয়ে গল্প করছে আর মেয়েটি খুব হাসছে। সীতা তাদের দিকে মুখ করে বসল। কমলা ঠেস দিয়ে মুখটা আকামুখো করে চোখ বন্ধ করল। তার সারাঅঙ্গে ক্লান্তি। খোকা একটু অধৈর্য হয়েই বলল, কতক্ষণ বসবে?

"বিনোদ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, যাবই বা কোথায়?"

খোকা উঠে দাঁড়াল। পকেটে হাতভরে কয়েক পা এগিয়ে একটা ভাঁড়ে লাথি মারল। সেটা ভেঙে যেতে আর কোন কাজ না পেয়ে মাঠের মধ্যে এগিয়ে গেল।

খোকার থুতনিতে কেশ দেখা দিয়েছে, কণ্ঠস্বরে কর্কশতা এসেছে, দুই ' ঘনরোম। বাহুর পেশী আকৃতি নিচ্ছে। এবার প্রথম একটা বড় পরীক্ষা বসবে। এখন ও কিরকম বোধ করছে, সেইটা জানতে বিনোদের সাধ হল। তা সেও উঠে পায়চারি করতে করতে খোকার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"তোর মা বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছে, একটু জিরোক। তুইও বস্ না। সকাল থেকে তো বসতে দেখলুম না।"

খোকা কথাটা গায়ে মাখল না। দূরে রাস্তার ওপারে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে সেই দিকে তাকিয়ে। একদল মেয়েপুরুষ, বিনোদের মনে হল তারা বেহারী, এমনভাবে বাসে উঠল যেন স্টেশনে এক মিনিটের জন্য থামা ট্রেনে উঠছে। বাস ছাড়ার পর দেখা গেল একজন চেঁচিয়ে বাসের পিছনে ছুটতে শুরু করেছে। বিনোদের ভারি হাসি পেল।

"খোকা দেখলি না, একটা ব্যাপাব।"

ঘটনাটা বিনোদ বলল। খোকা প্রয়োজনমত হেসে খেলায় মুখ ফেরাল। বিনোদও সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শ্রান্ত বোধ করতে শুরু করল। তার ইচ্ছে হল ঘাসে পা ছড়িয়ে বসতে।

"কলকাতাতেই খেলার সুবিধে, কত ক্লাব।" খোকা স্বগতোক্তির মত করে বললেও বিনোদ জবাব দিল, "আমাদের ছেলেবেলায় এত কিছু ছিল না। ঘোষেদের মস্ত উঠোন ছিল, সেখানে ব্যাডমিণ্টন থেকে শুরু করে সব খেলা হত। পাড়ার বাইরে যাওয়ার দরকারই হত না।"

খোকা শুনছিল, হঠাৎ খেলার মাঠ থেকে চিৎকার উঠল। একজন আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছে। আউটের পদ্ধতিটা দেখতে পায়নি তাই বিরক্ত হয়ে খোকা বলল, "তুমি বরং ওদের কাছে গিয়ে বস।"

বিনোদ অপ্রতিভ বোধ করল। কথা না বলে গুটিগুটি ফিরে এল।

পীতু ফিসফিস করে সীতাকে জিজ্ঞাসা করল," দিদি, এবার আমরা কি দেখতে যাব ?"

"চিড়িয়াখানা ?" নীতু বলল।

"জানি না, বাবাকে জিগ্যেস কর।" সীতার হাই উঠছে : ছেলেমেয়ে দুটো খালি কথাই বলে যাচ্ছে। দেখে দেখে আর দেখতে ভাল লাগছে না।

"চিড়িয়াখানা আরও সকালে যেতে হয়।" বিনোদ উত্তরটা দিয়ে দিল। কিন্তু ছেলেদুটির মুখ দেখে তার মায়া হচ্ছে। বলল, "অন্য কোথাও অবশ্য যাওয়া যায়।"

"সিনেমা ?" সীতা চট্ করে বলল।

"এখন শো আরম্ভ হয়ে গেছে। তাছাড়া এখানে তো ইংরিজি বই দেখায়।"

বিনোদ মুখ ফিরিয়ে নিল, যাতে সীতা প্রসঙ্গটা টানতে না পারে। খোকাকে দেখতে পেল সে। একটা ঢিল কুড়িয়ে সামনে জোরে ছুঁড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে এদিকেই তাকাল। ও যেন প্রস্তুত ঘোড়ার মতো ছটফট করছে। শুধু গন্তব্যটা

জানতে পারলেই হয়।

পীতু ফিসফিস করে বলল, "আমরা কি এবার বাড়ি ফিরব ?"

বিনোদ উঠে দাঁড়াল।

"চল্, একটা জিনিস দেখাব।"

ওরা তাকাল।

"আমাদের বাড়ি দেখাব, খোকাকে ডাক।"

কমলা কথা বলেনি এতক্ষণ। এবার বলল, "কোন্ বাড়ি ? যেটা ছিল ?

কথা না বলে বিনোদ বাস স্টপের দিকে এগিয়ে গেল।

"ও-ছাই দেখে কি লাভ। তারচেয়ে আর একটু বসে থাকলেই হত।

গজগজ করে কমলা উঠে দাঁড়াল। পীতু ছুটে গেছে খোকাকে ডাকতে সীতা বলল, "সেদিন মেট্রোয় সিনেমা দেখে গেছে বি-ডি-ও'র বড় মেয়ে।" বা স্টপে দাঁড়িয়ে খোকা বলল, "এসব ক্লাবে আমিও খেলতে পারি।"

বাসে ওঠা পর্যন্ত বিনোদ কারুর দিকে তাকাল না।

এখনও অফিস ছুটির ভিড় আসেনি। বিনোদ বাসে জানলার ধারে বসল ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বাসটা চলেছে। দুলুনি লাগছে। সে যে কত ক্লান্ত এইবার টে পেল। আরাম পাবার জন্য চোখ বুঁজল। মাঝে মাঝে খুলে দেখে একটা-দুটো গাছ, একটু ঘাস-মাটি, জমাটবাঁধা ধূসর বাড়ি। কানে বাজছে বাসের ঘণ্টি এঞ্জিনের শব্দ আর অনবরত প্রবল এক সাঁইসাঁই অতিক্রম ধ্বনি। বিনোদ ভিতরে ভিতরে ভার বোধ করতে শুরু করল, যেন দমে যাচ্ছে। পিছিয়ে যাচ্ছে

"জানলা দিয়ে মুখ বার কর না, পীতু নীতু।"

কমলার গলা শোনা গেল। চোখ খুলে বিনোদ দেখল সামনের লোকটি ঘাড় হেঁট করে কি যেন পড়ছে। পাশের জন জর্দা-পান চিবোতে চিবোতে শূন্যচোখে সামনে তাকিয়ে। ব্যস্ত হয়ে একজন উঠে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সেখানে বসল। বাইরে ট্র্যাফিকের লাল আলোটা জ্বলজ্বল করছে। স্থির বাসটার গোটাদেহ এঞ্জিনের ধকধকানির সঙ্গে কাঁপছে। বিনোদের মনে হল, সপরিবারে কোথায় যেন চেঞ্জে চলেছে। স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। যাত্রীদের ওঠা-নামা চলেছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতেই কয়লার গুঁড়ো চোখে পড়ল মা তখন বললেন, "বারণ করেছিলুম জানলা দিয়ে মুখ বার করিস না।" আঁচলটাকে সলতের মত পাকিয়ে চোখের মধ্যে অনেক খুঁজলেন। ফুঁ দিলেন। শেষে কাপড় দলা করে মুখের ভাপ দিয়ে চোখে চেপে ধরলেন। মা জর্দা খেতেন। গন্ধটা তখন সুন্দর লাগছিল।

"তোর মেজোকাকার চোখে একবার কয়লার গুঁড়ো পড়ে, সেকি কাণ্ড।"

বলে জানালার কাচ নামিয়ে দিয়ে মা হেসে বললেন, "আর ভয় নেই।" তারপর একটা পান মুখে দিয়ে পাশে বসলেন। আমরা দুজনে একই জানালা দিয়ে দৃশ্য দেখতে লাগলাম। পিচ ফেলার জন্য মা একবার কাচটা তুলেছিলেন। বাবা চুরুট মুখে একটা ইংরিজি বই কখন থেকে পড়েই চলেছেন। মা ফিসফিস করে বললেন, "নদু, তোর বাবাকে বল না, বই রেখে এখানে এসে বসতে।" বাবাকে বলতেই হেসে কেমন করে যেন মা'র দিকে তাকালেন। মা ঘোমটা বাড়িয়ে চোখ সরিয়ে নিলেন। তারপর তিনজনে সেই কাচফেলা জানলাটি দিয়ে বাইরের গাছ, চাষী, কুঁড়েঘর, মেঠোপথ আর পথিকদের দেখতে লাগলাম। এইভাবেই একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম মা'র কোলে।

অন্ধকারে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে স্টেশনে নামলাম। ওয়েটিং রুমে মা মাথা মুছিয়ে দিয়ে চা খেতে চাইলেন। বাবা বাইরে বেরিয়ে চা আনলেন। আমিও খেলাম। বাবা বললেন, "নদু, আর একটা জিনিস দেখাব, কখনো দেখিসনি।"

প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এলেন। কি অন্ধকার চারিদিক। বাবার চশমার কাচে বৃষ্টির জল লেগেছে। স্টেশনের ফিকে আলোয় তা জ্বলজ্বল করে উঠল।

"তাকা সামনে।"

তাকালাম। গাঢ় অন্ধকার চোখের সামনে ওৎ পেতে। তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেলাম।

"এবার উপর দিকে চোখ তোল।"

তাই করলাম। চোখ তুলতেই হঠাৎ ঠকঠক করে কেঁপে গেলাম। সেই অন্ধকার এক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে। সুতোর মতো আঁকা-বাঁকা ঘোলাটে আকাশ সেই অন্ধকারের মাথায় চর ফেলেছে। অন্ধকারটা মনে হল ভেঙে পড়বে বুঝি।

বাবা আঙুল তুলে বললেন, "ওটা হচ্ছে পাহাড়। ওখানে ঝরনা আছে। আমরা একদিন দেখতে যাব।" গানের সুরের মত করে বাবা কথা বলেছিলেন।

অবাক হয়ে ছেলেমেয়েরা তাকাল। আঙুল তুলে বিনোদ বলল, "ওইটেই হল আমাদের বাড়ি।"

"কে আছে ওখানে?" নীতু জিজ্ঞাসা করল।

"লোকেরা থাকে।" সীতা বুঝিয়ে দিল। লোহার গেটের একটি মাত্র পাল্লা। পাশের পামগাছ দুটি ন্যাড়া। ফুলবাগানটায় পুরনো ড্রাম স্তূপ হয়ে রয়েছে। দোতলার বারান্দায় কাঠের পার্টিশান। রেলিঙে নানান ধরনের কাপড় ঝুলছে। বাড়িটায় বহুবছর কলি হয়নি, কিন্তু দাগরাজি দেখা যাচ্ছে। ভাঙা পাইপ দিয়ে তিনতলা থেকে ছড়ছড় করে জল পড়ল। দোতলার কার্নিশে একটা

বেড়াল মাথা বাঁকিয়ে কি চিবোচ্ছে, সম্ভবত চড়াই। সদর দরজা খোলা। রাস্তা থেকেই দেখা যায়, অনেকগুলি মেয়েমানুষ বাসনমাজা, কাপড়কাচার কাজ করছে। উঠোনে আগে জলের কল ছিল না। দোতলায় হঠাৎ চিৎকার করে কে খিস্তি করল।

"দোতলার ওই বারান্দার পেছনেই হলঘর। বাবা বসতেন।"

"বসে কি করত ?" পীতু জানতে চাইল।

"গান হত, রিহার্সাল হত, পাড়ার পুজোর মিটিং হত। একতলার ওই ঘরটা ছিল মেজকাকার সেরেস্তা। ছোটকাকা মরে যেতে ওর বৈঠকখানাটা মেজকাকা নেয়। তখন খুব মক্কেল হয়ে গেছে।"

বাড়ি থেকে একটা লোক ওদের লক্ষ্য করছিল। বিনোদ আঙুল দিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেখাচ্ছিল। তার দিকে আঙুল তুলতে দেখে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল, "কাকে খুঁজছেন ?"

বলার ভঙ্গিতে বিনোদ হক্‌চকাল। পীতুই বলে ফেলল, "আমাদের বাড়ি দেখতে এসেছি।"

ভ্রূ কুঁচকে লোকটি সপরিবারে বিনোদকে দেখল। চোখেমুখে বিস্ময় ও অস্বস্তি ফোটাল। কিন্তু যখন বিনোদ বলল, "এটা এককালে আমাদেরই বাড়ি ছিল।" লোকটি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

"বেচে দিয়েছেন !"

বিনোদ ঘাড় কাত করল।

"বেচবার আর লোক পেলেন না ? খোঁয়াড়, মশাই খোঁয়াড়। জানোয়ার হয়ে বাস করছি। এদিকে ভাড়া নেয় সত্তর টাকা করে।"

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। বিনোদ রেগে গেল।

"বেলে পাথরের উঠোন আর সিঁড়ি. মার্বেল পাথরের হলঘর, কত বড় বড় জানলা দক্ষিণমুখো—" খোকার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "এই বাড়িকে বলে কিনা খোঁয়াড় ! এরকম বাড়িতে যে বাস করছে এটাই ব্যাটার বাবার ভাগ্যি।"

কমলার দিকে সে তাকাল। আশ্চর্য, পিছন ফিরে কি যেন দেখছে। ধমকের মত করে বিনোদ বলল, "এদিকে দেখ না। ওই যে তিনতলায় খড়খড়ির জানলা. ওটা ঠাকুরঘর। ওর পিছনে ছাদ, দুটো ব্যাডমিণ্টন কোর্ট হয়ে যায়।'

এক বুড়ো কাশতে কাশতে জানলাটায় এসে দাঁড়াল। কমলা মুখ ফিরিয়ে নিল। নিচুস্বরে সীতাকে বলল, "সকাল থেকেই ধকল চলেছে, আয় রকটায় বসি।"

"এভাবে, এখানে বোস না।" বিনোদের কথায় কমলা তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে নিল। কিন্তু উঠল না। এক বৃদ্ধ তখন যাচ্ছিল। বিনোদকে দেখে ইতস্তত করে কাছে এগিয়ে এল।

"হরিকা, আমি বিনোদ। নদু।"

"চিনতেই পাচ্ছিলুম না। চোখে তো আর ভাল দেখছি না। তা তুমি যে দেখছি বুড়িয়ে গেছ।"

"বয়স তো হচ্ছে।" বিনোদ হেসে বলল।

ফোকলা মুখে বুড়ো হাসল। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বলল, "একটা লোক ছিলেন বটে তোমার বাবা। কি অন্তঃকরণ! সারাজীবন শুধু দিয়েই গেলেন। এক‌ফোঁটা সাহায্যও কারুর কাছ থেকে নিলেন না। ভায়েদের মানুষ করলেন, তাবা গাড়ি বাড়ি করল, আব তিনি ?" দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ো চুপ করল। বুকটা ফুলে উঠে টসটস করছে বিনোদের। খোকার দিকে তাকাল। শুনে নিক্। হরিকাকে তো আর সে বলতে শিখিয়ে দেয়নি।

"এইটি আমার বড় ছেলে, এবার স্কুল ফাইনাল দেবে।"

বিনোদ আশা করেছিল খোকা প্রণাম করবে। হরিকা হাজার হোক ব্রাহ্মণ। কিন্তু খোকা তার চোখ ইশারা অগ্রাহ্য করল।

"বেশ বেশ, বংশের মুখোজ্জ্বল কর বাব.। আমার ছোটনাতি গতবার বি-এস-সি পাশ করল। তোমার মেজকাকার ছেলে ঘুনুকে ধরে কাবখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছি। লোক ভাল। পাড়ার সকলের কথা জিজ্ঞেস করল। তোমাদের কথাও। যাও না বলে দুখ্যু করল।"

"বাবা কখনও কারো কাছে হাত পাতেননি। সেই রক্ত আমার গায়েও তো আছে।"

"তা বটে, তা বটে।"

সীতা এসে বিনোদকে ফিসফিস করে বলল, "মা বলছে, কখন ফিরবে ?"

ট্রেনে ফেরার সময় কমলা বলল, "তোমার হরিকা রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা বলল, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসাতে তো পারত।"

"অবস্থা তেমন ভাল নয়, নইলে কি আর বলত না। ওর বড় মেয়ের বিয়েতে সেকি কাণ্ড! পালঙ্ক দেওয়ার কথা ছিল দিতে পারেনি। বরকে তো সভা থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল বরের বাপ। কান্নাকাটি পড়ে গেল। বাবা তখন জামিন থেকে নিজে দাঁড়িয়ে বিয়ে দেওয়ালেন। পরদিন বরের বাপের হাতে চারশো টাকা গুনে গুনে দিলেন। বুঝে দ্যাখ, সে আমলের চারশো টাকা মানে আজকের দু'হাজার টাকা।"

এতক্ষণ পরে খোকা মুখ খুলল, "দিয়ে কি লাভটা হোল !"

শোনামাত্রই ঝিমঝিম করে উঠল বিনোদের মাথা। চুপ করে রইল সে। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে শুনিয়ে একবার শুধু বলল, "ঘুনু আর আমি একই ক্লাসে পড়তুম।"

কেউ শোনার জন্য আগ্রহ দেখাল না। নীতু মা'র কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডা লাগছে তাই পীতু কুঁকড়ে বসে। কিন্তু বাবার কাছে গল্প শোনার জন্য জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে। বিনোদ আর কথা বলেনি।

স্টেশন থেকে রেললাইন ধরে প্রায় আধমাইল গিয়ে লোহা কারখানার পাশ দিয়ে গোপাল কুণ্ডু রোড। সেখান থেকে বিনোদের বাড়ির গলি তিন মিনিটের পথ। ওরা ট্রেন থেকে নামল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেছে। দূরে সিগন্যালের লাল আলোটা জ্যাবড়া দেখাচ্ছে। লাইনের দুহাত উপরে কুয়াশা চাপ বেঁধে। ঘুমন্ত নীতুকে কোলে নিয়ে কমলা মন্থর হয়ে পড়েছে। পীতুর হাত ধরে বিনোদ স্লিপারে পা রেখে ধাপে ধাপে এগোতে লাগল। এক একটা স্লিপারের মধ্যে ফাঁক বেশি। পীতু পারছে না দেখে ওকে সীতার কাছে গছিয়ে দিল। তখন কমলা বলল, "এখানেই তো পুরুতমশাই কাটা পড়েছে।"

খোকা বলল, "আরো এগিয়ে, ফুটবল মাঠের কাছে।"

কমলা বলল, "কি সাহস !"

বিনোদ বলল, "কিসের সাহস, মরার ?"

"না গো, রাধামাধবের সোনার মুকুট চুরি করা কম সাহসের কাজ ! একটুও বুক কাঁপল না ! ধরা পড়ে গেল তাই, নয়ত কুষ্ঠ হয়ে যেত ওই হাতে।"

খোকা কমলার দিকে ফিরে বলল, "তুমি কি করে জানলে যে হোত ?"

"তুই থাম্। পাপ করলে ভগবান শাস্তি দেবেনই। আত্মহত্যা করে ফাঁকি দিল তাই ; কিন্তু ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়, যমের দরবারে তো যেতেই হবে !"

বিনোদ কথা বলল না। ভাবতে শুরু করল ললিত ভট্‌চাযের কথা। একদিন এসে ভোট চাইল মিউনিসিপ্যালিটিব ইলেকশনের সময়। বিনোদ বলেছিল, ঠাকুরদেবতার সেবা নিয়ে থাকবে, তুমি আবার এই সবে মাতলে কেন ?" ললিত বল্লে," ঠাকুর তো দেশের মানুষ। তাদের সেবাই তো করতে চাই।" খাসা বলেছিল। সবাই ওকে মান্য করত, কথা শুনত ! চুরি করে ধরা পড়ে অপমান এড়াতে ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেনে গলা পেতে দিল। দেমাকী ছিল, দেমাক দেখিয়েই চলে গেল। এসব মানুষ আজকাল বড় একটা চোখে পড়ে না।

খপ খপ আওয়াজ হচ্ছে সকলের পা ফেলার। পাথরে আঙুল ঠুকে সীতা একবার যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। কমলা ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে। দেখে দেখে

সবাই পা ফেলছে।

"প্রিন্সিপল্ থাকা দরকার নাহলে এলোমেলো হয়ে জীবন কাটে।" চাপাস্বরে বিনোদ বলল খোকাকে। বাবা একবার বলেছিলেন, তখন আমি খুব ছোট। মেজকাকার ভায়রা-ভাই যোগেন ঘোষ কর্পোরেশন ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিল। বাবার কাছে এলেন ভোট চাইতে। কুটুম বলে তো খুব আদর-যত্ন করে বসালেন। কিন্তু জানিয়েও দিলেন, কংগ্রেস ছাড়া আর কাউকে ভোট দেবেন না। মেজকাকাও অনেক কবে বললেন কিন্তু বাবা অটল। সারারাত ঘুমোলেন না, দোতলার বারান্দায় পায়চারি করলেন। পরদিন মেজকাকা কোর্টে বেরুচ্ছেন তখন ডেকে বললেন. "যোগেনবাবু নিজে এসেছিলেন, কুটুম, তার মর্যাদা আছে, সেটা রাখতেই হবে। ওকে জানিয়ে দিও আমি কাউকেই ভোট দেব না।"

একটানা গল্পটা করে বিনোদ প্রফুল্ল বোধ করল। খোকা মাথা নিচু করে দেখে দেখে হাঁটছে। পিছন থেকে সীতা চেঁচিয়ে বলল, "বাবা একটু দাঁড়াও, বড্ড এগিয়ে গেছ।"

কারখানার কাছে ওরা এসে পড়েছে। একটা পুরনো ঝাঁকড়া বটগাছের পাশ দিয়ে রাস্তাটা পুবে চলে গেছে। বিনোদ খোকাকে নিয়ে গাছটার নিচে দাঁড়াল।

কমলার প্রায় এলিয়ে পড়ার দশা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "তোমরা তো জিন লাগিয়ে ছুটছ। আমি ওদিকে ভয়ে মরি।"

সীতা বলল, "ছ'টা পঁযতাল্লিশের গাড়ি আসার সময় হযেছে, মা'র খালি ভয় যদি আমরা কাটা পড়ি।"

"না বাপু, গাড়িটাড়ি নিয়ে খেলা নয়। ও হচ্ছে নিয়তির মত। হাত দেখালেও থামবে না, পাশ কাটিয়েও যাবে না।"

কমলার বলার ভঙ্গিতে বিনোদের কৌতুক করার ইচ্ছা হল সিগন্যালের রঙ সবুজ হয়ে রয়েছে। সে বলল, "তাহলে একটু দাঁড়াও। তোমার নিয়তি আসছে তাকে দেখে যাও।"

"না, না, চলো। ঠাট্টা করতে হবে না।"

বিনোদ ওকে হাত ধরে টেনে রাখল। ছেলেমেয়েরা লক্ষ্য করে কমলা ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় দূরে এঞ্জিনের হুইসেল বাজল।

সকলে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। গুম গুম শব্দ হচ্ছে। লাইনের উপরে পিছলে যাচ্ছে আলো। মাঠের মাঝে ইলেকট্রিকের লম্বা খুঁটির মাথা ঝকঝক করে উঠল। একটা শেয়াল ওদের কাছ দিয়ে ছুটে গেল।

"এসে গেছে, এসে গেছে।" বিনোদ কাঁপাগলায় অন্ধকারের মধ্যে বলল।

ফিসফিস করে পীতু বলল, "কি এসে গেছে বাবা ?"

"নিয়তি ।"

বিনোদ কয়েক পা এগিয়ে গেল । পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া চাঙড়ের মতো দুড়দাড় করে ট্রেনটা এসে পড়েছে । বিনোদ দুহাত বাড়িয়ে শিশুর মতো কলধ্বনি দিয়ে লাইনের দিকে এগিয়ে গেল । কমলা ভয়ঙ্কর স্বরে চিৎকাব করে উঠল । খোকা ছুটে গিয়ে বিনোদের কোমর জড়িয়ে ধরল । যখন, কামরাগুলোর আলো ওদের দেহ থেকে অদৃশ্য হল, মাটি স্থির হল, বাতাস শান্ত ভাবে বয়ে গেল, বটগাছের পাখিরা চিৎকাব বন্ধ করল, নক্ষত্রের মালিন্যও ঘুচল, তখন বিনোদ বলল, "ভয় নেইরে, ও লাইন ধরে চলে । আমি ওর লাইনে যাচ্ছি না ।"

কমলা ফুঁপিয়ে বলল, "কবে তোমার পাগলামি থামবে ?"

হা হা করে হেসে বিনোদ বলল, "চল চল, এবার যাওয়া যাক ।"

বাড়ি পৌঁছে খোকা পড়তে বসল । আধাদামে কেনা গতকালের খবরের কাগজ নিয়ে বিনোদ ওব কাছে বসে পড়ছে আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে । খোকা কিছু একটা মনে করে রাখতে ভ্রূ কোঁচকাচ্ছে থুতনিতে হাত রেখে ঠোঁট কামড়ে টেরিয়ে রয়েছে, হুবহু ওর ঠাকুরদার মত । সারা মুখ এ সময় একটা দম্ভের মতো দেখায় । আত্মপ্রত্যয়ে কঠিন মনে হয় । বিনোদ মুগ্ধ চোখে খোকাকে দেখছিল । হঠাৎ তা খোকার নজরে পড়ল । কুঁকড়ে গেল সে ।

"তোকে একটা কথা বলব, শুনবি ?"

খোকা অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে রইল । ইতস্তত করে বিনোদ বলল, "তোর ঠাকুরদার পর মান-সম্মানের মুখ আর দেখিনি । তুই আবার দেখা, পারবি না ?"

কথাটা বোঝবার জন্য খোকা কিছু সময় নিল । ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে এল ওর মুখ । বিনোদ ঝুঁকে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "মনের মধ্যে সদাসর্বদা বলবি, বড় হব বড় হব । ফাঁকি দিবি না, ছোট কাজ করবি না, একবার নিচু হলে উঠে দাঁড়ান ভারি শক্ত কাজ রে ।"

ভয়ঙ্কর এক ক্ষুধার্তের মতো সে অপেক্ষা করতে লাগল । খোকা অন্তত একবার মাথাটাও হেলাক বা একছিটে হ্যাঁ বলুক ।

সেইসময় ভিতরের ঘরে পীতু নাকি সুরে টেনে টেনে কান্না জুড়ল । বিনোদ বিরক্ত হয়ে ভিতরে গেল । ওর ক্রুদ্ধ মুখ দেখে পীতু চুপ করল । সীতা দ্রুত বেরিয়ে গেল । পীতুও বেরতে যাচ্ছিল, বিনোদ ওর কান ধরল । "কাঁদছিস কেন, দাদা পড়ছে না ও ঘরে ?"

সেই সময় নীতু বলল, "দিদি চপ খাচ্ছিল । ওকে দিয়েছে তবু দেখ না, আবার চাইছে ।"

"পেল কোথায় তোর দিদি ?"

নীতু চুপ করে রইল। সীতা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। বিনোদ তাকে দুবার জিজ্ঞাসা করল। সীতা তবু চুপ। এবার কঠিন ভঙ্গিতে বিনোদ এগিয়ে গেল, "পয়সা পেলি কোথায়, কে এনে দিল ?"

"কেউ না।"

হঠাৎ পীতু বলল, "সুশীলদা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল।"

কিছুক্ষণ কেউই কথা বলল না, চোখের পাতাটুকু পর্যন্ত ফেলল না। তারপর বিনোদের চড়ে সীতা ছিটকে পড়ল কমলার পিঠের উপর। লাথি মারতে যাচ্ছিল, কমলা দুহাতে আগলে বলল, "বিয়ের যুগ্যি মেয়ের গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না ?"

বিনোদ থরথর করে কাঁপছে, গলায় কথা আটকে গেছে। কণ্ঠস্বর দুমড়ে মুচড়ে কমলা বলল, "বড় বংশের ছেলে যদি, বস্তির লোকের মত আচরণ কেন ?"

দিশেহারা হয়ে বিনোদ চারধারে তাকাল। ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে খোকাকে বলল, "সুশীলকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে ? এ সব কি ব্যাপার ?"

চোখ সরু করে খোকা বলল, "কেন, কি করবে ?"

"ভেবেছে কি সে ? বখামি করাব জায়গা পায়নি ?"

"সুশীলদা আমায় সাজেশান এনে দেবে কলকাতা থেকে।"

"তাতে কি হয়েছে, তা বলে—"

বিনোদের কণ্ঠস্বর মৃতের শেষকম্পনের মতো কেঁপে উঠে থেমে গেল। খোকার সারামুখে ঔদ্ধত্য মাখানো। কঠিন দেখাচ্ছে। দাঁড়িয়েছে গোঁয়ারের মতো। বিনোদ চোখ নামিয়ে নিল। সন্তর্পণে খোকার পাশ কাটিয়ে বাইরের রকে এসে দাঁড়াল। একবার মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে তাকাল যেন এইমাত্র তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জামা পরে খোকা হন হন করে ওর পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল। তখন সে মনে মনে বলল, খোকা ফিরে আয়।

তারপর বিনোদ হাঁটতে শুরু করল। গলি ধরে সে ঘুরতে ঘুরতে চৌরাস্তায় পৌঁছল। তখন সিনেমা ভেঙেছে। মানুষের ভিড় আর সাইকেল-রিক্শার ভেঁপুতে বিরক্ত হয়ে কাছের গলিটায় ঢুকতে যাচ্ছে, দেখল চায়ের দোকানে সুশীল আড্ডা দিচ্ছে। সে থমকে দাঁড়াল। তখনই খোকা এসে ওর সামনে জুড়ে বলল, "কেন এসেছ এখানে ? আমি জানতুম তুমি আসবে। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মান-সম্মানের কথা ভেবে ভেবে।"

বিনোদ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। আমার ছেলে,

আমারই ছেলে খোকা ! ওকি ভাবছে আমি পাগল ? মাথা নামিয়ে সে ভিড়ের মধ্যে দ্রুত মিশে যাবার জন্য লোকেদের ধাক্কা দিতে শুরু করল।

ফুটবল মাঠের ওধারে রেললাইন। এধারে শিবমন্দির, বেশ্যাপাড়ার গলি, মিউনিসিপ্যালিটির দীঘি, বি-ডি-ও অফিস, তার পাশে ললিতের ঘর। রাস্তার ইলেকট্রিক আলো ঘরের দরজায় কোনক্রমে আসে।

খসখস শব্দ হচ্ছে। অন্ধকার ঘর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ললিতের বুড়ো বাপ বেরিয়ে এল। "কে ?"

"আমি বিনোদ। রথতলার বিনোদ।"

বুড়ো আন্দাজে তাকাল। হাত দিয়ে মাটি থাবড়ে বলল, "বস। কি জন্যে ?"

"এমনি।"

"আঃ।"

মাথায় টাক। মুখভরতি দাড়ি। গায়ের চামড়া প্রাচীন পাথরের মতো কর্কশ, কুঞ্চিত। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

"ছ'দিন হয়ে গেল। একাদশী থেকে আজ। সবাই বলল, একটু আগেই ছ'টার গাড়ির অনেকে ওখান দিয়েই হেঁটে গেছে, তখন কাউকে দেখেনি।"

বিনোদ টের পেল তার শীত করছে। এগিয়ে বুড়োর মুখোমুখি হয়ে বসল। ওর শরীর থেকে বন্য গন্ধ আসছে।

"আমাকে ওরা চলে যেতে বলেছে। নযত বার করে দেবে। ললিতকে থাকতে দিয়েছিল, আমাকে কেন দেবে ?"

"কোথায় যাবেন ?"

আঙুল তুলে বুড়ো ফুটবল মাঠের ওপারে রেললাইনের উদ্দেশ্যে দেখাল।

"কেন ?" ফিসফিস করে বিনোদ বলল।

ও এমনভাবে মুখ তুলল যেন বিনোদের কথাটার অর্থ জানতে চায়। তারপর মাথা নাড়তে শুরু করল। ওর ঘন ভ্রূ, দাড়িতে ভরা মুখটা রাস্তার আলোয় বিক্ষত দেখাল।

"জানো, আমি আর কিছু বুঝতে পারি না, টের পাই না। গলির একটা মেয়ে কাল ভাত দিল, খেলুম, স্বাদ পেলুম না। লঙ্কা ঘষে আচার দিয়ে খেলুম, তবুও।" ছলছল করে উঠল বুড়োর স্বর, "কাল পেচ্ছাপ করে ফেললুম, তাতেই সারারাত শুয়ে রইলুম। বুঝলে, আমার শীত করল না।"

বুড়ো হাতড়াতে লাগল। বিনোদ ডান হাতটা এগিয়ে দিতেই খপ করে ধরে কাছে টানতে লাগল। বিনোদ ঝুঁকে ওর বুকের কাছে মুখ এগিয়ে আনল।

"ছ'টা পয়ত্রিশের গাড়িতে চলে গেল, আমাকে ফেলে। ও কি আমাকে

ঘেন্না করত ? ইদানিং আমি আর কথা বলতুম না ।" বুড়োর স্বর রুদ্ধ হয়ে এল ।

"আজ কিছু খেয়েছেন ?"

কথাটার অর্থ বুঝতে বুড়ো আবার মুখ তুলল ।

"ও আমার কথা একদম ভাবলই না ।" বুড়োর নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়ল । বিনোদের মনে হল, চোখ দিয়ে জল নামছে । ভাল করে দেখার জন্য সে মুখটা বুড়োর মুখের কাছে আনল । মুখ দাড়িতে ভরা ।

বিনোদ বন্য গন্ধ পেল । আগাছা আর ঝোপ ।

গাছের পাতা ধূসর । খসখস শব্দে তিতির ছুটে গেল । দূর থেকে দূরের দিকে মহিষেব গলায় বাঁধা ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছে । উপরে বৃক্ষহীন মসৃণ ঢালু পাথরে পশ্চিম থেকে রোদ পড়েছে । বাবা বললেন, 'ঝবনা কোন দিকে বল তো ?"

মা চিবুক তুলে একটা দিক দেখালেন । বাবা হাসলেন, 'নদু, তুই বল্ ।'

বোকার মত চারধারে তাকালাম । তখন বাবা বললেন, 'আয় আমরা খুঁজে বার কবি, পারবি ?' আমি মাথা নাড়লাম ; বাবা আর মা দুধারে চলে গেলেন । সর্বত্র আলগা পাথর, হাঁটু-সমান ঝোপ । একটু নিচে বড় বড় গাছ । মনে হল ওই দিকেই ঝরনা । পা টিপে নিচের দিকে নেমে এলাম । একটা উঁচু পাথরে উঠে দাঁড়িয়েছি, দেখি মা'র হাত ধরে বাবা তাড়াতাড়ি নেমে আসছেন । আমায় দেখে হাত তুললেন । কাছে এসে বললেন,"নদু, এখুনি ফিরতে হবে । এখানে কাল চিতাবাঘ দেখা গিয়েছিল । এক রাখাল বলল ।"

ফেরার সময় বলেছিলাম, 'তোমরা ঝরনা পেলে না ?' কিন্তু ওরা খুব উদ্বিগ্ন থাকায় জবাব দিলেন না । প্রায় নিচে পৌঁছে গেছি । তখন মনে হল কাছাকাছিই কোথাও ঝরনা রয়েছে, শব্দ শুনতে পাচ্ছি । বাবাকে বললাম । তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না, না, বেলা পড়ে আসছে, এখন ঝরনার ধারে যায় না । বাঘে জল খেতে আসবে ।' মা খুব শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরলেন । তখন খুব সুন্দর সূর্যাস্ত হচ্ছিল ; অনেক দূরে গিয়ে একবার পিছু ফিরে তাকিয়েছিলাম । পাহাড়টা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে । ওর মধ্যে ঝরনা আছে, সেটা আর দেখা হল না । তবু বিনোদ মুখটা আরো কাছে আনল । আঙুলটা বুড়োর চোখে স্পর্শ করিয়ে আলোর দিকে বাড়িয়ে দিল । চিকচিক করে উঠল আঙুলের ডগাটা ।

বুড়ো মুখ তুলে তাকিয়ে । মসৃণ, ধূসর দাড়ি পাথরখণ্ডের মতো কঠিন চাহনি । হামা দিয়ে ঘরের অন্ধকারে খসখস শব্দ করে চলে গেল ।

ফুটবল মাঠ পার হয়ে বিনোদ রেললাইনের ধারে এসে দাঁড়াল । হঠাৎ চিৎকার করতে করতে খোকা ছুটে এল, "বাবা বাবা, একি পাগলামি হচ্ছে ।"

সারাক্ষণ ও পিছু নিয়ে রয়েছে। বিনোদ ভাবল, ওকি আমায় এখন পাগল ভাবছে! কিন্তু ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন তো আজ আর আসবে না।

যুক্তফ্রন্ট

তখন ভরদুপুর। খুকি দুহাতে জানলার গরাদ ধরে, শরীরকে আল্‌গা করে দাঁড়িয়ে। গলিটা খুব সরু। এঁকেবেঁকে একদিকে বড় রাস্তায় অন্যদিকে একটা বস্তির মধ্যে পড়েছে। জানলার সামনেই একটা কারখানাবাড়ির টিনের দেওয়াল। বস্তুত জানলায় দাঁড়িয়ে খুকি কিছুই দেখতে পায় না যদি-না কোন লোক জানলার সামনে দিয়ে যায়। বস্তির লোকই বেশির ভাগ সময় যাতায়াত করে। তাদের দেখতে খুকির ভাল লাগে না এখন। খুকির স্বাস্থ্য ভাল। দেখতেও মন্দ নয়। পাত্র দেখা হচ্ছে।

মেঝেয় আদুড় গায়ে ওর মা ঘুমোচ্ছে, পাশের ঘরে বৌদি বাচ্চা নিয়ে। দুই ছোট ভাই স্কুলে গেছে। বাবা আর দাদা অফিসে। আশেপাশে সমবয়সী মেয়ে নেই যে খুকি দু-দণ্ড ঘুরে আসবে। সামনের টিনের দেয়ালে একটা পোস্টারে লেখা—সাম্রাজ্যবাদকে খতম করতে হলে শোধনবাদের সঙ্গে লড়াই করুন। খুকি দেখল গত পনের দিনে 'খতম করতে'টা বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। 'করুন'টা ছেঁড়া। এছাড়া গলিতে কোন পরিবর্তন চোখে পড়ছে না। একটা সিনেমা পোস্টারও ঢোকে না এমন হতভাগা গলি।

বড় রাস্তার দিকে পটকা ফাটার শব্দ হল দুটো। কিছু হৈচৈ-ও শোনা গেল। ওরকম হরদমই শোনা যায়। খুকির তখন কারখানাবাড়ির চালায় চোখ। দুটো পায়রা, নিশ্চয়ই মদ্দা এবং মাদী, বকম-বকম করতে করতে যা করার তাই শুরু করে দিয়েছে। খুকি প্রথমেই পিছনে তাকিয়ে ঘুমন্ত মাকে দেখে নিল। অতঃপর নিশ্চিন্ত হয়ে, গভীর মনোযোগে খুকি যখন মুখটি উপরে তুলে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তখন সে শুনতে পেল না গলি দিয়ে ছুটে আসা পায়ের শব্দ।

তাই বিষম চমকে গেল লোকটিকে একেবারে তার দু-হাতের মধ্যে দেখে। হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ। ব্যাগটা জানলা গলিয়ে খুকির পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে, 'এটা রাখুন তো পরে নিয়ে যাব', বলে ছুটে চলে গেল।

খুকির তখন রা কাড়ার ক্ষমতা নেই। নড়াচড়ারও। ফ্যালফ্যাল করে সে ব্যাগটার দিকে শুধু তাকিয়ে। অনেকগুলো পায়ের শব্দ আর 'ডাকাত ডাকাত,

পাকড়ো পাকড়ো' চিৎকার গলি দিয়ে এগিয়ে আসছে। ভয় পেয়ে খুকি জানলা বন্ধ করে দিল। শুনতে পেল ছুটন্ত লোকগুলো বলছে, "ব্যাঙ্কের সামনেই—গাড়িতে ওঠার সময় লুঠ করেছে। একটা ধরা পড়েছে।" অবশেষে পায়রাদের কাণ্ড এবং এই ব্যাগ, দুয়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে খুকি মাকে ডেকে তুলল।

মাঝরাতে বাবা মা দাদা বৌদি ঘরের দরজা জানলা এঁটে গুনে দেখল দশটি বাণ্ডিলে মোট দশ হাজার টাকা। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

"ঠিক কি বলেছিল লোকটা, আবার আসব ?" দাদা ফিসফিস করে বলল। "খুকিকে দেখলে আবার চিনতে পারবে কি ? মনে হয় না।" ফিসফিস করে মা বলল।

"তাতে কি আসে যায়, বাড়িটা তো চিনবে।" বৌদি চাপা সুরে বলল।

"লোকটা ধরা পড়েছে কিনা আগে সেই খোঁজ নিতে হবে।" বাবা দমবন্ধ করে বলল।

"ব্যাগটা এখন কোথায় রাখা হবে ?"

"আমার খাটের তলায় থাক।" বৌদি পরামর্শ দিল।

"ইঁদুর আরশুলার উৎপাত বড়। কেটে দেবে। বরং ঠাকুরঘরে থাক।" মা প্রতিবাদ করল।

রাখা সম্পর্কে কোনো ঐক্যমত না হওয়ায় স্থির হল ভাঁড়ারে আটা রাখার ড্রামে ব্যাগটা ভরে ঢাকনা কষে এঁটে দেওয়া হোক। যদি পুলিস সার্চ করতে আসে আগেই তো সিন্দুক তোরঙ্গ দেখবে। আটার ড্রাম অনেক নিরাপদ।

পরদিন সকালেই দাদা এবং বাবা খবরের কাগজে হুমড়ি খেয়ে বৃত্তান্তটা খুঁজে খুঁজে পেয়ে গেল। এক কারখানার মাইনে দেবার জন্য দশহাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে ক্যাশিয়ার গাড়িতে উঠছিল। তখন দুজন দুর্বৃত্ত বোমা ছুঁড়ে টাকার থলি ছিনিয়ে চম্পট দেয়। একজন ধরা পড়েছে, থলি নিয়ে অন্যজন পালিয়ে গেছে। ক্যাশিয়ার হাসপাতালের পথেই মারা যায়।

তখন ফিসফিস করে দু-জনে বলাবলি করল :

"আর কেউ জানে বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"কি করে জানবে ? ছুটতে ছুটতে গলিতে ঢুকে বোধহয় ভয় পেয়েই থলিটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে গেছে। আনাড়ি মনে হচ্ছে।"

"নিশ্চয় নিতে আসবে।"

"আসুক না দেখা যাবেখন।"

"যদি ধরা পড়ে তাহলে ভালই হয়।"

"মারের চোটে পুলিসের কাছে ফাঁস করেও তো দিতে পারে, কোথায় থলিটা রয়েছে ?"

"তা বটে। ধরা না পড়াই ভাল।"

"অবশ্য বলা যায়, থলির কথা আমরা কিছুই জানি না।"

"তাহলেও পুলিস সার্চ করতে আসবেই। গুণ্ডাটাকে যখন ভদ্দরলোকের মতই দেখতে, অবশ্য খুকির মতে, তখন পুলিস কোনো ওজর আপত্তিই শুনবে না। বহু ভদ্দরলোকই তো এসব কাজ করে।"

"তাহলে থলিটা বাড়িতে রাখা ঠিক হবে না। আমার শালার কাছে বরং—"

"না না। এখন কোন জিনিস হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরন ঠিক নয়। পুলিস নিশ্চয় নজর রাখছে। তাছাড়া এই গুণ্ডাটা আগে ধরা পড়ুক তবে তো ?"

"গুণ্ডাটা নিশ্চয় একা নয়, দলও আছে। যদি চড়াও হয় ?"

দুজন ভীষণ ভাবনায় কথা বন্ধ করে ফেলল। তারপর চান-খাওয়া সেরে যে যার অফিসে চলে গেল। দুপুরে খুকির মা আর বৌদি রান্নাঘরে খেতে খেতে বলাবলি করল : "দরজা-জানলাগুলো ভাল করে বন্ধ আছে কিনা শোবার আগে আবার দেখতে হবে। কড়া নাড়লেই যেন দরজা খুলো না। আগে দেখে নিয়ে তারপর।"

"তার থেকে যদি দাদার ওখানে রাখা যেত তাহলে এত ভয়ের কিছু থাকত না।"

"দরকার কি আবার লোক জানাজানি করে।"

"দাদা সেরকম লোকই নয়। তাহলে আর ব্যবসা করে খেতে হত না। আমার বিয়েতে চার হাজার টাকা ধার করেছিল কক্ষনো কারুর কাছে তা ভাঙেনি, এমন চাপা।"

"তোমার দাদা ছেলে ভাল। খুব নম্র, ভদ্র।"

"ওই জন্যই তো দাদা খালি লোকসান দিচ্ছে। কতবার ওর বন্ধুরা, আমরা, এমনকি খদ্দেররা পর্যন্ত বলেছে, অত সৎ হলে ব্যবসা করা চলে না। একদম মিথ্যা বলতে পারে না। অথচ কি ভাল ব্যবসা ! কত মাড়োয়ারি টাকা নিয়ে সাধাসাধি করেছে পার্টনার হবার জন্য। যদি নেয় তাহলে এখন হেসেখেলে মাসে পাঁচ হাজার লাভ করতে পারে, কিন্তু অই !"

"তা নিলেই তো পারে।"

"বাঙালি ছাড়া পার্টনার নেবে না, এমন গোঁয়ার যে কি বলব। আপনার ছেলেকে তো বললুম দাদার সঙ্গে নেমে পড়। চাকরির সাতশো টাকায় ছেলেপুলে নিয়ে কি বাঁচা যায় ? হাজার সাত-আট দিলেই—"

"অত চেঁচাচ্ছ কেন। এখন চারিদিকে লোক ঘুরে বেড়াবে। একবার শুনতে পেলেই এসে পড়বে। খুকি কোথায়? কি করছে?"

খুকি তখন ছাদে। পাঁচিলে কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে এমনিই দাঁড়িয়ে। একতলা বাড়ির ছাদ তিনদিক থেকে চাপা; একটুখানি মাত্র গলির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। মায়ের ডাকে খুকি নিচে নেমে এসে জানলা বন্ধ অন্ধকার ঘরের মেঝেয় শুয়ে পড়ল।

রাতে খুকির বাবা-মা চাপা গলায় আলোচনা করার জন্য বহুদিন পরে আজ পাশাপাশি শুল। দুই ছেলে এবং খুকি অঘোরে ঘুমিয়েছে দেখে তবেই খাট থেকে মা নেমে এল মেঝেয়।

"এই এক ঝামেলা বাপু ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে।"

"আর একটা ঘর থাকলেই হয়।"

"একটা কেন দুটো দরকার। খুকির বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। কিন্তু এদের দুজনকে বিয়ে দিয়ে বৌ এনে রাখবে কোথায়?"

"ছাদে দুটো ঘর অবশ্য তোলা যায়। তবে এদের বিয়ে হতে এখনও অনেক দেরি।"

"ততদিনে পাঁচ টাকার জিনিস পঞ্চাশ টাকায় দাঁড়াবে। এখন করলে তবু ভাড়াটে বসান যায়। মাস মাস অন্তত দুশো টাকা তাহলে আসে।"

"আমি ভাবছিলুম শ্রীরামপুরে একবার যাব কিনা। ছেলেটার প্রসপেক্ট আছে। দু' বছরের মধ্যেই অফিসার হয়ে যাবে, বংশটাও ভাল।"

"বড্ড বড়লোক বাপু এরা, খরচ করতে করতে পরে জেরবার হতে হবে। শুধু বিয়েতে খরচ করলেই তো চলবে না। এই বাড়ির একটা বউ আফিং খেয়েছিল কেন খোঁজ নিয়েছ কি? তার থেকে বরং শ্যামপুকুরেরটি ভাল। দোজবরে তো কি হয়েছে? অবস্থাপন্ন, কলকাতায় নিজের বাড়ি, খাঁইও একদম নেই। আমার যা গয়না আছে তাই ভাঙিয়েই চলে যাবে।"

"লোকটার বয়স খুকির দুগুণ। দুটো ছেলেও আছে।

"আছে তো কি হয়েছে? খুকির অত বাছবিছার নেই, যা দেবে মেয়ে আমার সোনামুখ করে নেবে।"

পাশের ঘরে খুকির দাদা-বৌদি প্রথামত দাম্পত্য ক্রিয়া সেরে চিত হয়ে বিশ্রাম করছে। একটা আরশুলা ফরফরিয়ে উড়তে শুরু করল। দুজনে তখন খুব বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল: "এঁদো ঘরে মানুষ থাকতে পারে?"

"নোনা লেগে ইটগুলো পর্যন্ত ক্ষয়ে গেছে।"

"এর থেকে নতুন ভাড়া বাড়িতে থাকাও ভাল।"

"এরপর তো ঘরে কুলোবে না, তখন কি হবে ?"

"বেরতে হলে এখনই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাড়িভাড়া ানার মত রোজগার না হলে—আলাদা থেকে সংসার চালান যে কি অসম্ভব ্যাপার।"

"আজ বলেছিলুম দাদার সঙ্গে ব্যবসায় নামার কথাটা। একদম গা করল না। ানে হয় কোন মতলব আছে ওনাদের।"

"যে মতলবই থাক, খরচ করতে গেলেই নজরে পড়বে। তখন ক্যাঁক করে ুলিশ ধরবে, পেলে কোথায় ? কি জবাব দেবে তখন ? অবস্থা তো সবাই ানে। বাসন মাজার ঝি তো আমার বিয়ের পর রাখা হল।"

"বুঝিয়ে কাল বল না ; ড্রামের মধ্যে রেখে তো কোনো লাভ নেই বরং নিজেদের লোকের সঙ্গে ব্যবসায় খাটালে কিছু আসবে। মিনমিন করলে কি লে। এখন নয় একটা ছেলে তারপর আরও তো হবে, খাওয়াবে কি ? নিজের াখের নিজেকেই তো গোছাতে হবে, বাবা-মা আর কদ্দিন।"

"বলার সুযোগ যে পাচ্ছি না।"

পরদিন অফিস যাবার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে খুকির দাদা মোড়ে দাঁড়িয়ে ইল। একটু পরে বাবাও অফিসে বেরল। দুজনে দেখা হতেই কথা শুরু হল :

"কাল বড় শালার সঙ্গে দেখা হল। ব্যবসাটাকে বড় করতে চায়। কিছু টাকা িয়ে যদি পার্টনাব হওয়া যায়—তুমি কি বল ?"

"ভালই তো, টাকা পাবি কোথায় ?"

"ড্রামের মধ্যে না পচিয়ে কাজে লাগাতে তো হবে।"

"খুকির বিয়ে দিতে হবে। আবার তার মা বলছে ছাদে দুটো ঘর তুলতে।"

"ভালই তো। কিন্তু খরচ করতে দেখলেই তো কথা হবে এত টাকা এল কাথেকে।"

"তা বটে। আচ্ছা ভেবে দেখি।"

ভেবে দেখতে গিয়ে এক সপ্তাহ কেটে গেল। তার মধ্যে খুকির মা ও বৌদির ্থা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। বাবা ও দাদা অফিস যাবার সময় ট্রাম স্টপে াতিদিনই তর্ক করে যাচ্ছে। সংসারের খরচের টাকা যেভাবে খরচ হওয়া উচিত া হচ্ছে না, এই যুক্তিতে দাদা চিৎকার করে মা'র সঙ্গে ঝগড়া করল পরপর িনদিন। দুটো ঘর থেকেই ভাঁড়ারের দরজা দেখা যায়। দুই ঘর থেকে পালা রে সারারাত ভাঁড়ার ঘরের দিকে সন্দেহকুটিল চোখে পাহারা দিতে শুরু রেছে। আর খুকি, দুপুরে ঘরের জানলা বন্ধ থাকে, তাই ছাদে উঠে চুপ করে াড়িয়ে থাকে। চড়াই বা পায়রা দেখলে শুধ নাকের পাটা ফুলোয়।

কালো কাচের চশমা পরা, টেরিলিন প্যান্ট ও জামা গায় ছিপছিপে, শ্যামবং মোটামুটি সুদর্শন একটা লোক গলির বাঁকটায় দাঁড়িয়ে যে তার দিকেই তাকি আছে খুকি প্রথমে বুঝতে পারেনি। যখন বুঝল দেহটা কাঁপতে শুরু করল পাঁচিল থেকে কনুইটা নামাবে সে শক্তিও নেই। লোকটা আস্তে আস্তে বাড়ি সামনে দিয়ে বস্তির দিকে চলে যেতে, তখন দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ফি পেল খুকি। দুড়দুড়িয়ে সে নিচে নেমে এল।

রাত্রে দালানে, এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে থাকতে কথা ব চলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য : "ভুল দেখেনি তো খুকি ?"

"না না, আমাদের বাড়ির দিকে তাকাতে তাকাতেই তো চলে গেল। লু আর পাঞ্জাবি পরা, নাকটা থ্যাবড়া, কোমরে কিছুএকটা গোঁজা ছিল বলে ওর ম হল।"

"ছাদে কি কত্তে দাঁড়িয়ে থাকে অতবড় মেয়ে ? তোমরা একটু নজরও রা না ?"

"আহাহা, দুখানা ঘরের মধ্যে সারাদিন বন্দী থাকবে নাকি ? একদিন থাক ন তুমি বুঝতে পারবে।"

"থাক্ থাক্, এখন এই নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই। সত্যি যদি সে গুণ্ডাটাই হয় তাহলে কি করা যায় এখন ? নিশ্চয় ফেরত নিতেই এসেছে।"

"পুলিসে ধরিয়ে দিলেই তো হয় !"

"না না, তাহলে ফাঁসিয়ে দেবে। নিজে যদি বঞ্চিত হয় তাহলে অন্যকে পেতে দেবে না, এ তো সহজেই বোঝা যায়।"

"তাহলে ওকে কিছু দিয়ে দিলেই হয়। থলেটা যদি জানলা গলিয়ে না ফেল তাহলে ধরা পড়তে পারত। তাহলে টাকাও যেত, প্রচুর মার খেত আব ফাঁ তো হতই। এই বাড়িই ওকে বাঁচিয়েছে বলা যায়। এখন ও কোন্ মুখে দা করতে পারে ?"

"কিন্তু গুণ্ডার কি ধর্মবোধ থাকে ? দাবি সে করবেই। এর জন্য একটা মানু পর্যন্ত খুন করেছে সেটা ভুলে যেও না। আমাদেরও খুন করতে পারে।"

"না না, গুণ্ডার দাবির কাছে মাথা নোয়াতে হবে নাকি ? আর দেবারই যদি ইচ্ছে হয়, বেশ, তাহলে আমাকেই দাও। আমি বোঝাপড়া করে নেব।"

"তারপর এই বাড়িতে বোমা ফেলুক, রাস্তায় ছুরি মারুক। তোর জন্যে আমরাও মরি আর কি !"

"টাকাগুলো পেলে কালকেই এই বাড়ির ওপর সব দাবি ছেড়ে চলে যাব। তখন তো আর তোমাদের ভয়ের কিছু থাকবে না।"

"তা হয় কখন ! হঠাৎ বাড়ি ছাড়লে লোকে বলবে কি ?"

"আরে রেখে দাও তোমার লোক। দু-চার দিন বলাবলি করে তারপর সব ভুলে যাবে।"

"তাহলেও একটা কারণ না দেখালে কি চলে। জিজ্ঞেস করলে কিছু তো একটা আমাদের বলতে হবে !"

"মিথ্যে বলার কি দরকার, বলে দেবেন বনিবনা হচ্ছিল না। ঝগড়াঝাঁটি নিত্যিই তো লেগে ছিল, তাই আলাদা হয়ে গেল। কদিন নয় লোক জানিয়ে গলা ছাড়া যাবেখন।"

"সবই তো বুঝলুম। কিন্তু গুণ্ডা বুঝবে কি করে যে, টাকা তোমরাই নিয়ে যাচ্ছ আমাদের কাছে নেই ?"

"এ আর এমন কি শক্ত, গোড়াতেই তো আর ছুরি-বোমা মারবে না। দাবি জানাতে আসবে যখন বলে দেবে।"

"কিন্তু এ বাড়ির ওপর সব স্বত্ব আগে উকিল দিয়ে লেখাপড়া করে ছাড়তে হবে। মুখের কথায় চলবে না।"

সকালেই বাবা এবং দাদা উকিলের কাছে গেল। তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন তাই বলেছিলেন সন্ধ্যায় আসতে, খসড়া তৈরি করে দেবেন, পরদিনই রেজিস্ট্রি হবে। তারপর বাড়িতে তুলকালাম একটা ঝগড়া হবে বলেও ঠিক হয়ে রইল।

খুকির দুই ছোট ভাই সেইদিনই স্কুল থেকে ফিরে জানাল, মোটামুটি ভাল দেখতে ছিপছিপে ময়লা রঙের একটা লোক রাস্তায় খোঁজ নিচ্ছিল তাদের কাছে, বাড়িতে কে কে আছে। বাবা-দাদা কখন আসে, জানলায় যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে থাকে তার নাম কি ইত্যাদি। ওদের চায়ের দোকানে নিয়ে কাটলেট খাওয়াতে চেয়েছিল তবে ওরা যায়নি।

শুনেই মা ও বৌদির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে এল, ছোট ভাইদুটিকে বিকেলে বেরতে বারণ করা হল। কিন্তু উপযুক্ত কারণ দর্শাতে না পারায় তারা এই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে গেল। কিছু একটা ঘটবে আশঙ্কা নিয়ে মা ও বৌদির মধ্যে বলাবলি হল : "ব্যাটাছেলেরা কখন থাকে না থাকে সেটা জেনে নিচ্ছে।"

"পই পই বলি অফিস থেকে সোজা বাড়ি চলে আসবে, আড্ডায় জমে যেও না। এখন যদি বাড়িতে দল নিয়ে আসে তাহলে ?"

"আজ উকিলের কাছে যাবার কথা আছে না ? খুব জোরে চেঁচালেই পালিয়ে যাবে। দিনের বেলায় অত সাহস হবে না।"

"বাঃ, দিনের বেলাতেই তো কাণ্ডটা ঘটিয়েছিল, সেটা ভুলে যাচ্ছেন কেন ?

ওদের কাছে কিবা দিন কিবা রাত।"

"তুমি হাতের কাছে কয়লাভাঙার লোহাটা বরং রাখ।"

এইসময় দুজনেরই মনে হল সদরের কড়াটা বোধহয় কেউ নাড়ল। একটা সচিত্র সিনেমা পত্রিকা হাতে খুকি ছাদে উঠে রয়েছে। বৌদি ছুটে রান্নাঘরে গেল। মা পড়িমরি ছাদে দেখল খুকি পাঁচিলে হেলান দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। তাকে দেখামাত্র বইটায় মন দিল। কিছু না বলেই মা নেমে এল। বৌদি কয়লাভাঙা লোহা হাতে দাঁড়িয়ে।

"কেউ না।"

"কি করে বুঝলেন ?"

"খুকি তো দিব্যি দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছে, নইলে তো ছুটে নেমে আসত সেদিনের মত।"

"আমার শরীর কেমন কচ্ছে। সন্ধ্যে হয়ে এল বাড়িতে একটা ব্যাটাছেলেও নেই।"

"খুকিকে বরং ডাকি।"

এইসময় ওদের মনে হল আবার যেন কড়া নড়ে উঠল।

"আলুওলা নয়ত, বলেছিল বিকেলে দাম নিতে আসবে।

"তুমি গিয়ে দেখ না।"

"আপনি যান না। খেয়ে তো আর ফেলবে না।"

অবশেষে মা গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বার কয়েক 'কে কে' বলে চেঁচাতে আবার খুটখুট কড়া নড়ে উঠল। খিলটা খোলামাত্র হুট করে দরজা ঠেলে একটা লোক ভিতরে ঢুকেই বলল, "চেঁচাবেন না।" দরজায় খিল দিয়ে বলল, "আমার থলি আর টাকা নিতে এসেছি। চটপট দিন। চেঁচালে সবাইকে খুন করে যাব।"

এমন আকস্মিকভাবে ব্যাপারটা হয়ে চলল যে ওরা দুজন একপা পিছুহটার কথাও ভাবতে পারল না। ছোরার ডগাটার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকল। শেষে বৌদিই বলল, "টাকা তো আমাদের কাছে নেই। পুলিসে জমা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

"বাজে কথা রাখুন। সব খবর রাখি। টাকা এই বাড়িতেই আছে। চটপট বার করুন, জানেন তো এর জন্যে খুন পর্যন্ত হয়ে গেছে। আরো খুন হতে পারে।"

"টাকা বাপু, আমার বড় ছেলে নিয়েছে। আমরা ও টাকা চাই না।"

"মিথ্যে কথা। উনি টাকা হাত দিয়েও ছোঁননি এখন পর্যন্ত, আর কিনা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন ?"

"কেন, ও কি টাকার বদলে বাড়ির অংশ ছাড়বে বলেনি ?"

"ছাড়ুক, তবে তো টাকা পাবে। আগেই বলছেন কেন টাকা নিয়েছে ? দশ হাজার টাকার বদলে পনের হাজার টাকার বাড়ির অংশ নিচ্ছেন, এতবড় জোচ্চুরির পরও কিনা বলছেন আপনার ছেলে টাকা নিয়েছে ?"

"টাকা যে দেওয়া হচ্ছে এই ওর ভাগ্যি। বাড়ি ওর বাপের, সে যদি উইল করে ওকে বঞ্চিত করে তাহলে ও কি করবে শুনি ?"

"করে দেখুন না। কোর্টে গিয়ে আদায় করব।"

"তোমার চোদ্দপুরুষের সাধ্য নেই আদায় করে।"

"মুখ সামলে কথা বলবেন বলছি।"

"চুপ কর হারামজাদি।"

এরপর বৌদি রাগে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে কয়লাভাঙা লোহাটা ছুঁড়ে মারে। মা কপাল চেপে ঘুরে পড়ে বারকয়েক হাত পা খিঁচিয়েই নিথর হয়ে গেল দেখে গুণ্ডাটা ছুটে এল। নাড়ি টিপে, চোখের পাতা তুলে, বুকে কান রেখে সে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "একেবারে মার্ডার করে দিলেন ? যাক্ চটপট আমার থলেটা বার করে দিন তো চলে যাই।"

"আমি এখন কি করব ?"

"আমি কি জানি। আমার থলেটা দিন।"

"ডাক্তার ডাকব ?"

"বললুম তো জানি না।"

"পুলিশ ?"

"কি বলবেন ডেকে, খুন করেছি ? তাহলে তো আপনার ফাঁসি হবে।"

"এইসময় ছাদ থেকে খুকি নামল। মাকে রক্তের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে হাউ হাউ করে উঠে বলল, "ও মা কে তোমার এমন কাণ্ড করল।"

"ওই তো, ওই লোকটা ওই গুণ্ডাটা।"

বৌদির আঙুল তোলা দেখে গুণ্ডাটা খুব ঘাবড়ে গেল। "তার মানে, এসব কি কথা।" বলতে বলতে পিছতে শুরু করল। খুকি চিৎকার করে ছুটে গিয়ে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বৌদিও ছুটে গেল।

"জান ঠাকুরঝি খটাং করে লোহাটা দিয়ে মারল। কিরকম শব্দ যে হল !"

খুকিকে এক হাতে আটকে গুণ্ডাটা খিল খুলতে যাচ্ছে, বৌদি খিল চেপে ধরে বলল, "আবার আমার ঘাড়ে দোষ দেবার চেষ্টা করছে। কি বদমাস দেখেছ !"

"ভগবানের দিব্যি, আমি করিনি।"

"না করনি, পাজি গুণ্ডা কোথাকার। টাকা দিন নইলে খুন করব বলে ওটা

ছুঁড়ে মারলে না ?"

চিৎকার করতে করতে খুকি মা'র বুকের উপর জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। গুণ্ডাটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। খুকির চিৎকারে আশপাশের বাড়ির জানলায় ছাদে উঁকি শুরু হয়ে গেছে। গুণ্ডাটা হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে এধার ওধার তাকিয়েই ছাদে যাবার জন্য ছুটল সিঁড়ির দিকে। বৌদিও পিছু নিল।

"পালাচ্ছ নাকি ? কোন উপায় নেই, ছাদ দিয়ে শুধু রাস্তায় লাফিয়ে পড়া যায়। সেখানে এখন লোক।"

"তাই যাব। ছুরি দেখিয়ে পালাব।" মরিয়া হয়ে গুণ্ডাটা বলল।

"আমার কি দোষ ! চোদ্দপুরুষ তুলে গালগাল দিলে রাগ হবে না ? তোমার হত না ?"

গুণ্ডাটা জবাব না দিয়ে কয়েক ধাপ ওঠামাত্র বৌদি ওর জামা টেনে ধরল। "এখন তোমায় আমি যেতে দিতে পারি না। খুনী তোমায় হতেই হবে। ফাঁসি অবধারিত তোমার।"

"তাহলে পুলিসকে বলব লুটের টাকা এ বাড়িতে আছে।"

"তার আগেই সরিয়ে ফেলব অন্য কোথাও।"

"এখুনি চেঁচিয়ে সব কথা লোকেদের বলে দিচ্ছি। ফাঁসি যখন হবেই আর পরোয়া কিসের। তবে আপনাদেরও ও টাকা ভোগ করতে দোব না।"

"কিন্তু তাই বলে আমি ফাঁসি যেতে রাজি নই, তোমাকেই ফাঁসি যেতে হবে। লোকে সহজেই বিশ্বাস করবে তোমার পক্ষে খুন করা স্বাভাবিক। টাকা আমরা পাব না, কিন্তু তুমি টাকা আর প্রাণ দুটোই হারাচ্ছ, লোকসান তোমারই বেশি !"

এই শুনে গুণ্ডা খুবই বিচলিত হয়ে সিঁড়িতে বসে পড়ল। সদরের কড়া নাড়ছে প্রতিবেশীরা। 'কি হল', 'কি ব্যাপার' প্রভৃতি ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। খুকির জ্ঞান এখনো ফেরেনি।

"এখন আর ভাবনা করার সময় নেই। এক কাজ করা যাক, তোমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিচ্ছি, টাকার দাবিটা ছেড়ে দাও। মনে রেখ, বেঁচে থাকলে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা রোগজার করতে পারবে। ঠিক বলেছি কিনা ?"

বিভ্রান্তের মত গুণ্ডাটা এইবার মাথা হেলাল। সদরে দুমদুম ঘুষি পড়ছে। বৌদি ছুটে গিয়ে দরজা খুলেই চিৎকার করে উঠল, "সব্বোনাশ হয়ে গেছে, শিগ্‌গির ডাক্তার ডেকে আনুন। মা মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। ব্লাড প্রেসার ছিল। রকের কানায় মাথাটা ঠকাস্ করে লাগল, উফ্ কিরকম শব্দটা যে হল !"

এই বলে বৌদি উচ্চৈস্বরে কাঁদতে শুরু করল। প্রতিবেশীরা ছুটোছুটি শুরু করে দিল। ডাক্তার এল, অ্যাম্বুলেন্সও। মাকে হাসপাতালে পাঠান হল। খুকির

জ্ঞান ফিরে এসেছে, তাকে ঘরে শোয়ান হল। জনৈক প্রতিবেশীর প্রশ্নের উত্তরে বৌদি জানাল, "খুকির বিয়ের সম্বন্ধ এক জায়গায় ঠিকঠাক। এইমাত্র পাত্রের বাড়ি থেকে লোক পাঠিয়ে জানিয়েছে, মেয়ের মাথা খারাপ আছে বলে তারা নাকি খবর পেয়েছে। তাই শুনেই মা—"

খুকির আচ্ছন্নতা তখনো কাটেনি। সকলেব কথাবার্তা তার কাছে বকম-বকমের মত মনে হতে লাগল।

রাশিফল

আগের রাতে বাড়ি ফিরে সদরদরজা বন্ধ করতে করতে সুভাষ বলেছিল, "দালানের আলোটা নেবানো কেন রে?"

"বিকেলে জ্বালতে গিয়ে দেখি জ্বলছে না, বোধহয় বালব কেটেছে।"

ছোট ভাই বিভাস ঘর থেকে চেঁচিয়ে জানায়। একতলাব দালানটা দিনের বেলায়ও অন্ধকার সারাদিনই প্রায় আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এই দালানেরই একধারে রান্না হয়। আলো না থাকলে খুবই মুশকিল।

"একটা নতুন বালব লাগাতে পারিসনি?"

এর কোন জবাব আসেনি।

"টর্চটা আনতো, দেখি কি হল।"

দেখা গেল বালব ঠিকই আছে। অতঃপর সুইচের ঢাকনা না খুলে দেখাদেখি করতে গিয়ে সুভাষ শক্ খেল। চমকে উঠে হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বিরক্ত স্বরে বলে, "সকালে দেখব।"

প্রতিদিন সুভাষ বাজারে যায়। গত সাত আট বছর যাচ্ছে, এখন নেশার মত হয়ে গেছে। যাবার আগে, মেইন সুইচ বন্ধ করে সুইচটায় পরীক্ষা চালিয়ে জানতে পারল, বোতাম নামাওঠা করলে পিতলের পাতলা চ্যাপ্টা যে দুটো দাঁড়া তারে এসে স্পর্শ করে, তার একটা ভেঙ্গে গেছে। নতুন সুইচ কিনতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার মেজাজ অপ্রসন্ন হল।

"ঠিকমত টিপে জ্বালালে নেবালে এটা আর ভাঙ্গত না। তাতো কেউ—।'

বাবা-মা-ভাই-বোন সবাই বাড়িতে কিন্তু কেউ কথা বলল না। বললেই তর্ক শুরু হয়ে যাবে। বাবা রিটায়ার করার পর সুভাষই এখন পরিবারের কর্তা হিসাবে গণ্য হতে শুরু করেছে। বাজে বা অযথা খরচ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই সে পছন্দ করে না।

বাজারের বাইরে ট্রাম রাস্তায়ও একটা বাজার বসে। সুভাষের ধারণা সেখানে টাটকা সবজি সস্তায় পাওয়া যায়। আজ সে রাস্তায় বসা এক ডিমওয়ালার কাছ থেকে ছ'টি ডিম কিনল। ঝুড়ির প্রায় গুটি পনেরো ডিমের মধ্য থেকে নিজে

হাতে সে বেছে নিল যেগুলি তার চোখে বৃহদাকার মনে হয়। ফেরার পথে একটি সুইচ কিনল, তিন চার রকম দামের মধ্য থেকে মাঝারি দামের একটি। তখন তার মনে হয়েছিল, এই আড়াই টাকা ফালতু খরচ হত না যদি ঠিকমত সুইচটা ব্যবহার করা হত।

বাড়িতে ইলেকট্রিকের, কাঠের, জলের পাইপ, কলকব্জা সিমেন্টের ছোটখাট মেরামতি কাজ সুভাষ নিজেই করে। এতে সে আনন্দ পায়। তাছাড়া মিস্ত্রী খরচও বাঁচে। সুইচটা মিনিট পনেরোতেই সে বদলে ফেলল।

তারপর খবরের কাগজে প্রথম পাতা ও খেলার পাতায় চোখ বুলিয়েই স্নান করতে গেল। কলঘর থেকেই তার কানে এল মায়ের বিস্মিত খেদোক্তি "হায় পোড়া কপাল, কি ডিম এনেছে—দুটো পচা বেরল—" মিনিট খানেকেব মধ্যেই, "ওমা এটাও যে পচা!"

ছ'টির মধ্যে তিনটি পচা। ঠকে যাওয়া তার জীবনে এই প্রথম নয়, কিন্তু শতকরা পঞ্চাশ, এটা যথেষ্ট বড় আকারেরই ঠকা। যখন থেকে সে নিজেকে পরিণত, বুদ্ধিমানরূপে মনে করতে শুরু করেছে, তারপর এতবড় অপ্রতিভতা সে বোধ করেনি।

গা মুছতে মুছতে সে ডিমওলার মুখটা মনে করার চেষ্টা করল। গৌরবর্ণ, লম্বাটে, বড় চোখ ; দাড়ি গোঁফ নেই, সাদা শার্ট আর সবুজ লুঙ্গি, বছব আঠাশ কি ত্রিশ। অত্যন্ত সরল মুখ, কম কথা বলে। চাহনি দেখে মনে হয়েছিল শহরের সঙ্গে যথেষ্ট সডগড় নয়। ডিমের জোড়া বলেছিল বাজারের থেকে দশ পয়সা কম। তাইতেই সে প্রলুব্ধ হয়। এবং অভ্যাসমত আরও পাঁচ পয়সা কম দর দেয়।

ডিমওলা মাথা নাড়ে।

"না বাবু ও দামে দিতি পারব না।"

সুভাষ চলে যাবার জন্য, অবশ্যই ভান করে, মন্থরভঙ্গিতে কয়েক পা এগিয়ে যখন প্রত্যাশিত 'নিয়ে যান বাবু' ডাকটি শুনতে পেল না তখন নিজেই ফিরে আসে।

কলঘর থেকে বেরবার আগে সে নিজের মন্দ কপালকেই দোষ দিল। তার ভাগ্যই তাকে নিয়ে গেল ঠকার দিকে। কিন্তু সে নিজের উপর রেগে উঠল এইভাবে চিন্তা করার জন্য। ভাগ্য বরাত, কপাল এসব শব্দগুলো তার কাছে দুর্ব্বল মনের সাফাই ছাড়া কিছু নয়। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সে একটা যুক্তি খাড়া করল।

পনেরো কুড়িটা ডিমের মধ্যে, পচা, একটা বা দুটো থাকতেই পারে। সেটাকে

দুর্ঘটনা বলা যেতে পারে কেননা ডিম এমনই জিনিস বাইরে থেকে তার ভালমন্দ বোঝা দায়। অবশ্য জলে ফেলে দিয়ে বা মুঠোর মধ্যে রেখে আলোর দিকে দূরবীনের মত ধরে একরকম পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু শতকরা পঞ্চাশই খারাপ পাওয়াটা দুর্ঘটনা নয়, এটা ভাগ্যের ব্যাপার নয়, জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতই।

কলঘর থেকে যে রাগটা নিয়ে সে বেরল, তার বশেই সে ডিম খেল না।

"কালই ও বেটার কাছ থেকে তিনটি তুলে নিয়ে আসব। দেখে বোঝার উপায় নেই—কি গোবেচারা মুখ। চাষাভূষোরা নাকি সরল হয়! বোগাস।'

ঘরের ভিতর থেকে বাবা চেঁচিয়ে বলল, "ব্যাটারা সব চালাক হয়ে গেছে।"

বাবা সওদাগরী অফিস থেকে অবসর নিয়ে যে টাকা পেয়েছে তার এক চতুর্থাংশ এম এস সি পাঠরতা ঝর্ণার বিয়ের জন্য রেখে বাকিটা মানিকতলায় এক কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসায়েটির সদস্য হয়ে দফায় দফায় জমা দিয়েছে একটি ফ্ল্যাটের মালিক হবার জন্য। তিন দফায় মোট সত্তর হাজার টাকা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে। বাড়িটি হবে চারতলা, এখন তিনতলার ছাদ ঢালাই চলছে। চিঠি এসেছে আরো দশ হাজার টাকা অবিলম্বেই চাই, পনেরো দিনের মধ্যে। এর জন্য অবশ্য সুভাষ প্রস্তুতই ছিল কেননা, সে বিবেচক ও হিসেবী, সে জানে, গৃহনির্মাণের জিনিসের দাম যে হারে বাড়ছে তাতে এই ফ্ল্যাট তৈরির ব্যয় নব্বুই হাজার থেকে সওয়া লক্ষ টাকায় পৌঁছবেই। এবং সোসায়েটিও ঘনঘন টাকা চাইবেই। তাই সে দুমাস আগেই অফিস থেকে তিরিশ হাজার টাকা ঋণ পাবার জন্য দরখাস্ত করে এবং গত সপ্তাহে তা মঞ্জুরও হয়ে গেছে।

বাবা এখন প্রতি দুপুরেই ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণের কাজ পর্যবেক্ষণ ও সোসায়েটির কর্মকর্তাদের নানাবিধ পরামর্শ দিতে যায়। সাংসারিক খরচ কমিয়ে সুভাষের অফিসের ঋণ শোধ দেওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সে সম্পর্কেও অবিরত টিকটিক শুরু হয়েছে। বি এ পড়া বিভাস দিনের ট্রাউজার্স কেনার জন্য দুশো টাকা চাওয়ায় বাবা এবং সুভাষও মর্মাহত হয়েছিল।

দুই ভাই পাশাপাশি ভাত খাচ্ছিল। বিভাস এতক্ষণ পর কথা বলল, "ইচ্ছে করেই যে ঠকিয়েছে কি করে জানলে? ও লোকটাও কিনে এনে বেচছে, ওকেও ঠকিয়েছে। ডিমের ভাল খারাপ দেখে কি কেনা সম্ভব?"

"কে বলল সম্ভব নয়। জলে ফেললেই বোঝা যাবে, ভালগুলো ভাসবে আর পচাগুলো ডুববে। কিন্তু জলের বালতি নিয়ে আমার পক্ষে তো বাজার করা সম্ভব নয়।"

"ও লোকটার পক্ষেও সম্ভব ছিল না।"

ভিতর থেকে বাবার স্বগতোক্তি শোনা গেল, "বিভু বাজে তর্ক করে।"

তিনটে ডিমের ওমলেট বানিয়ে টুকরো করে তাই দিয়ে ঝোল রান্না হয়েছে। মা'র অনুনয়ে কর্ণপাত না করে সুভাষ উঠে পড়ল।

"ব্যাটা জেনে শুনেই পচা ডিম এনে বেচেছে, কাল ধরব।"

হাত ধোবার সময় সুভাষ আবার বলল, "যাদের কাছ থেকে কিনেছে তারাও নিশ্চয় জেনেশুনেই ওকে দিয়েছে, অত ডিমতো আর ওর নিজের ঘরের নয়—তার মানে ঠকানর ব্যাপারটা দুহাত ঘুরে এল। আমিই শেষ লোক, আমি আর কাউকে ঠকাতে পারছি না।"

সুভাষ হাসবার চেষ্টা কবল। ডিমওলার উপর রাগের সঙ্গে নিজের জন্য এক ধরনের করুণা, অসহায়তা ও অনিশ্চিতবোধ পলকের জন্য অনুভব করল। সেই সময় 'আমিই শেষ লোক' এই বাক্যটি তার মাথা থেকে নেমে এসে শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে তাব অস্তিত্বে ছড়িয়ে গেল। সে আবছাভাবে ভয় পেল। একসময় সে শেযার ট্যাক্সিতে অফিস যেত। কিন্তু ফ্ল্যাটের জন্য ব্যয়সঙ্কোচ করতে আর ট্যাক্সি চড়ে না। এতে সে মাসে প্রায় চল্লিশ টাকা বাঁচাতে পারছে। বাসে ওঠার সময় সুভাষের স্বতস্ফূর্ত সজীবতা নষ্ট হয়ে প্রবল বিরক্তিতে এবং মানুষের প্রতি বিদ্বেষে মনপ্রাণ প্রতিদিনই ভরে ওঠে। আজও তাই হল। নিজে ঠেলে এবং অপরের ঠেলায় সে এবং অন্য আরোহীরা মিলে একটা মাংসের চাপ বাধা জমাট কিমায় পরিণত হয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিত্ববোধ হারাবার পর সুভাষের ঝিমোনি আসে, নানাবিধ গন্ধে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ প্রণালীগুলি অসাড় হয়ে যায়।

কণ্ডাক্টরকে দু'টাকার একটা নোট সে দিল। ফেরতে খুচরোর সঙ্গে হাতে পেল টিকিট এবং ময়লা ন্যাতার মত জীর্ণ এক টাকার একটি নোট।

"এটা বদলে দাও।"

কণ্ডাক্টর নোটটির দিকে তাকালও না। কাঁধের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে আর একজনের কাছ থেকে ভাড়া নিতে নিতে বলল, "কেন, খারাপ কি আছে? আমিওতো ওটা প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকেই পেয়েছি। ছেঁড়াতো নয়। আপনাদের দেওয়া জিনিস আপনারাই যদি না নেন..."

সুভাষের পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলল, "আজকাল একটাকা, দু'টাকার এত ময়লা যাচ্ছেতাই নোট বাজারে হঠাৎ যে কোথা থেকে এল!"

সুভাষ কোন তর্ক বিতর্কে গেল না। একটা চিন্তায় সে কাঁটা হয়ে রইল। এই নোটটা তাকে গছাতে হবে। সে যেন এর শেষ মালিক না হয়।

বাস থেকে নেমে অফিস পর্যন্ত, দুটি পান সিগারেটের দোকান। দুটিতেই

দোকানী এবং তাদের সহকারীরা সুদর্শন ও সুবেশ, ব্যবহার বিনীত, নম্র এবং ক্ষিপ্র। সুভাষের আড়ষ্টতা এল এদের সামনে নোংরা নোটটি বাড়িয়ে দিতে হবে ভেবে।

সিগারেট বা পান সে কদাচিৎ খায়। শুধু নোটটি ভাঙ্গাবার বা এর থেকে রেহাই পাবার জন্যই সে প্রথম কিছু কিনতে চায়। অফিসের গেটের ধারে একটা কাঠের ডালায় সিগারেট নিয়ে বসেছে যে রুগ্ন যুবকটি তার পোশাক, স্বাস্থ্য ও সওদার দারিদ্র্য ও মুখের সরল অসহায়তা দেখে সুভাষ নোটটি ব্যবহার করতে মায়া বোধ করল। হয়ত ও ইতস্তত করে ভয়ে ভয়ে নোটটি প্রত্যাখ্যান করবে, তখনতো কণ্ডাক্টরের সংলাপই তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে।

সুতরাং নোটটি তার কাছে রয়েই গেল হয়ত বরাবরের জন্যই। চিন্তাটা মাঝেমাঝে খচ খচ করল টিফিন পর্যন্ত।

সুভাষ বাড়ি থেকে কিছু আনে না টিফিন সময়ে খাওয়ার জন্য অফিসে একতলায় সিঁড়ির পাশে ছোট দোকান থেকে প্রতিদিনের মত দুটি টোস্ট এবং আলুরদম তাকে দিয়ে গেল। খেতে খেতে সে লক্ষ্য করল কিছুদূরের টেবলে প্রবীণ শৈলেশ ঘোষাল অ্যালুমিনিয়াম কৌটো থেকে চামচে করে ছানা তুলে মুখে দেবার আগে প্রতিবার বিড়বিড়িয়ে কিসব বলে নিচ্ছে। ব্যাপারটা সে আগে কখনও লক্ষ্য করেনি।

হঠাৎ তার সঙ্গে ঘোষালের চোখাচোখি হল। আধ মিনিট পর আবার! বিব্রত হয়ে ঘোষাল বলল, "আজ দুধ পেয়েছ?"

"কি দুধ?"

"গরমেণ্টের হরিণঘাটার দুধ।"

"আমরা নিই না। বাড়িতে দিয়ে যায় গয়লা।"

"আজ আমরা দুধ পাইনি।"

কিছুক্ষণ পর ঘোষাল একই স্বরে বলল, "তোমাদের ফ্ল্যাট কত করে পড়ল?"

"শেষ হোক, তখন বলা যাবে। তবে যেভাবে বিলডিং মেটিরিয়ালের দাম বাড়ছে..."

সুভাষ থেমে গেল, বহুবার এসব কথা সে বলেছে।

"হুঁ, শুধু সিমেণ্ট লোহা কেন সব জিনিসেরই। আজ দোকান থেকে ছানা কিনলুম, কেমন যেন বাসী টক্ টক্ লাগছে। তুমি অবাক হবে শুনলে, কত দর জানো এখন?"

সুভাষ ক্লান্ত বোধ করল। এসব কতজায়গায় কতবার শুনতে হয়!

"ঘোষালদা আপনি ছানা খাবার সময় মনে মনে কি বলছিলেন যেন?"

"হুঁ।"

"মন্তরটন্তর ?"

"ওই, সেই রকমই। এই হপ্তাটা বৃষ রাশির পক্ষে ভাল নয়। তোমার কি রাশি ?"

"জানি না।"

"কোষ্ঠি নেই তোমার ?"

"না।"

"জন্মতারিখ আর সময়টা জান ?"

"মা জানে সময়টা—কিন্তু বৃষরাশির পক্ষে হপ্তাটা ভাল নয় কেন ?"

শৈলেশ ঘোষাল জবাব না দিয়ে কৌটোটা ধুতে গেল। ফিরে আসতেই সুভাষ বলল, "আমার কি রাশি বলতে পারেন ?"

"কি করে বলব !"

"আমার আজ দিনটা ভাল যাচ্ছে না। গচ্চা দিয়েছি।"

শৈলেশ ঘোষাল ভ্রূ তুলে প্রশ্ন করল চোখ দিয়ে।

"আজ সকালে একটা ডিমওয়ালা..." মিনিট তিনেকের মধ্যে সুভাষ, বাজার—ডিমকেনা, রাতে শক খাওয়া, সুইচ কেনা, বাসের কণ্ডাক্টর এবং একটু ইতস্তত করে সিগারেট না কেনার কারণগুলো বলে দিল।

"তোমার উপর চন্দ্রের আর বুধের প্রভাব আছে তাই এত সফট হার্টেড।"

শুনে ভাল লাগল তার।

শৈলেশ ঘোষাল বুকপকেট থেকে একটা ফর্দের মত লম্বা কাগজ বার করে কিছুক্ষণ ধরে চোখের সামনে ধরে রইল।

"শরীরে কোন উৎপাত তিন চারদিনের মধ্যে হয়েছে কী ?"

সুভাষ দ্রুত 'না' বলেই যোগ করল, "উৎপাত বলতে কি বোঝাচ্ছেন ?"

"মাথাধরা, হাড়গোড় ব্যথা, অর্শ, সর্দি-ইনফ্লুয়েঞ্জা, পেটখারাপ ?"

পেট খারাপ শব্দটা সুভাষ অপছন্দ করে। পাকস্থলির অপটুতার সঙ্গে খাদ্যের প্রতি লোভের যোগাযোগ থেকে উৎপন্ন একধরনের দুর্বলতা এই পেটখারাপ থেকে বেরিয়ে আসে।

"আজ শরীর ঠিক আছে। শুধু বাস থেকে নেমেই একটা ঢিবিতে ঠোক্কর খেয়ে আঙুলে ব্যথা হয়েছিল, এখন নেই।"

শৈলেশ ঘোষাল কয়েক সেকেণ্ড সন্তর্পণে ভেবে নিয়ে বলল, "মানসিক আঘাতটাঘাত ?"

"এই আজ হল।"

"না না এ ধরনের নয়, এটাতো আর্থিক ক্ষতির ব্যাপার। কারুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি, মনোমালিন্য ?"

"প্রেমট্রেম ? কোন মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপই নেই।"

"ভুল বোঝাবুঝি কি শুধু মেয়েদের সঙ্গেই হয় ? তুমি বাংলা নভেল পড় নাকি ?"

"তাহলে আর কার সঙ্গে হবে ?"

"আমার সঙ্গে হতে পারে, ইউনিয়নের সঙ্গে, জি-এমের সঙ্গে, বাবা-মা'র সঙ্গে।"

"তা হতেই পারে।"

ফর্দটার সঙ্গে আবার কিছুক্ষণ পরামর্শ করে বলল, "নতুন কোন লোকের সঙ্গে গত দুদিনের মধ্যে আলাপ পরিচয় হয়েছে ?"

"না।"

বলেই সুভাষ ছাদের দিকে তাকিয়ে ভাবল, সত্যিই কারুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে কিনা। বেঁটে চশমাপরা রুগ্ন একটা লোকের সঙ্গে বাজারে প্রায়ই চোখাচোখি হয়। গতকালই লোকটা স্তম্ভিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "দশ পয়সায় ছ'টা কাঁচালঙ্কা···মানে হয় ? কোন্ দেশে বাস করছি ?" তাইতে সে বলেছিল, "তাও দেখবেন ঝাল নেই।"

একে কি আলাপ পরিচয়ের পর্যায়ে ধরা যায় ? এর আগে একদিন লোকটা নিজের মনেই দমদম দাওয়াই দেবার জন্য সুভাষের পাশের একটি লোককে বলছিল : "সবাই মিলে না করলে একা একা হয় না। এভাবে চললে বাঁচব কি করে মশাই !" তখন লোকটা বারকয়েক তার দিকে তাকিয়েছিল। সে অবশ্য চোখ সরিয়ে নেয়।

"আচ্ছা সুভাষ, বিশেষ কোন সূত্র থেকে কোন উপকার পেয়েছ কি, তিন-চারদিনের মধ্যে ?"

"উপকার বলতে কি বোঝাচ্ছেন ?"

"ধারটার পাওয়া, কি কোন ফেভার ! আজই বাসে এক চেনা লোককে দেখলুম পিছন দিকের লম্বা সীটে। আমাকে চোখের ইসারায় ডাকল, ভিড় ঠেলে গেলুম তার কাছে। জানাল এক্ষুনি নামবে। আমিও তৈরি হলুম। যেই উঠল টুক্ করে বসে পড়লুম। এটাও এক ধরনের উপকার। কিংবা বোনের জন্য পাত্র খুঁজছ, কেউ হয়ত খোঁজ দিল।"

"তিন চারদিন আগে গ্লোবের করিডোরে দাঁড়িয়ে ফোটোগুলো দেখছি, হাউসফুল ! এক ভদ্রলোক বলল তিন আশির টিকিট আছে। ব্ল্যাকে নয়

ঠিকদামেই, নিয়ে ফেললুম। কি দুর্দান্ত অভিনয়—আর ফোটোগ্রাফি !"

"তোমার রাশি বোধহয় বৃষ।"

"তাহলে ?"

"তাহলে আর কি..."

শৈলেশ ঘোষাল ফর্দটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "এই হপ্তায় যা যা হবার তার অনেকগুলোই মিলে গেছে। শুধু অনর্থক ঝামেলায় জড়িয়ো না আর অপ্রত্যাশিত কোন সুযোগ আসার যোগ রয়েছে।"

সুভাষের মনে হল, ময়লা একটাকার নোটটা চালাবার সুযোগ হয়ত সে পাবে আর অনর্থক ঝামেলা মানে বাজারে দেখা হওয়া বেঁটে লোকটার কথাবার্তা শোনা। দল পাকাতে চায় দমদম দাওয়াই দেবার জন্য। লোকটাকে অত্যন্ত রাগীই মনে হয়। জিনিসের দাম বাড়লে কি আর করা যাবে !

প্রডাকসন কি ডিস্ট্রিবিউসনের ভার তো মাছওলা, আলুওলা, লঙ্কাওলার হাতে নয়। পলিটিক্যাল নেতারা যদি কোরাপ্ট হয় তাহলে তো এরকম হবেই।

টিফিনের পর সুভাষ বাকি সময়টা নিজের সঙ্গেই মনে মনে তর্কবিতর্ক করল এবং অনর্থক ঝামেলা ও অপ্রত্যাশিত সুযোগ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

শৈলেশ ঘোষাল আর সে এক সঙ্গেই ছুটির পর বেরল।

"ঘোষালদা, যে কাগজটা দেখে বলেছিলেন সেটা কী ?"

"পাঁচ-ছ'টা খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনে যে রাশিফল বেরয় তাই থেকে কনসাল্ট করে কমন ফ্যাক্টরগুলো মিলিয়ে আমি একটা তৈরি করি।"

"মেলে ?"

"দেখ না দু-তিনটে দিন কি হয়।"

"ঘোষালদা আপনারও বৃষ ?"

"হ্যাঁ।"

"অনর্থক ঝামেলায় পড়ার ভয় তাহলে আপনারও রয়েছে।"

"ছানাটা মনে হচ্ছে ভাল ছিল না। অম্বল হতে পারে।"

বিরক্ত সন্ত্রস্ত মুখ নিয়ে শৈলেশ ঘোষাল রাস্তার ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হল।

এবার সে ধীরগতিতে হেঁটে যাবে বিবাদী বাগ। মিনিবাসের লাইনে দাঁড়াবে এবং বাসে চড়ে বাড়ি যাবে। তার নিত্যদিনের সূচি এটাই।

"কি রে সুভাষ।"

চমকে সে তাকিয়ে দেখল তার কলেজের বন্ধু ধীরেন একটু ঝুঁকে একটা অ্যাম্বাসাডার মোটরের জানালা দিয়ে তাকে দেখছে। দুটো হাত স্টিয়ারিংয়ে।

"বাড়ি যাবি তো তাহলে উঠে আয়। আমি এয়ারপোর্ট যাব।"

প্রথমেই তার মনে পড়ল, এটাই সেই অপ্রত্যাশিত সুযোগ। সে গাড়িতে উঠে ধীরেনের পাশে বসল।

"কাউকে রিসিভ করতে যাচ্ছিস নাকি ?"

" বউ ছেলেমেয়ে আসছে দিল্লি থেকে। ওখানেই শ্বশুরবাড়ি। বল্ আছিস কেমন, প্রায় বছর সাত-আট পরে দেখা, তাই না ?

এইভাবে ধীরেন শুরু করল এবং গাড়ি চালাতে লাগল। শরীর, চেহারা, বয়স, সংসার, বিয়ে ইত্যাদি নিয়ে কথাবার্তা হতে হতেই সুভাষ বুঝে নিল ধীরেন এখন স্ত্রী পুত্রকন্যা নিয়ে খুবই ভাল আছে। যথেষ্ট অর্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

"কচ্ছিস কি, ব্যবসা ?"

"কেমিক্যালস।"

"বাড়ি করেছিস ?"

"ফ্ল্যাট কিনেছি গড়িয়াহাটায়, আয় না একদিন। তবে এই সপ্তাহে নয় কালই বাঙ্গালোরে যাচ্ছি।"

সময় করাই তো মুশকিল, তুই থাকিস দক্ষিণে আমি উত্তরে। রোববারটা কাটাই..., আমি একটা ফ্ল্যাট নিচ্ছি, এখন হাফওয়ে স্টেজে, ওখানেই কাটাই।"

"কত পড়ল ?"

"কমপ্লিট হলে জানা যাবে।"

সুভাষ এরপর কিছুতেই আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারল না, এতক্ষণ যে হীনভাব দ্বারা আচ্ছন্ন হচ্ছিল তাই থেকে বেরিয়ে আসতে।

" সোয়া লাখ তো অলরেডি দিয়েছি।"

"কত স্কোয়ার ফিট ?"

"চোদ্দশ।"

"বেশ বড়ই !"

"মোটামুটি। ...গাড়িটা কি সেকেন্ডহ্যাণ্ড কিনেছিস ? আমি একটা খুঁজছি।"

"এটাই নে না। আমি একটা সেভেন্টিসেভেন মডেলের পাচ্ছি। নতুনের যা দাম আমাদের মত লোকদের পক্ষে আর কেনা সম্ভব নয়। ছোট শালা একটা কিনল, প্রায় আশি হাজারের মত পড়েছে। নিস তো চল্লিশেই দেব।"

সুভাষ স্বচ্ছন্দভাবেই ব্যাপারটাকে এতক্ষণ ধরে রেখেছিল। ধীরেনের প্রস্তাবটা সে আশা করেনি।

"তোকে পরে জানাব।"

ধীরেন এই নিয়ে আর কথা বাড়ায়নি ; তাইতে সুভাষ অনর্থক এক ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পেল। তাকে নামিয়ে দিয়ে ধীরেন দমদমের দিকে

চলে গেল। বাস ও ট্রামের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, ধীরেনের সঙ্গে দেখা হওয়া এবং লিফ্‌ট পাওয়া নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত ঘটনার অন্তর্গত হওয়া উচিত। ঘোষালদা মোটামুটি ঠিক।

সন্ধ্যাবেলায় সে খবরের কাগজ খুলে বার করল সেই জায়গাটা যেখানে সপ্তাহের রাশিফল ছাপা হয়। বৃষ রাশিতে দেখল ঘোষালদা যা যা বলেছে তাই রয়েছে, এমন কি 'অনর্থক' ঝামেলা এড়িয়ে চলুন কথাটা পর্যন্তও। শুধু একটা নতুন কথা সে পেল, "আপনার দ্বারা কেউ উপকৃত হবে।"

কে উপকৃত হবে এবং কিভাবে সে উপকার করবে! সুভাষ খুবই ধাঁধায় পড়ে গেল। সে গত সোমবার থেকে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করল, কারুর উপকার করেছে কিনা। সে কোন বৃদ্ধকে বাসে সীট ছেড়ে দেয়নি, কোন অন্ধকেও হাত ধরে রাস্তা পার করে দেয়নি কেননা এরকম সুযোগ সে পায়নি। এমন কি কোন আহতকেও পায়নি হাসপাতালে পৌঁছে দিতে। সে কোন ডুবন্তকে জল থেকে তোলেনি, অবধারিত গাড়ি চাপা থেকেও কাউকে রক্ষা করেনি। কেউ তার কাছে টাকা ধার চায়নি, কোন কাজ উদ্ধারের বা তদ্বিরের জন্যও কেউ তাকে বলেনি।

পচা ডিম কিনে ডিমওলাকে লাভবান হবার সুযোগ দেওয়া কি, প্রায় অচল নোট নিয়ে কণ্ডাক্টরকে রেহাই দেওয়ার মত ব্যাপারকে সে উপকারের পর্যায়ে ফেলবে কিনা বুঝে উঠতে পারল না। তাহলে আর কিভাবে অন্যকে উপকৃত করা যায়? অবশ্য এখনও এই সপ্তাহের একটা দিন বাকি রয়েছে।

এমন সময় মা ঘরে ঢুকে দ্বিধাভরে কাছে এল।

"তাহলে কি বলব? একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি তো বলা যায় না মেয়ে পছন্দ হয়নি।"

"বলে দাও না ছেলে বলেছে, বোনের বিয়ে না দিয়ে বিয়ে করবে না, তাহলেই ল্যাঠা চুকে যায়।"

"যদি বলে, আমরা অপেক্ষা করব!"

"করে করুক।"

"তাই কখনো হয় ...মেয়ে কিন্তু খারাপ নয়, আমি তো দেখে এসেছি, গড়নপেটন ভাল, লজ্জা, চুলও খুব, রঙও ফর্সা। ...কত দেবে থোবেও, ছ'ভরি সোনা, স্টিলের আলমারি, খাবার টেবল, খাট-বিছানা, সোফা, ফ্রিজ কিংবা টিভি-র যে কোন একটা, তাছাড়া বৌভাতের খরচ পাঁচ হাজার টাকা নগদ। আজকালকার দিনে এত্ত জিনিস। বাপের এক মেয়ে তো দিতে কার্পণ্য করবে না।"

এরপর মা নিগূঢ় এক রহস্য উন্মোচনের মত ফিসফিস করে বলল, "ঝর্ণার

বিয়েতে আমাদের যা দিতে হবে সেগুলোতো পেয়ে যাচ্ছি। কম উপকার হবে ?"

উপকার শব্দটা ঢং করে ঘড়ির মত সুভাষের মাথার মধ্যে বেজে উঠল। আশ্চর্য, রাশিফলেও বলেছে কেউ উপকৃত হবে ! উপকার হবে সংসারের। ঝর্ণার জন্য ওই সব জিনিসের অনেকগুলো কিনতে হবে না আর। কম করে হাজার বারো-চোদ্দ টাকা তো বেঁচে যাবে ! সেটা লাগানো যাবে ফ্ল্যাটে।

টিক টিক করে চিন্তা শুরু হয়ে গেল সুভাষের। দুমাস আগে এই সম্বন্ধটা নিয়ে এসেছিল পিসিমা। সদ্য তখন সে অফিসার গ্রেডে প্রমোশন পেয়েছে। শুনেই 'না' বলে দিয়েছিল কেননা সে নিজেকে রুচিবান, আধুনিক, পরিশীলিত রূপে গণ্য করে। যারা পণ নেয় তাদের সে বর্বব ছাড়া আর কিছু ভাবে না। কিন্তু সেটাতো দুমাস আগেব কথা।

এখন সে যদি শুধু মাত্র 'হ্যাঁ' কিংবা 'আচ্ছা' একটি মাত্র শব্দ মুখ থেকে বার করে তাহলেই একটা পরিবার উপকৃত হয়ে যায়। এটা তাকে চমৎকৃত এবং মুগ্ধ করল।

মা অপেক্ষা করছে।

সুভাষ অত্যন্ত গম্ভীরতর অথচ উদাসীনভাবে বলল, "দুর্গাপুর থেকে ছেলেপক্ষ আর কিছু জানিয়েছে কি ?"

"আব কি জানাবে, সব তো পাকা হয়েই আছে। ঝর্ণার পরীক্ষাটা হলেই ··বলছিলুম কি ওব বিয়েটা একটু পিছিয়ে তোরটা আগে হলে উপকারটা হয।"

আবাব উপকার ! সুভাষ মনে মনে নড়েচড়ে উঠল। এখন তার মনে হচ্ছে পরিবারেব উপকারেব জন্য পণ বা যৌতুক না নেওয়ার নীতি ত্যাগ করলে কিছু আসে যায় না। সে না নিলে অন্য কেউ তো নেবেই। তাছাড়া সে নিজের আরাম বিলাসের জন্য তো নিচ্ছে না ! ওসব দুর্গাপুরে যাবে।

"আচ্ছা, কাল জানাব। আজ রাতটা ভেবে দেখি।"

মা খুশি হয়েই দ্রুত বেরিয়ে পাশের ঘরে অপেক্ষমান বাবার কাছে গেল। সুভাষও নিশ্চিন্ত হল রাশিফল অনুযায়ী উপকার করার সুযোগ হাতে পেয়ে।

পরদিন সকালে সে বাজার যাবার পথে ভাবল, ডিমওলাকে দেখলেই তো তার মাথার রক্ত চড়ে যাবে এবং ঝুড়ি থেকে গোটা চার পাঁচ ডিম তুলে নিয়ে কি ফাটিয়ে ফুটিয়ে সে অনর্থক ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে। ব্যাপারটা ভাবতেই সে নিজেকে নিয়ে ভয় পেল। রাশিফল বলেছে না জড়াতে ! অনেকগুলোই তো মিলে গেছে সুতরাং এটাও এড়িয়ে যাওয়া ভাল। এইভেবে

সে অন্য পথে বাজারে ঢুকল।

আলু, মাছ, পান ইত্যাদি কিনতে কিনতে সে বাজারের এক প্রান্ত থেকে যখন অন্য প্রান্তের দিকে এগোচ্ছে তখন সেই বেঁটে চশমাপরা রুগ্ন লোকটিকে চিৎকার করতে দেখল।

"নিশ্চয় ওজন মেরেছে, এই কটা পেঁয়াজ আড়াইশো গ্রাম হতেই পারে না।"

"যান না মশাই, অন্য জায়গা থেকে ওজন করিয়ে দেখুন না।"

"বেশ তাই দেখব।"

লোকটা রাগে কাঁপতে কাঁপতে সামনের ডালের দোকানে যেতেই ডালওলা হাত নেড়ে বলল, "অন্য কোথাও যান, ওজনটোজন করতে পারব না।"

লোকটা তারপাশে মুদির দোকানে গেল। সে শুধু মাথা নেড়ে, নিরাসক্ত চোখে তাকিয়ে রইল। লোকটা এবার পর পর তিনটি দোকানে গেল এবং প্রত্যাখ্যাত হল। তার আড়াইশো গ্রাম পেঁয়াজ ওজনে ঠিক না কম সেটা কেউ তাকে মেপে দিতে রাজি নয়।

অদ্ভুত অসহায় অপ্রতিভ চোখে লোকটা ফ্যালফ্যাল করে চারধারের লোকেদের মুখে একের পর এক তাকিয়ে বিড়বিড় করল। তারপর হঠাৎ থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো পেঁয়াজ বার করে পেঁয়াজওলার মুখে ছুঁড়ে মারল।

এরপর যা ঘটল তা মোটেই অভাবনীয় নয়। পেঁয়াজওলা লাফিয়ে তার মাচার মত জায়গাটা থেকে নামল। তার পাশের দু-তিনটে দোকান থেকেও লোক নামল এবং লোকটার মুখে বুকে পেটে তারা ঘুষি মারতে থাকল।

সুভাষ খুব কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটাকে রক্ষা করার জন্য দু তিন পা এগিয়েও সে থেমে পড়ল। এগুলোই অনর্থক ঝামেলা, লোকটা নিজেই ডেকে এনেছে সুতরাং ও একাই ঝামেলাটা পোহাক।

এই ভেবে সে বাকি কেনাকাটা সেরে রাস্তায় বেরিয়েই দেখল সামনেই বসে গতকালের ডিমওলাটা। ওকে দেখে তার একফোঁটাও রাগ হল না, এমন এক বিস্ময়কর বোধের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে সে দেখল ডিমওলাটা সরলভাবে হেসে তাকে বলছে, "বাবু, আজ ডিম নেবেন না?"

সুভাষ ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে বলল, "কাল তোমার তিনটে ডিম পচা ছিল।"

ডিমওলার মুখ যেন লজ্জায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

"বাবু আমি কি করবো··· আমারে দ্যাছে আমি তাই আনি বেচতিছি। আমারে মাফ করে দ্যান বাবু। আপনি বরং আজ নে যান ডিম, দাম দিতি হবে না।"

ওর ভীত সন্ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে এবং কথাগুলো শুনে সুভাষের মনে হল

রাশিফল সত্যিই মিলে যাচ্ছে। এই একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ যা সে কদাচিৎ পায়।

"থাক, ডিম আজ দরকার নেই। আর একদিন নেব তবে পুরো পয়সা দিয়েই।"

সুভাষ অপ্রত্যাশিত একটা সুখ নিয়ে বাড়ি ফিরল।

জলের ঘূর্ণি ও বকবক শব্দ

বিয়ের পর ঘরের অকুলান এবং ডেইলি প্যাসেঞ্জারির ধকল, এই দুই ঝকমারি সামলাতে, বিশ্বনাথ কলকাতার উত্তরে বাসা পেয়ে গোবরডাঙ্গার পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে উঠে এসেছে। সে চাকরি করে বিরাট এক হোটেলে। প্রায় সাড়ে সাতশো কর্মচারির ছুটির হিসাব রাখা তার কাজ। বউ পূর্ণিমা, সাত মাসের পুত্র বুবুন আর বাসু নামে বছর বারোর একটি কাজের মেয়েকে নিয়ে তার সংসার। হাজার টাকা সেলামি দিয়ে দেড়শো টাকা ভাড়ায় দেড়খানি ঘর, ছোট্ট রান্নাঘর আর সরু একটি দালান নিয়ে তার সংসার। টানাটানি নেই আবার সচ্ছলও নয়, যেমন পূর্ণিমা সাদামাটা নয় আবার সুন্দরীও নয়।

বিশ্বনাথ জন্ম-রুগ্ন। শরীর কমজোরী হওয়ায় ছোট থেকেই সে ভীরু প্রকৃতির। পূর্ণিমা কিছুটা বিপরীত। সে চটপটে, পরিশ্রমী এবং কিঞ্চিৎ রাগী। কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস পদ্ধতির সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে তার অসুবিধা হয়নি শুধু জলের ব্যাপারটি বাদে। সে অস্বাচ্ছন্দ্যে পড়ে সকাল বেলাটায়।

এই বাড়ির তিনটি পরিবারের জন্য উঠোনে এজমালি একটি জলের কল। স্নানের ঘরেও একটি কল আছে চৌবাচ্চার উপরে। পূর্ণিমাদের মুখোমুখি উঠোনের ওধারে একটি ঘরে থাকে স্যাকরা কানাই দত্ত, তার দ্বিতীয় পক্ষের বউ সুপ্রিয়া এবং দুই পক্ষের মোট তিনটি ছেলেমেয়ে। বাড়িওয়ালা রূপেন পাল কাঠের ব্যবসায়ী। তার সংসারে স্ত্রী, এম-এ পাঠরতা কন্যা আর নিমাই নামে একটি চাকর মাত্র। জনা বারো প্রাণী নির্ভর করে একটি কলের উপর। প্রতিদিন দুবেলা কে আগে কলের নিচে কলসি বা বালতি বসাবে, এই নিয়ে তিন পরিবারের লোকেদের মধ্যে মিউজিক্যাল চেয়ারের মত জলধরার প্রতিযোগিতা চলে। মছলন্দপুরের বাপের বাড়িতে টিউবওয়েল, পাতকূয়া এবং পুকুর পূর্ণিমাকে যথেচ্ছ জল খরচ করার অভ্যাস তৈরি করে দেওয়ায় এখন চার বালতি জলের সঙ্গে সে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারে না। স্বামীকে সে প্রায়ই অনুযোগ করে, "বাড়িওলাকে বল আর একটা কল বসাতে, এভাবে রোজ রোজ পারা যায় না। উঠোন ধুতে দু বালতি জল ঢেলেছি ওমনি ওপর থেকে মাসিমার চিৎকার,

'চৌবাচ্চা খালি করে দিও না গো।' চান করছি আর তখন দরজার কাছে এসে সুপ্রিয়া বলবে, 'উনি চান করবেন, একটু জল রেখ।' বাড়িওলাকে এবার বল আর একটা কল বসাক।"

"বললেই কি কল বসান যায়। কলকাতার জলের অবস্থাটা আগে বোঝ। কল দিয়ে বেরবার জন্য জলটা কোথায়? জল দেবে কর্পোরেশন, বাড়িওলা তো নয়।"

বিশ্বনাথ সর্বদাই বিরোধ বিসংবাদ এড়িয়ে চলতে চায়, সে জানে চিৎকার ঝগড়া হাতাহাতি করে সামান্য কিছু আদায় করা গেলেও মানসিক উৎপীড়নে অশান্তিতে ভুগতে হবে। পূর্ণিমাকে সে বোঝায়, "সব কিছু কি আর কবে দেওয়া যায়, মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়, কিছুটা ছেড়ে দিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। যখন যেরকম অবস্থা পড়ে তখন তেমনভাবে চলা।"

"মানিয়ে চলারই তো চেষ্টা করি। যখন কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছিল না, মাসিমা বোতল হাতে এলেন তখন কি আমি আধবোতল দিইনি? হঠাৎ যেদিন দুধের ধর্মঘট হল, মিণ্টু এসে বলল বাবা চা খেতে পাচ্ছে না একটুখানি দেবে কাকিমা? বুবুনের বেবিফুড থেকে তো দু-চামচ দিলুম। মানিয়ে চলতে একা আমি চাইলেই তো হবে না। লোডশেডিং হলে হারিকেনটা রান্নাঘরের দরজার বাইরে রেখে কাজ করি, তাতে আমার অসুবিধে হলেও কিছুটা আলো তো সদরে পড়ে। এসব কেন করি, মানিয়ে চলার জন্যই তো।"

"অন্যে আমার জন্য কি করল বা না করল তাই নিয়ে মন খারাপ করে লাভ কি, তোমার কর্তব্য তুমি করে যাও।"

"সংসার চালাতে গেলে অত ভালমানুষ হলে চলে না।"

বিশ্বনাথ তখন ট্রানজিস্টারের চাবি ঘোরাল ছায়াছবির গান শোনার জন্য।

কয়েকদিন পর সকালে খবরের কাগজ পড়ার মধ্যেই বিশ্বনাথ একবার রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে উঁচুস্বরে বলল, "পলতায় জলের পাইপ বদলান হবে বুধবার বিকেল থেকে বারো ঘণ্টা জল আসবে না, জল ধরে রেখ।"

কথাটা পূর্ণিমার কানে পৌঁছল কিন্তু গভীরে নয়। দুদিন পর বুধবার এল। প্রতিদিনের মতই সে সংসারের জন্য জল তুলল। শুধু বিকেল আর রাতে জল বন্ধ, বৃহস্পতিবার সকালেই পাওয়া যাবে এই নিশ্চিন্তিতে সে বাড়তি জল ধরেনি। কিন্তু বিশ্বনাথের নজরে পড়ল কানাই দত্তর বউ আর বড় মেয়ে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, ডেকচি, গামলা করে চৌবাচ্চা থেকে জল নিয়ে গেল প্রায় চোরের মত। এভাবে জল নেওয়ার কোন কথা নয়। এখনো বাড়ির কারুরই স্নান হয়নি। ঠিক তখনি দোতলা থেকে নিমাইও দুটো ঢাউস প্লাস্টিকের

বালতি হাতে নামল।

বিশ্বনাথ রান্নায় ব্যস্ত পূর্ণিমাকে বলল, "জল ধরে রেখেছ তো ?"

"খাবার জল দুবালতি রেখেছি, হবে না ওতে ? কাল সকাল পর্যন্ত তো। রাস্তার টিউবয়েল থেকে দরকার হলে বাসু এনে দেবে।"

"সেটা তো কতদিন ধরে খারাপ হয়ে রয়েছে, ওদিকে চৌবাচ্চা খালি করে ওরা জল নিয়ে গেল।"

"তাহলে চটপট তুমি কলঘরে ঢুকে পড়, চানটা করে নাও। দেখলে তো কেমন স্বার্থপরের মত নিজেরা চৌবাচ্চার সব জল নিল যেন ওরা ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ নেই।"

বুধবার বিকেলে কলে জল এল না। চৌবাচ্চা শুকনো। রাতে সকড়ি বাসন জলে ভিজিয়ে রাখা পূর্ণিমার অভ্যাস। তুলে রাখা দু বালতি জলের একটি থেকে অর্ধেক খরচ হয়ে গেছে। তাই থেকে দু গ্লাস জল নিয়ে সে বাসনে ছড়িয়ে দিল। শোবার আগে গা ধোয়া তার অভ্যাস, আজ সে এক গ্লাস জলে গামছা ভিজিয়ে গা মুছল। ভ্যাপসা গরমের জন্য বিশ্বনাথ পাখার নিচে মেঝেয় শোয়। ন্যাতা ভিজিয়ে মেঝে মুছতেও এক গ্লাস খরচ হল। প্রতিদিনের মত দাঁত ব্রাশ করার জন্য বিশ্বনাথের দু গ্লাস জল দরকার হল। বালতিটায় তারপর আর কিছু রইল না।

"আর এক বালতি তো রইল।"

পূর্ণিমার নিশ্চিন্ত মুখে বিশ্বনাথ অনিশ্চিত চাহনি রেখে বলল, "কিন্তু সকালে যদি জল না আসে ?"

পরদিন সকালে জল এল না।

পূর্ণিমার হতভম্ব অবস্থাটা কেটে যেতেই কথার খেলাপ করার জন্য কর্পোরেশনের উপর রেগে উঠল। সংসারের নিত্যকর্মগুলো শুরু করতে গিয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। এক বালতি জল কোন কর্মে লাগবে!

বিশ্বনাথ একটা বালতি নিয়ে কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল। আধঘন্টা পর আধ বালতি জল নিয়ে ফিরল।

"কি লাইন আর কি ঝগড়ারে বাবা!"

"কোথায় গেছলে ?"

"এই পিছনে বাজার যাবার পথে যে বস্তিটা। ওরা নিতে দিচ্ছিল না, অনেক বলে কয়ে আধ বালতি নিতে দিল।"

"চান তো হবে না, তুমি বরং এটা নিয়ে পায়খানায় যাও।"

"আর তুমি, বাসু ?"

"সে যা হোক করে হয়ে যাবে, তোমাকে তো এখন বেরতে হবে।"

"তাহলে থাক্, আমি হোটেলেই সব সেরে নেব। ওখানে নিজেদের জলের ব্যবস্থা আছে।"

"বাজার থেকে কলাপাতা এন।"

বুবুনকে কোলে নিয়ে বাসু শুনছিল, বলল, "বউদি চাপাকল থেকে জল আনব ?"

"রাস্তার ওই নোংরা জল, ম্যাগো !"

"গঙ্গার জল তো, কত লোক নিচ্ছে।"

"নিক্ গে, বিকেলেই জল এসে যাবে।"

বিকেলে জল এল না।

কলের নিচে বালতি রেখে পূর্ণিমা দুপুর থেকে অপেক্ষা করেছে, ঢেঁকুর তুলে সর্দি ঝাড়ার মত শব্দ কখন বেরিয়ে আসে।

"বালতি পেতে কোন লাভ নেই গো।" উঠোনের ওধার থেকে সুপ্রিয়া বলল, "এরকম আগেও তো হয়েছে, একবেলা বলে চারবেলা, একদিন বলে তিন দিন! এবার কতদিন চলবে তার কি ঠিক আছে। আমি বাবা কাল সকালটা দেখব, এল তো ভালই নইলে শিবপুরে দিদির বাড়ি চলে যাব।"

পূর্ণিমা শুনেই গেল। কলকাতার ত্রিশ-চল্লিশ মাইলের মধ্যে তার কোন আত্মীয়স্বজন নেই। এখন তার শরীরে টোকো গন্ধ। জ্যৈষ্ঠি মাসের গরম, বাতাসও বইছে না। একতলার ঘরে দরদর ঘামের সঙ্গে ধুলো মিশে চামড়াব উপর কাদার পরত ফেলেছে। সারাদেহে চিটচিটে অস্বস্তি। পাযখানায় যেতে পারেনি, তলপেটে একটা গুমোট ক্রমান্বয় চাপ দিচ্ছে।

বুবুনের জন্য দুধ তৈরি করতে হবে কিন্তু জল রয়েছে বড়জোর এক গ্লাস। তেষ্টায় পূর্ণিমার ছাতি ফেটে যাবার মত অবস্থা অথচ জলটুকু সে খেতে পারছে না, বুবুনের বেবিফুড গুলতে ওটুকু দরকার। সুপ্রিয়ার কাছে এক গ্লাস চাইতেই সে পরিষ্কার বলে দিল : "না ভাই জল এখন চাওয়া-চাওয়ি কোর না। দুপুরে মিনুর বাবা মারামারি করে টিউকল থেকে এক বালতি এনে দিয়েছে...আমাদেরও তো দরকার লাগবে।"

গেলাস নিয়ে সে দোতলায় গেছল। মাসীমা বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, "পোড়া কপাল. দুপুর থেকে গলা ভেজাবার মত জলও নেই। নিমাই একটা ভারীকে ধরেছিল একটিন জলের জন্য, ব্যাটা বলে দিল দিতে পারব না। তিনগুণ চারগুণ দাম দিয়ে দোকানদাররা যে নিচ্ছে!"

পূর্ণিমা মুখ কালো করে নিচে নেমে এসে দেখল বাসু চাপাকল থেকে বালতি

ভরে জল এনে পায়খানার দিকে যাচ্ছে। তাকে দেখেই কুঁকড়ে গেল। তারপর করুণ স্বরে বলল, "বউদি আমি আর পাচ্ছি না।"

দুর্বল স্বরে পূর্ণিমা বলল, "সবটা খরচ করিসনি, আমার লাগবে।"

সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ ফিরল বেশ উদ্বেগ নিয়েই। "শুনছি জল নাকি অনেক দিন পাওয়া যাবে না। পাইপ না ভালভ, কি যেন বদলাতে গিয়ে সব ভেঙ্গে পড়েছে, আবার নতুন করে বসাতে হবে।"

পূর্ণিমা ফ্যালফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে। সে আবার বলল, "হোটেলে নোটিশ দিয়েছে এমপ্লয়িরা চান করতে পারবে না। আমি অবশ্য একটা খালি রুমে ঢুকে ম্যানেজ করে নিয়েছি।"

বাসু বলল, "আমাদের একফোঁটা জলও নেই। বউদি খাবার জন্য এক গ্লাস জল চাইতে গেছল, নিচে ওপরে কেউ দিল না, আমি পাশের বাড়ি থেকে দু গ্লাস জল আনলুম, ওরা লোক খুব ভাল।"

বিশ্বনাথ ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে "সে কি!" বলে একঝটকায় দুটো প্লাস্টিকের বালতি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং মিনিট পনেরো পর ফিরে এল খালি বালতি নিয়েই।

"চল তো আমার সঙ্গে ওরা জল নিতে দেবে না। মেয়েছেলে দেখলে হয়ত ছেড়ে দেবে···বেশি দূর তো নয়, বস্তিতে ঢুকে সোজা কুড়ি-পঁচিশ পা এগোলেই টিউবওয়েলটা।"

গলির তিনটি বাঁক ঘুরেই ডান দিকে পড়ে কয়েকটা টালি, টিন আর খোলার চালের দোকান ঘর উল্টোদিকে ডালখোলা। মুদি আর তেলেভাজা দোকানের মাঝে বটগাছের ধার দিয়ে সাত-আট হাত চওড়া কাঁচা রাস্তা বস্তির মধ্যে ঢুকে গেছে। সবে সন্ধ্যে হয়েছে, রাস্তাটার মুখে এবং ভিতরে কর্পোরেশনের আলো জ্বলছে।

তৃতীয় বাঁকের আগে বিশ্বনাথ দাঁড়িয়ে পড়ল। সন্তর্পণে কোণের বাড়ি ঘেঁষে উঁকি দিল। দুটো বাচ্চা ছেলে, একজনের হাতে পেট্রলের টিন আর খয়েরি লুঙ্গি পরা খালি গা, শীর্ণ চেহারার একটি লোক আঙুল তুলে তাদের চলে যেতে বলছে। ধমকের তর্জন দূর থেকে বিশ্বনাথ শুনতে পেল।·এই লোকটিই তাকে ঢুকতে দেয়নি বস্তিতে। বলেছিল, "অনেক হুজ্জুত ঝামেলা করে এই কল আদায় করেছি, তখন তো আপনারা সাপোর্ট দিতে আসেননি···জল-ফল হবে না, অন্য জায়গায় দেখুন।" কয়েকজন স্ত্রীলোক তখন দাঁড়িয়েছিল। একজন বলে ওঠে, "তিনতলা বাড়িতে থাকার সুখ এবার পিছন দিয়ে বেরুবে।"

বাচ্চাদুটো গুটিগুটি ফিরে আসছে। লোকটা লুঙ্গি টেনে তুলে মুদি দোকানের

গায়ে ধাপটায় পা ঝুলিয়ে বসল।

"কি বলল রে তোদের ?"

বিশ্বনাথের দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে যেতে যেতেই একজন জবাব দিল "কিনে খেতে বলল।"

বিশ্বনাথ ইতস্তত করে পূর্ণিমাকে বলল, "তুমি একাই যাও, পারবে তো দু হাতে দুটো বয়ে আনতে ?"

"পারা না পারা নয়, পারতেই হবে।"

পূর্ণিমা বালতি নিয়ে এগোল। তার চলনের মধ্যে গোঁ ফুটে উঠেছে। মুদির দোকান পেরিয়ে বস্তিতে ঢুকতে যাচ্ছে তখন লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, "এই যে যাচ্ছেন কোথায় বালতি হাতে ?...জল ? হবে না।"

না শোনার ভান করে পূর্ণিমা এগিয়ে যাচ্ছিল। লোকটা ধাপ থেকে লাফিয়ে নেমে প্রায় ছুটেই তার সামনে পথ জুড়ে দাঁড়াল। "শুনতে পাননি, কালা নাকি ?"

"একটু জল নেব।"

"অন্য জায়গায় যান, এখানে হবে না।"

"বড্ড দরকার, বাচ্চার খাবার জলটুকুও বাড়িতে নেই।" পূর্ণিমার স্বরে অকৃত্রিম কাকুতি ফুটে উঠল।

"বলে তো দিয়েছি, অন্য জায়গায় যান, কলকাতায় আরো অনেক টিউকল আছে।"

"খাবার মত জল অন্তত নিতে দিন।"

"খাবার, জলপটি দেবার, ছোঁচাবার কোন জলই এখানে মিলবে না।"

পূর্ণিমা গলা নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "পয়সা দেব, এক এক বালতি কত করে নেবেন বলুন ?"

লোকটার পাশে বস্তিরই আরো দুটি মাঝবয়সী লোক ও একটি কিশোরী দাঁড়িয়ে। কিশোরীটি হঠাৎ বলল, "পয়সার গরম দেখাচ্ছেন ?"

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা গলা চড়িয়ে বলে উঠল, "আমরা বস্তিতে থাকি বলে কি ভেবেছেন পয়সা দিয়ে কিনে নেবেন ?"

কৌতূহলে পথচারী দু-তিনজন থমকে গেল। বস্তির ভেতর থেকে কয়েকজন এগিয়ে এল, দোকান থেকে মুখ ঝুঁকে পড়ল।

"কেনাকেনির কথা তো বলিনি, একটু জল চাই শুধু।"

"আপনি পয়সার কথা বলেননি, মিথ্যুক ! ভদ্দরলোকের মেয়ে যদি হন তো বলুন পয়সার কথা বলেননি ?"

"বলেছি, কিন্তু সে তো জল কিনব বলে !"

"একই কথা ।"

"আমাদের বাড়ির কাছেরটা ভেঙে পড়ে আছে আজ বারো-চোদ্দ দিন, আর কোথায়..."

"তাই বলে এখানে পয়সার ফুটুনি মারাতে আসা ? জল কেনার শখ হয়েছে, তিনতলা বাড়িতে ফ্যানের হাওয়া খেয়ে জল তুলতে এসেছেন...যান্ যান্ জলফল হবে না ।"

"কেন হবে না ?"

পূর্ণিমা হঠাৎ কোণঠাসা বেড়ালের মত কুঁজো হয়ে বালতি দুটো ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে তীক্ষ্নস্বরে বলল, "কেন জল পাব না, কলটা কি আপনাদের পৈতৃক সম্পত্তি, মগের মুল্লুক নাকি ? আমি জল নেবই ।"

সামনের দুতিনজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সে বস্তির মধ্যে যাবার জন্য হনহনিয়ে এগোতেই কিশোরীটি ছুটে গিয়ে পিছন থেকে তার আঁচল টেনে ধরল । শরীরের উপর থেকে শাড়িটা খুলে কোমরে টান পড়তেই পূর্ণিমা ঘুরে বালতি দিয়ে মেয়েটির বাহুতে আঘাত করল ।

"ওরে মেজদি, ওরে শেফালি শিগগিরি আয়, আমাকে মারছে রে ।"

মেয়েটি তারস্বরে চিৎকার করে উঠতেই দুপাশ থেকে পাঁচ-ছটি স্ত্রীলোক ছুটে এল । নারী-পুরুষের একটা ভিড় পূর্ণিমাকে ঘিরে । তার মধ্য থেকে এক বিবাহিতা তরুণী বিশ্রী একটা গালি দিয়ে পূর্ণিমার গালে চড় মারল ।

"হারামীর বাচ্চা মারপিট করতে এসেচিস, দাঁড়া তোর বাপের নাম ভোলাচ্ছি ।"

একটি অল্পবয়সী মেয়ে পূর্ণিমার চুল টেনে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল, "হাত ভেঙে দোব, কোতায় খাপ খুলতে এসেচ জান ? চোক উপড়ে লোব ।"

হাত থেকে বালতি দুটো কে ছিনিয়ে নিয়েছে । অপ্রত্যাশিত অকল্পনীয় ঘটনায় পূর্ণিমা বিহ্বল চোখে এধার ওধার তাকিয়ে ভিড় থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতেই তিন চারটে মেয়ে তাকে আটকে রেখে টানতে শুরু করল । ব্লাউজ ছেঁড়ার শব্দ হল । তার ঘাড়ে নখ বসিয়ে মাংস খুবলে তুলতে চাইল একজন । হাঁটু দিয়ে একজন তার তলপেটে আঘাত করল । অন্ধের মত দুহাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে পূর্ণিমা চিৎকার করে উঠল, "ছোটলোক, ছোটলোকের দল । ...আমায় যেতে দাও, যেতে দাও ।"

পুরুষ কণ্ঠে কে বলল, "চোপা কতো ! হাতটা ভেঙে দে না ।"

আর একজন বলল, "ন্যাংটো করে দে মাগীকে, পয়সার গরম তাহলে

কমবে ।”

ঠেলাঠেলির মধ্যে কেউ তার শাড়ি ধরে টেনেছে। পূর্ণিমা দুই মুঠোয় শাড়ি ধরে আর্তনাদ করে উঠল, “খুলো না, পায়ে পড়ি তোমাদের, খুলো না।”

“টান টান, খুলে দে।”

দুটি মেয়ে হ্যাঁচকা টান দিতেই পূর্ণিমা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। শাড়িটা শক্ত করে সে ধরে রেখেছে। সেইভাবেই হাত দশেক তাকে ওরা টেনে নিয়ে গেল। তখন সে হাউ হাউ করে ওঠে, “আমার শাড়ি নিও না, ওগো খুলে নিও না।”

একটি স্থূলকায় বিধবা পূর্ণিমার দুই মুঠির উপর দাঁড়াতেই শাড়িটা তার দখল থেকে বেরিয়ে গেল। মাটিতে মুখ চেপে সে ফোঁপাতে শুরু করল। মিনিট তিনেকের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল, সেই সময় ভিড়ের ফাঁক দিয়ে বিশ্বনাথ উঁকি দিল আর পূর্ণিমাকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার করে উঠল।

“একি একি, অ্যাঁ একি !”

উত্তেজনায় ঠকঠক করে সে কাঁপছে, আর কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরচ্ছে না। শুধু সায়াটা হাঁটুর কাছ থেকে নিচে নামিয়ে দেওয়া ছাড়া তার শরীর আর কোন আবেগ বা প্রতিবাদ প্রকাশ করতে পারল না।

বিশ্বনাথ এতক্ষণ সেই রাস্তার বাঁকেই অপেক্ষা করছিল। পূর্ণিমা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে না আসায় সে ধরে নেয় দুটো বালতি ভরার জন্যই সময় লাগছে। স্বস্তি বোধ হতেই সে সিগারেট কিনল সামনের দোকান থেকে। দড়ির আগুন সিগারেটে যখন লাগাচ্ছে তখন কানে এল—“বস্তিতে একটা মেয়েলোক জল নিতে এসেছে, তাকে ধরে সবাই যা ঝাড় দিচ্ছে না—” শোনামাত্র সে ছুটে গেছে।

“শাড়িটা দিন।”

বিশ্বনাথ ভিড়ের মুখের দিকে তাকাল। শাড়ির জন্য কেউ ব্যস্ততা দেখাল না। বালতিদুটোরও হদিশ নেই। ভিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে যাচ্ছে।

“শাড়িটা ফিরিয়ে দিন।”

বিশ্বনাথ প্রার্থনার মত দু হাত মুঠো করে মেয়েদের দিকে তাকাল।

“শাড়ি না হলে ও যাবে কি করে ?”

“কেন সায়া তো রয়েছে।”

বিভ্রান্ত চোখে বিশ্বনাথ তাকিয়ে রইল মাটিতে উবুড় হয়ে থাকা তার স্ত্রীর দেহের দিকে। নিজের শার্টটা খুলে পূর্ণিমার পিঠের উপর রেখে বলল, “চল বাড়ি যাই।”

পূর্ণিমার ঘাড় আর গাল থেকে রক্ত ঝরছে। ফালাদেওয়া ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে চামড়ায় রক্তের ছড় দেখা যাচ্ছে। চোখের জল আর মাটিতে মুখ লেপা। বিশ্বনাথ রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে দিল। তখনও সে ঠকঠক করে কাঁপছে।

ওরা বাড়ি ফিরে এল। শার্ট আর সায়াপরা পূর্ণিমাকে রাস্তার দুধারের কৌতূহলী চোখ দেখছিল কিন্তু তাই নিয়ে বিব্রত বা লজ্জিত হবার মত বোধক্ষমতা তাদের ছিল না। অপমান, রাগ, দুঃখ কিছুর দ্বারাই ওরা পীড়িত হয়নি। অনুভবহীন, শব্দহীন, শূন্যতার মধ্য দিয়ে দুজনে ফিরে এল।

সেই রাত্রেই কলে জল এল। বালতি বসাবার জন্য যখন হুড়োহুড়ি চলছে পূর্ণিমা তখন বিছানায় কাঁপছে জ্বরের তাড়সে।

দিন দশেক পর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বিশ্বনাথ দেখল রান্নাঘরের প্রায় সিকিভাগ জুড়ে রয়েছে দুটো জালা, যার মধ্যে একটা মানুষ উবু হয়ে থাকতে পারে।

দুপুরে বাজারে গিয়ে কিনে আনলুম। তিরিশ টাকা পড়ল, এক টাকা মুটে। এবার জল জমাব।"

"জলের ক্রাইসিস কি ঘন ঘন হয় যে চাল বা কেরোসিনের মত জমিয়ে রাখবে।"

"যদি দু বছর চার বছর দশ বছর পরও হয় তবুও..." রাগটা যন্ত্রণার চাপে পূর্ণিমার গলায় আটকে গেল। বিশ্বনাথ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

পূর্ণিমা প্রতিদিন এক বালতি করে জল দুটি জালায় ঢালতে লাগল। সকালের প্রথম বালতির এবং বিকালের প্রথম বালতির জল। এ জন্য সংসারে ব্যবহারের জন্য জলের পরিমাণ তাকে কমাতে হল। চায়ের জন্য বাসু একদিন দু বাটি জল জালা থেকে নেওয়ায় চড় খেল। দিনে তিন চারবার সে সরা তুলে দেখে কতটা ভরল।

একদিন জালা দুটি ভরে গেল। পূর্ণিমা দুটি ছোট জালা কিনে বড় দুটির মুখের উপর বসিয়ে দিল।

"এতে ক'দিন চলবে ?" একদিন বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করল। পূর্ণিমা মনে মনে হিসেব করে বলল, "দু সপ্তাহ চলবে শুধু খাওয়া আর রান্নার জন্য, তবে নির্ভর করছে কিভাবে খরচ করবে। বাসন মাজা, কাচাকাচি, ঘরমোছা চলবে না।"

"তোমার টার্গেট কত ?"

"আমার টার্গেট নেই।"

অবশেষে ছোট জালাদুটোও ভরে গেল। রান্নাঘরে আর জায়গা নেই। দালানটা অরক্ষিত। শোবার ঘরে রাখা যায় কিনা, পূর্ণিমা তাই নিয়ে কয়েক দিন

চিন্তা করল। একদিন সে বিশ্বনাথের কাছে জানতে চাইল, "বড় বড় ঘিয়ের টিন কোথায় পাওয়া যায় ?"

"কেন জল রাখবে বলে ? টিনে মরচে পড়ে তো ফুটো হয়ে যাবে।"

ছাদে কয়েকটা ইঁট পড়েছিল। কয়েকটা আঁচলের আড়াল দিয়ে নামিয়ে এনে পূর্ণিমা শোবার খাটটাকে উঁচু করল। এর পর মাটির কলসি কিনে জল ভরে খাটের নিচে রাখতে লাগল।

শুধু জল আর জল রাখার পাত্র ছাড়া পূর্ণিমার আর কিছু কথা বলার নেই। বাড়ির বাইরে গেলে ছটফট করে ফেরার জন্য। তার ভয় জালা বা কলসি যদি কেউ ভেঙে ফেলে। খড়ি দিয়ে ওগুলোর গায়ে কেনার তারিখ লিখে রেখেছে। কোনটি থেকে প্রথম খরচ করবে, তারপর কোনটি, তারপর কোনটি, মনে মনে সে পাত্রগুলিকে সাজিয়ে ফেলেছে। কোন্ কাজের জন্য কোনটি থেকে জল খরচ করবে তাও সে ঠিক করে রেখেছে। দুতিনটি পাত্রের তলা থেকে জল চুঁইয়েছিল। দোকান থেকে পুডিং এনে লাগিয়েছে। কি এক ঘোরের মধ্যে তার দিন এবং রাত কেটে যায় এই জল নিয়ে। এক এক সময় সে বিড়বিড় করে হিসেব করে। বাসুকে বলে, "চানটানের কথাই ওঠে না। হাত ধোয়া আর কুলকুচোর জন্য এক বাটি তার মানে তিনজনের জন্য তিন বাটি, দুবেলায় ছ বাটি। বুবুনের কাঁথা প্রথম দু-তিনদিন রোদে শুকিয়ে নিতে হবে···গন্ধ হবে তো কি আর করা যাবে। বাজারের আনাজ ধোয়ার জন্য এক গামলা···হবে না রে ?"

এখন সে সকালে খবরের কাগজের জন্য অপেক্ষা করে। বিশ্বনাথের হাতে দেবার আগে খুঁটিয়ে দেখে, জল সরবরাহ বন্ধের খবরের জন্য।

বাড়ির সকলে জেনে গেছে তার জল জমানোর ব্যাপারটা। উপরের মাসীমা একদিন এসে তার জলভাণ্ডার দেখে গেল।

"তাকগুলো খালি কেন ? বোতলে ভরে ভরে রেখে দাও।" ঠাট্টা করেই কথাগুলো বলা, কিন্তু পূর্ণিমার কানে সেটা বিচক্ষণ পরামর্শ মনে হল। শিশি-বোতলওলার দোকান থেকে সে দশটি বোতল কিনে জল ভরে তাকে রাখল।

সুপ্রিয়া মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যায়। একদিন বলল, "তুমি তো বাপু ছোটখাট টালার ট্যাঙ্ক করে ফেলেছ। এবার জল বন্ধ হলে তোমার কাছেই হাত পাতব, দেবে তো ? অবশ্য পয়সা দিয়েই নোব।"

'পয়সা' শব্দটা পূর্ণিমার মাথায় ভারি হাতুড়ির মত পড়ল এবং অবশ করে দিল। সারা দিন সে কথা বলল না, থালায় ভাত ফেলে রেখে উঠে পড়ল। অকারণে বারবার তার কান্না পেল।

আশপাশের বাড়িতেও জেনে গেছে। কিছুদিন হাসাহাসি করে তারা ভুলে গেল। প্রতিদিনই কল থেকে জল বেরিয়ে আসছে, পূর্ণিমা তাই দেখে দেখে এখন বিরক্ত। বিশ্বনাথকে বলল, "জল কি আর বন্ধ হবে না ?"

"তোমার তাই নিয়ে ভাবনা করার কি ? তিন চার মাসের মত তো স্টক হয়েই গেছে।"

স্তিমিত ক্লান্ত কণ্ঠে সে বলল, "কাজে না লাগলে জমানোর কোন মানেই হয় না।"

এই কথার দু দিন পরেই ভোরে কাগজ দেখতে দেখতে পূর্ণিমা চিৎকার করে উঠল, "হয়েছে হয়েছে, ওগো শুনছ, ওরে বাসু···সোমবার সকালে জল আসবে না।"

কাগজ হাতে সে ছুটে উঠোনে এল। সুপ্রিয়া কলে মুখ ধুচ্ছে। পূর্ণিমা চেঁচিয়ে প্রায় সারা বাড়িকে শুনিয়ে বলল, "সোমবার সকালে জল আসবে না গো।"

অদ্ভুত এক সুখ পূর্ণিমাকে গ্রাস করেছে। তিন দিন পর সোমবাব। তিনটে দিন সে তীব্রভাবে অপেক্ষা করল। তার ঘর ভরে আছে জলে, সে নিজেও ভরে যাচ্ছে কানায় কানায়। এতদিন ধরে ধিকিধিকি যে দুঃখ তাকে পোড়াচ্ছে এইবার তা নিববে। উদাসীন চোখে সে দেখল অন্যান্যদের ব্যস্ততা, ক্ষোভ, উৎকণ্ঠা, ভাবনা। অলসভাবে সংসারের কাজ করে গেল এবং মাঝে মাঝেই উজ্জ্বল হয়ে মৃদু হাসিতে তার মুখ ভরে যাচ্ছিল। বহুদিন ধরে সে অপেক্ষা করেছে এই দিনটির জন্য।

"জল তুলে রাখবে না বউদি ?"

"দরকার নেই।"

সোমবার সকাল থেকে কলকাতায় কলের জল নেই। বড় জালা থেকে পূর্ণিমা সংসারের জন্য জল ব্যবহার শুরু করল। স্নান বন্ধ, কলাপাতায় খাওয়া, বাসু চাপাকলের জলও আনল। অস্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে কিন্তু সেটা যেন বিরাট নিরুদ্বিগ্নতাকে আরো উপভোগ্য করার জন্য।

বারবার সে জলের পাত্রগুলোর গায়ে হাত বোলাল, বারবার তাকিয়ে দেখল। এইবার সে তৈরি হয়ে রয়েছে।

দুপুর থেকে সে উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাকিয়ে রইল কলের দিকে। জল আসার সময় পেরিয়ে যেতে সে সুখবোধ করল। জল আসেনি। যেন তার মুখ চেয়েই মসৃণভাবে প্রহর গড়িয়ে চলেছে।

"একবেলার জন্য বলেছিল, কথার কোন দাম নেই গো, কত বেলা যে লেগে যাবে জল আসতে তার কি ঠিক আছে ?" সুপ্রিয়া সন্ধ্যার সময় সদরে ধুনো দিতে

এসে বিমর্ষ কণ্ঠে পূর্ণিমাকে বলল। "তোমার আর কি, ঘরে টালার ট্যাঙ্ক নিয়ে দিব্যি তো কাটিয়ে যাবে।"

রাত্রে সে বিশ্বনাথকে বলল, "তোমার কি মনে হয় এবার কত দিন চলবে ?"

বিশ্বনাথ "দুচার দিনের বেশি নয়" বলায় পূর্ণিমা ক্ষুব্ধ হল। পাশ ফিরতে ফিরতে সে শুধু বলল, "দেখা যাক।"

মঙ্গলবার সকালে ঘুম ভাঙার পর আধা-জাগরণ, আধা-অচেতন অবস্থায় পূর্ণিমা ক্ষীণভাবে একটানা একটা শব্দ শুনতে পেল। শব্দটা ক্রমশ বেড়ে উঠতে উঠতে তার মাথার মধ্যে ঝমঝম কড়া নাড়ার মত আওয়াজ করে উঠল। ধড়মড়িয়ে সে উঠে বসল।

কলে জল এসে গেছে।

"বাব্বাঃ বাঁচালে···ধরেই রেখেছিলুম এবারও ভোগাবে।"

"তবু কিছুটা কথা রেখেছে···ওরে নিমাই বালতিটা নিয়ে এবার নাম বাবা।"

পূর্ণিমা পাথরেব মত বিছানায় বসে রইল। ঘরের বাইরের পৃথিবীটা প্রতিদিনের মত স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু তার নিজের জগৎ চুরমার হয়ে ভেঙে ভেঙে পড়েছে।

ঘরের দরজা খুলে সে বাইরে এল। ভরা বালতি হাতে নিমাই দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে, সুপ্রিয়া উবু হয়ে উনুন সাজাচ্ছে, কলে বালতি পেতে মিনু ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে, দোতলা থেকে বাড়িওলার জিবছোলার শব্দ আসছে। পূর্ণিমার মনে হল তার অভ্যস্ত এই দৃশ্য থেকে সে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। এখন যেন সে ছেঁড়া ব্লাউজের উপর শার্ট আর সায়া পরে সারা মুখে মাটিলেপা অবস্থায় অনুভবহীন শূন্যতার মধ্যে। এইভাবেই কি তাকে দিনযাপন করতে হবে?

পূর্ণিমা দ্রুত সবে এল। ওরা তাকে দেখতে পায়নি। রান্নাঘরে ঢুকে সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দিল। বাটনাবাটার নোড়া দিয়ে ঠুকে ঠুকে জালার তলায় ঘা দিতেই ফুটো থেকে ছিটকে জল বেরিয়ে তার পা ভিজিয়ে দিল।

ঘরের নর্দমাব মুখে জলের ঘূর্ণি আর বকবক শব্দটা তাকে অসম্ভব অবাক করে দিল।

মুক্তো

গাড়িটা যে এইভাবে পথে বসাবে, চন্দন মিত্র তা ভাবতে পারেনি।

ভোরে দীঘা থেকে রওনা হয়ে খড়্গপুর পর্যন্ত মসৃণভাবে এসেছে। ব্রততী আর এক বছরের বাবলুকে জামশেদপুরের ট্রেনে তুলে দিয়েছে চন্দন। ব্রততী যাবে বড়দিদির কাছে, থাকবে দিন পনেরো। দীঘায় ওরা দুদিন ছিল চন্দনের এক অনুরাগীর বাড়িতে।

পুরনো স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ড। চন্দন ছ' হাজার টাকায় কিনেছে চার মাস আগে। গাড়ি চালানোটা শিখবে শিখবে করেও এখনও শেখা হয়নি। ড্রাইভার রেখেছে। মাসে তিনশো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, এটা ওর গায়ে লাগে। কেমন একটা ভয় ওর আছে, নিজে গাড়ি চালালে অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলবে।

চার বছর আগে জ্যোতিষী কোষ্ঠীবিচার করে, যা যা বলেছিল তার অধিকাংশই মিলে গেছে। যেমন বিদেশে ভ্রমণ, যশ-খ্যাতি, আর্থিক সাফল্য, বিয়ে, চাকুরি—সবই প্রায়। এশিয়ান গেমস খেলতে ব্যাঙ্কক, তেহরান, ইণ্ডিয়া টিমের সঙ্গে হংকং, সিওল, নাইরোবি, সিঙ্গাপুর, কাবুল, কলম্বো, রেঙ্গুন। মারডেকা খেলতে দুবার কুয়ালালমপুরে। যশ ও খ্যাতি ব্যাপারটা কেমন চন্দন সেটা ঠিক বুঝতে পারে না। সে শুধু লক্ষ্য করেছে বাড়ির বাইরে মানুষজন তাকে দেখলেই তাকায়, মেয়েরা ফিসফাস করে। গাড়িওলা লোকেরা তাকে দেখে গাড়ি থামিয়ে লিফট দিতে চায়, অপরিচিতরা বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে, ফুটবল ফাইনালে পুরস্কার বিতরণ ও দুচার কথা বলার জন্য প্রায়ই ডাক আসে। তার নামে খবরের কাগজে হেডিং হয়; 'চন্দনের সৌরভ' বা 'সুরজিত চন্দন' জাতীয় বিশেষণ তাব খেলার দক্ষতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। একবার ট্যাক্সিতে যাবার সময় কানে এসেছিল, "ভগবানের ছেলে যাচ্ছেরে।" তার ক'দিন আগেই শীল্ড ফাইনালে, যুগের যাত্রী জিতেছিল তার দেওয়া একমাত্র গোলে। এ সব ব্যাপার যদি যশ বা খ্যাতি হয় তাহলে চন্দন যশস্বী এবং খ্যাতিমান।

আর্থিক সাফল্য অবশ্যই চন্দন পেয়েছে। কোন ক্রমে স্কুল ফাইনাল পাস। ক্লাবই ব্যাঙ্কে চাকরি করে দিয়েছে। এখন পাচ্ছে প্রায় আঠারোশো। জ্যোতিষী

বলেছিল গোমেদ আর পোখরাজ ধারণ করতে, করেছে। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার তার দর উঠেছিল। সে বছরই। এখন সে ফ্ল্যাটের মালিক, বেনামীতে একটি ওষুধের দোকান করেছে, পঞ্চাশ হাজার টাকা খাটছে সুদে এবং সম্প্রতি এই গাড়িটি।

জ্যোতিষী বলেছিল, সুন্দরী বৌ পাবে, বত্তু অর্থাৎ ব্রততী প্রকৃত সুন্দরীই। চন্দনের ভক্ত এক ফিল্ম ডিরেক্টর ব্রততীর জন্য কিছুদিন ধর্নাও দিয়েছিল। ফিল্মে নামাটা চন্দনের পছন্দ নয়। বত্তু তাকে ভালবাসে এবং সে বত্তুকে। বত্তু চায় চন্দন স্মার্ট লোকদের মত নিজেই গাড়ি চালাক। কিন্তু জ্যোতিষী বলেছিল ত্রিশ বছরের পর ফাঁড়া আছে, একটা মুক্তো ধারণ করলে হয়। তখন বয়স ছিল সাতাশ। ত্রিশ হোক তো,এই ভেবে মুক্তো আর ধারণ করা হয়নি, আজও হয়নি।

গাড়িটা কিনেই তার মনে পড়েছিল ফাঁড়ার কথাটা। শরীর ছমছম করে উঠেছিল। গোল এরিয়ার মধ্যে হিংস্রতম ডিফেণ্ডরদের মোকাবিলায় যে কখনও ভয় পায়নি সেই চন্দন মিত্র গোপনে ভয় পায় অ্যাকসিডেন্টকে। হাত পা বিচ্ছিন্ন ধড়, গুঁড়িয়ে যাওয়া পাঁজর, তালগোল পাকিয়ে চটকানো দেহ—নিজের এইরকম একটা চেহারা যখনই তার চোখে ভেসে ওঠে তখন কিছুক্ষণের জন্য সে বিমর্ষ বোধ করে। গাড়িতে দীঘা রওনা হবার সময় ড্রাইভার ত্রিপিত সিংকে বারবার নির্দেশ দিয়েছিল,—ত্রিশ মাইলের বেশি জোরে যাবে না, অন্য গাড়ির সঙ্গে রেস দেবে না, ওভারটেক করবে না, ট্রাক-বাস-লরি সামনে পড়লেই বাঁয়ে সরে যাবে।

এই সব বলার পর তার মনে হয়েছিল বয়সটা বোধহয় সত্যিই বেড়েছে। খেলার দিন যে ফুরিয়ে আসছে, তাতে এবারই বোঝা গেল। তন্ময়, বাসব, প্রদীপকে ট্রান্সফারের দশদিন আগে তুলে রেখেছিল, কিন্তু তাকে ছেড়ে রাখে। এক ধাক্কায় দশ হাজার টাকা এবার কমে গেছে।

বোম্বাই রোডের উপর, অচল গাড়িটার দিকে তাকিয়ে চন্দন ভাবল, বয়স বাড়ছে। দু-এক বছরের মধ্যেই টিম তাকে খারিজ করে দেবেই। আয় কমে যাবে। গাড়িটা কেনার কি কোন দরকার ছিল ? দশ বছর আগেও তো ট্রাম আর বাস ছিল তার সম্বল। তারও আগে আধপেটা দিন আর এখানে ওখানে খেপ খেলা।

ত্রিপিত সিং খড়্গপুরে ফিরে গেছে ডিস্ট্রিবিউটর বক্সটা সঙ্গে নিয়ে। গোলমাল ওটাতেই ঘটেছে। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে চন্দন খড়্গপুরগামী একটা ট্রাককে হাত তুলে থামতে বলেছিল। অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে যায়। তার পিছনে একটা প্রাইভেট মোটর ছিল। আপনা থেকেই সেটা থামে। দরজা খুলে দিয়ে পিছনে বসা লোকটি বলেছিল, "আসুন।"

চন্দন ঈষৎ গর্ব বোধ করেছিল। কিন্তু ত্রিপিত ছাড়া ব্যাপারটা দেখার জন্য আর কেউ ছিল না। গত বছরও দুটো পত্রিকা তাকে নিয়ে কভার স্টোরি করেছে। লীগ এখন মাঝামাঝি, ইতিমধ্যে তিনবার তার ছবি বেরিয়েছে। কয়েক লক্ষ লোক তার মুখ চেনে। শুধুমাত্র তাকে দেখেই গাড়ি থামে, এখনও থামে। দব পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও। বাঙালিরা সত্যিই ফুটবল ভালবাসে।

ওই গাড়িতে ত্রিপিত গেছে খড়্গপুর। ফিরতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে। মনে হয়, ঘণ্টা দুই। গাড়ি পাহারা দেবার জন্য চন্দন রয়ে গেল: কিছুক্ষণ গাড়িব মধ্যে বসে থাকার পর বিরক্ত হয়ে নেমে, দরজা লক্ করে, সে পায়চারি শুরু করল।

রাস্তাটা এখানে, পাশাপাশি ছটা লরি যেতে পাবে, এমন চওড়া। দুধারেই ক্ষেত, পাটেব আব ধানের। প্রচণ্ড গরমের পর বৃষ্টি হয়ে গেছে দু' সপ্তাহ আগে। কাল রাতেও হয়েছে। দূরে জমিতে লাঙ্গল দিচ্ছে এক চাষী। চন্দন অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে, চায়ের জন্য তৃষ্ণা বোধ করল।

বোম্বাই রোড থেকে সরু সরু মাটির পথ বেরিয়ে গ্রামের দিকে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে সে ওইরকম এক পথের মুখে এসে পড়ল। কয়েকটা চালাঘরের দোকান। তার পাশে পাঁচিল ঘেরা এক কারখানা। গোটা তিনেক একতলা কোয়ার্টার্স। একটা গ্রামেরও আভাস পাওয়া যায় গাছপালার আড়ালে।

কামারের দোকানের পাশে সাইকেল সারাই-এর দোকান, তার পরেরটি চায়ের। দোকানের বাইরে বাঁশের বেঞ্চে দুটি লোক বসেছিল সুটকেস আর থলি নিয়ে। বোধহয় এখানে বাস থামে। চন্দন তাদের পাশে বসল। হাতঘড়িতে সময় দেখল সাড়ে দশটা।

দোকানটির শীর্ণ এবং জীর্ণ দশার মত দোকানীটিও। শাড়িটাব রঙ একদা লাল ছিল বোঝা যায়। যেমন বোঝা যায় ওর গায়ের রং একদা গৌর ছিল। হয়ত দেহেও লাবণ্য ছিল এবং তারুণ্যও। এখন দু'চোখে খিটখিটে উত্তাপ এবং পাণ্ডুর মুখ। একটি বছব দশ বয়সের ছেলে কয়লা ভাঙ্গছে।

"চা হবে?"

চন্দন গলাটা চড়িয়েই বলল।

"হবে।"

বিস্কুট, চানাচুর, কেক ছাড়াও পাউরুটি এবং বাতাসাও আছে। পান, বিড়ি, সিগারেটও একপাশে। সবকিছুই কম দামী, দেখে মনে হয় এদের অনেকগুলিই দীর্ঘকাল পড়ে রয়েছে।

এই মেয়েটি বা বউটিই তাহলে মালিক। এই তো দোকানের অবস্থা চলে কি

করে ? স্বামী হয়ত কোথাও কাজটাজ করে। এইসব ভাবতে ভাবতে চন্দন চারধারে চোখ বুলিয়ে, মেদিনীপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে যথেষ্ট রকমের মনজুড়ানো কিছু না পেয়ে আবার দোকানের দিকে তাকাল। তার মোটরটাকে সে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে।

দোকানে ছ্যাঁচা বেড়ায় একটা ফ্রেমে বাঁধান ছবি আটকান। চন্দন অলস চোখে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আন্দাজ করার চেষ্টা করল, ছবিটা কিসের। ছবি যতটা বিবর্ণ তার থেকেও অপরিচ্ছন্ন কাচটা। ঠাওর করতে না পেরে, কৌতূহলবশেই সে উঠে ছবির কাছে এল।

স্ত্রীলোকটি চা তৈরি করতে করতে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল। প্রায় উলঙ্গ ছেলেটি পিট পিট করে তাকিয়ে। বেঞ্চে বসা লোকদুটি উঠেছে, বোধহয় বাস আসছে।

মলিন কাচের পিছনে, চন্দন ক্রমশ বুঝতে পারল, একটা ফুটবল টীম। আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে সে যা আবিষ্কার করল, তাতে চমকে ওঠারই কথা—আই এফ এ-র সাতচল্লিশ সালের টিম, যা বর্মা, সিঙ্গাপুর সফর করেছিল।

"এ ছবি এখানে কে টাঙালো ?"

চন্দন স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করেই বলল।

"ওর বাবা।"

ছেলেটিকে মুখ তুলে দেখিয়ে দিল। ওর মুখের ভঙ্গির মত কণ্ঠস্বরও কর্কশ।

ছবিটা যুগের যাত্রীর টেন্টেও টাঙ্গানো আছে। যাত্রীর চারজন এই টীমে ছিল। তাদের নামগুলো চন্দন জানে।

"খুব বুঝি ফুটবল ভালবাস ?"

জবাব এল না। স্ত্রীলোকটির বদলে ছেলেটি বলল, "বাবার ছবি আছে ওটায়।"

"ভাঁড়ে না গেলাসে ?"

স্ত্রীলোকটি বিরক্ত মুখে তাকিয়ে।

"ভাঁড়ে।"

চন্দন কৌতূহলভরে এবার ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, "কোথায় তোমার বাবা ?"

ও এগিয়ে এসে, মাটিতে বসা চারজনের মধ্যে একজনেব মুখে আঙুল রাখল।

শির্বকৃষ্ণন।

চন্দন ফ্যালফ্যাল করে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থেকে আবার ছবির দিকে মুখ

ফেরাল।

যুগের যাত্রীরই শিবকৃষ্ণন। ডাকসাইটে লেফট-ইন। ওর আমলে সব থেকে পপুলার প্লেয়ার। হায়দরাবাদের কোন এক গ্রাম থেকে বাচ্চা বয়সে কলকাতায় এসে কালীঘাট স্পোর্টিং ইউনিয়ন ঘুরে দু'বছর ইস্টবেঙ্গলে খেলে যুগের যাত্রীতে আসে। যখন ও খেলা ছাড়ে তখন চন্দনের বয়স বছর চারেক। প্রবীণরা যখন পুরনো আমলের কথা বলে, তখন শিবকৃষ্ণনের নাম অবধারিত ভাবেই ওঠে।

থ্রু পাস দেবার নাকি মাস্টার ছিল। ধীর শান্তভাবে খেলত। হেডিং বা শুটিং তেমন ছিল না। খালি পায়েই খেলে গেছে। পায়ে আঠার মত বল লাগিয়ে রাখত, জনাতিনেককে অবহেলায় কাটাতে পারত। "শিবের মত ইনসাইড আজ কলকাতার মাঠে নেই। এখন সামনে প্লেয়ার পড়লে কাটিয়ে বেরতে কজন পারে? মনে আছে, কে ও এস বি-র হেণ্ডারসনকে ছ'বার কি রকম কাটিয়েছিল।"

সবাই একসঙ্গে মাথা নাড়াবে। শিবের বল হোল্ড করে রাখা নাকি দেখার ছিল। "নষ্ট হল নেশা করে। গাঁজা, ভাং, চরস কিছুই বাদ ছিল না। এখনকার মত পয়সা তো সে আমলে পেত না। তবু বিশ-পঁচিশ যা পেত, উড়িয়ে দিত। আহা, কি বল ছাড়ত।"

সবাই একসঙ্গে মাথা নাড়াবে। শিবের গান অনেকবার চন্দন শুনেছে। প্রথম দিকে বিস্মিত হত, পরের দিকে বিরক্ত। বুড়োদের কাছে যা কিছু ভাল, সবই পুরনো আমলের। তখন নাকি প্লেয়াররা আদা ছোলা চিবিয়ে ক্লাবের জন্য জান দিয়ে দিত, টাকা পাওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারত না; তখনকার প্লেয়াররা নাকি ভদ্রতায় বিনয়ে মাখনের মত ছিল। "আজ যে যুগের যাত্রী দেখছ, এত টাকা, এত ট্রফি, এসবের শুরু ওই আমল থেকে। ওরাই ক্লাবকে প্রথম সাকসেস এনে দেয়, রোভার্সে, ডুরাণ্ডে ফাইনালে সেমি-ফাইনালে ক্লাবকে তোলে, যাত্রীকে পপুলার করে, অল ইণ্ডিয়া নাম হয়।"

সবাই একসঙ্গে মাথা নাড়াবে। এসব কথা চন্দন মানে। বহু জায়গায় বক্তৃতায় সে ছোটদের উপদেশও দিয়েছে—বড়দের শ্রদ্ধা করবে, অতীতকে ভুলবে না। নিজেও সে অতীতের নামী ফুটবলার দেখলেই প্রণাম করে পায়ে হাত দিয়ে। তারপর দেখে চারপাশের লোক সপ্রশংসচোখে তার দিকে তাকিয়ে, তখন নিজেকে খানিকটা লম্বা মনে হয়।

"শিবকৃষ্ণন তোমার বাবা?"

চন্দনের কণ্ঠে পরিষ্কার অবিশ্বাস। ছেলেটি লাজুক চোখে স্ত্রীলোকটির দিকে তাকায়।

"হ্যাঁ।"

ভাঁড়টা এগিয়ে ধরে বলল। চন্দন সেটা নিতে নিতে বলল, "আপনি ?"

"বউ।"

"উনিই তো যুগের যাত্রীর শিবকৃষ্ণন ?"

"কি জানি।"

"কি জানি !"

চন্দনের বিস্মিত প্রতিধ্বনিতে ভ্রূ কুঁচকে স্ত্রীলোকটি তাকাল।

"উনি তো ফুটবল খেলতেন ?"

"হবে। আমি ওসব কিছু জানি না।"

"উনি কোথায় ?"

"ঘরে।"

"কিছু করছেন কি, মানে ব্যস্ত ? দেখা হতে পারে ?"

"করবে আবার কি, যা করার সেতো আমিই করি। দিনরাত তো বিছানাতেই পড়ে থাকে।"

"কিছু হয়েছে কি ওনার ?"

"মাথায় যন্ত্রণা, হাঁটুতে ব্যথা, বুকে হাঁপানি, সর্দি কাশি—আপনি কি ওর চেনা ? হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিতে পারেন ?"

"চেষ্টা করতে পারি।"

শিবকৃষ্ণনের বউ চন্দনের মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে ছেলেকে বলল, "আমি এখন দোকান ছেড়ে যেতে পারব না, তুই সঙ্গে করে নিয়ে যা।"

ছেলেটির সঙ্গে চন্দন কয়েক পা এগোতেই ডাক পড়ল, "চায়ের পয়সাটা দিয়ে যান।"

দাম চুকিয়ে সে রওনা হল, গাড়িটা খারাপ হওয়া এখন তার কাছে 'শাপে বর' মনে হচ্ছে। কলকাতায় ফিরে সবাইকে চমকে দেবে।

শিবকৃষ্ণনকে সে খুঁজে বার করেছে, কথা বলেছে। সবাই তো ধরেই নিয়েছে, ও মারা গেছে।

জ্যান্ত শিবকৃষ্ণনকে দেখে আসার গল্প করলে সবার আগে দৌড়ে আসবে তো খবরের কাগজের, ম্যাগাজিনের লোকেরা।

অল্প দূরেই ছোট্ট একটা কুঁড়ে। একখানিই ঘর। দরজায় দাঁড়িয়ে চন্দন ভিতরে তাকাল। দেয়ালে এক হাত গর্ত, এটাই ঘরের জানালা। ওর মনে হল নিচু তক্তাপোশে একটা লোক শুয়ে। ঘরে আসবাব কিছুই নেই। গোটা দুই

অ্যালুমিনিয়াম থালা আর একটা মগ মেঝেয় উপুড় করা। একটা মাটির হাঁড়ি, জলের কলসি, আর কয়েকটা শিশি। তক্তাপোশের নিচে টিনের সুটকেস, একজোড়া পুরনো চটি। দেয়ালে দড়িতে ঝুলছে কাপড়চোপড়। কুলুঙ্গিতে কয়েকটা কৌটো আর বিঘৎখানেকের আয়না।

লোকটি অর্থাৎ শিবকৃষ্ণন, যে কলকাতা বা ভারতের ফুটবল মাঠে সাতাশ বছর আগে 'শিব' নামে খ্যাত ছিল—পাশ ফিরে শুয়ে। পরনে জীর্ণ লুঙ্গিমাত্র।

ছেলেটি পিঠে ধাক্কা দিতেই চিত হয়ে মুখ ফেরাল।

"আমি কলকাতা থেকে এসেছি। গাড়িটা খারাপ হয়ে বন্ধ হতে চা খাবার জন্য দোকানে বসি। ছবিটা দেখে ভাবলুম দেখেই যাই মানুষটাকে, এত গল্প শুনেছি আপনার সম্পর্কে।"

শিব উঠে বসল। ছবির লোকটির সঙ্গে চেহারার কোন মিল নেই। কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফে গালের গর্ত ঢাকা, হাতদুটো লাঠির মত সরু, বুকের প্রায় সব পাঁজরই গোনা যায়। শুধু মাথাটার আকৃতি থেকে অনুমান করা যায় এই লোকই শিবকৃষ্ণন। দেহের সঙ্গে বেমানান আকারের বেঢপ মাথাটা, কপাল মাত্রাতিরিক্ত চওড়া। অথচ হেডিং নাকি খুবই বাজে ছিল।

"আমার বিষয়ে গল্পই শুনেছেন, নিশ্চয় খেলা দেখেননি। বয়স কত ?"

দুর্বল কণ্ঠস্বর। প্রায় চল্লিশ বছর বাংলায় বাস করে নিখুঁত বাংলা উচ্চারণ।

"না, দেখিনি, ঐ ছবিটা যখনকার তখনও আমি জন্মাইনি। আপনার কি অসুখ ? সিরিয়াস কিছু কি ?"

"না না, অসুখটসুখ কিছু নেই। এ রকম শরীর খারাপ ফুটবলারদের তো হয়ই। বল নিয়ে আধঘণ্টা মাঠে এধার ওধার করলেই ঠিক হয়ে যায়।"

"আপনি কি এখনও মাঠে নামেন নাকি ?"

চন্দন অবাক হবে কিনা বুঝতে পারছে না। এই শরীর, এই বয়স—বলে কী!

"মাঠে নামব যে, মাঠ কোথায়, বল কোথায় ?" একটু হেসে বলল, "বয়স কোথায় হেলথ্ কোথায় ? আসলে আমার মনে হয়, ফুটবলারের শরীরের অসুখ সারতে পারে শুধু খেলে, বল খেলে। দাঁড়িয়ে কেন বসুন বসুন।"

তক্তার তলা থেকে ছেলেটা একটা রবারের বল বার করে পা দিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। দূর থেকে ওর মায়ের চিৎকার শুনেই বলটা ফেলে রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল।

"বউ আমার বাঙালি, এখানকারই মেয়ে। কলকাতায় হোটেলে কাজ করত, আমিও করতুম, তখন পরিচয় হয়। আমার জন্য অনেক করেছে, এখনও করে।"

"আপনার এই অবস্থা—ফুটবলারদের সাহায্যটাহায্য, পেনসন এসব এখন তো দেওয়া হচ্ছে, অ্যাপ্লাই করুন না।"

যেভাবে তাকিয়ে আছে চন্দনের মনে হল না তাতে অভিমান রয়েছে। অথচ বুড়োরাই তো বেশি অভিমানী হয়।

"টাকার তো সব সময়ই দরকার।"

"আমি তাহলে ফুটবল খেললাম কেন, অন্য কিছু করে টাকা রোজগার করতে পারতাম তো। খেলে তো টাকা পেতাম না।"

চন্দন অস্বস্তি বোধ করল। সত্যিই তো, এরা তাহলে কিসের জন্য খেলত ? হাততালির জন্য! এইটুকু ছাড়া আর কি ?

"আপনি কোনো খেলাটেলা করেন ?"

চন্দন বলতে যাচ্ছিল, আপনার ক্লাবেই এখনও আমি 'স্টার' গণ্য হই। কিন্তু বলতে গিয়ে, গলাটা কে যেন চেপে ধরল। কোনক্রমে বলল, "একটুআধটু ফুটবলই।"

"অ।"

শরীরে রোগ নেই, আর্থিক কষ্ট নেই, ভালই আছি,—চন্দনের মনে হল এই বুড়োটা একটু যেন হাম্বড়া ধরনের।

"আপনি খেলাটেলা দেখেন ?"

"বছর পাঁচেক আগে খড়্গপুরে একটা ম্যাচ দেখেছি, তাও ষোল বছর বাদে।"

পাঁচ বছর আগে চন্দন খড়্গপুরে একটা একজিবিসন ম্যাচ খেলে গেছে। দেড়শো টাকা নিয়েছিল। সেই ম্যাচটাই কি ?

"কি মনে হল, এখনকার প্লেয়ারদের।"

চুপ করে রইল।

"আপনাদের সময়ে আর এখনকার সময়ের খেলায় অনেক বদল হয়ে গেছে।"

"কিন্তু স্কিল, সেন্স, সুটিং এসব ?"

এবার চন্দন চুপ করে রইল।

"আমার খালি রসিদের, সোমানার, মেওয়ার, আপ্পার কথা মনে পড়ছিল।"

এবার চন্দন আড়চোখে ঘড়ি দেখল। প্রায় দু ঘণ্টা কেটেছে, ত্রিপিতের ফেরার সময় হল। দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করবে। কাল ম্যাচ পোর্টের সঙ্গে। ইজি ব্যাপার, তাহলেও তাড়াতাড়ি ফিরে রেস্ট নিতে হবে। তিনটে দিন খুবই ধকলে কেটেছে।

"যে সব গোল মিস করছিল..."

হঠাৎ চন্দনের ইচ্ছে হল এই লোকটিকে কষ্ট দিতে। এই নাক সিঁটকানো ভাবটা সে অনেক দেখেছে। ঈর্ষা ছাড়া আর কিছু নয়।

"জানেন কি এখন ফুটবলাররা কেমন টাকা পায়?"

"না, কাগজ পড়তে পারি না, লেখাপড়া করিনি।"

"চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট হাজারও।"

"আমি একবার দুশো টাকা পেয়েছি মোহনবাগানকে গোল দিয়ে। বকাইবাবু দিয়েছিল খুশি হয়ে। কমল ওইরকম বল না দিলে গোলটা পেতাম না। ওকে একশো দিয়েছিলাম।"

"এখনকার অনেক প্লেয়ারেরই গাড়ি আছে, অনেকেই বাড়ি করেছে, দোকান ব্যবসা ফেঁদেছে, হাজার হাজার টাকা জমিয়েছে।"

কথাগুলো যেন ওর কানে ঢুকল না। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগের কোন একটা দিনে ফিরে গিয়ে ও বোধহয় সেই গোলটা দেখতে পাচ্ছে। মুখে হাসি ফুটে উঠেছে।

"আমার হেডিং নাকি খারাপ অথচ গোলটা পেয়েছিলাম হেড করে। বাজে কথা রটান হয়েছিল আমার সম্পর্কে। জীবনে অনেক গোলই আমি হেড করে দিয়েছি।"

তক্তাপোশ থেকে নেমে রবারের বলটা কুড়িয়ে নিয়ে চন্দনকে দিল। হাত ধরে ওকে ঘরের বাইরে আনল।

"এটা ছুঁড়ুন। আপনাকে দেখাচ্ছি কিভাবে গোলটা করেছি, ছুঁড়ুন।"

চন্দন বিব্রত হয়ে, কিছুটা মজাও পেয়ে বলটা আলতো করে ওর মাথার উপর তুলে দিল। হাত মুঠো করে, অল্প কুঁজো হয়ে ও তৈরি।

বলটা ওর কাঁধের উপর পড়ল। ফস্কে গেছে। চন্দন কুড়িয়ে নিয়ে এবার আরো আলতো আরো উঁচু করে তুলে দিল।

মুখ তুলে অপেক্ষা করছে শিবকৃষ্ণন। বলটা যখন মাথার কাছাকাছি তখন বাঁ ধারে হেড করার জন্য মাথা ঝাঁকাল। ওর থুতনির উপর পড়ল।

অপ্রতিভ হয়ে শিবকৃষ্ণন বলটার দিকে তাকিয়ে রইল মুখ নিচু করে।

"আবার দিন।"

চন্দন আরো তিনবার বল শূন্যে ছুঁড়ল। তিনবারই ও ফস্কাল।

"থাক।"

"না না, আমি পারব, আপনি আবার ছুঁড়ুন।"

দূর থেকে পর পর দু'বার মোটরের হর্ন ভেসে এল। ত্রিপিত নিশ্চয়।

"থাক, আপনার শরীর খারাপ।"

"আর একবার, শুধু একবার।"

বৃদ্ধ যেন ভিক্ষা চাইছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল চন্দনের।

"এই শেষবার।"

শিবকৃষ্ণন অপেক্ষা করছে। চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়, ঘাড় এবং বাহুর শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। উজ্জ্বল ঝকঝকে রোদ। পি নে শাখাপ্রশাখা মেলা বিরাট এক বটগাছ। তার পিছনে বিস্তৃত ক্ষেত। কচি ধানের চারা। লাঙ্গল দিচ্ছে চাষী। ডানদিকে একটা ডোবা। কলা গাছ। দূর থেকে ভেসে এল ইলেকট্রিক ট্রেনের ভেঁপু। এইসবের মধ্যে এককালের ফুটবলার, প্রায় অসমর্থ, পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগের যৌবনে ফিরে যাবার জন্য জেদ ধরে দাঁড়িয়ে। জীবনে শেষবারের মত ও একটা হেডিং দেখাতে চায়।

যদি এবারও ফস্কায়? দূরে অধৈর্যভাবে হর্ন বাজল।

এবারও যদি ফস্কায়, তাহলে বৃদ্ধ চুরমার হয়ে যাবে। বরং থাক। ওর হেড করা দেখে কোন লাভ নেই। চন্দন বলটা মাটিতে ফেলে দিল।

"কি হল?"

"না। আমার সময় নেই, ড্রাইভার তাড়া দিচ্ছে।"

"শুধু একবার, এই শেষ।"

চন্দন হাঁটতে শুরু করেছে। ওর পিছনে পিছনে আসছে শিবকৃষ্ণন।

"কতটুকু সময় আর লাগবে, একবার···হেড করতে পারি কি না পারি দেখাব। কলকাতায় গিয়ে আপনি বলবেন, শিবের হেডিং দেখেছি, হ্যাঁ ষাট বছরের শিবের···একটুখানি, একমিনিটও লাগবে না···"

চন্দন হাঁটার বেগ বাড়িয়ে দিল। বৃদ্ধ ওর সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বোম্বাই রোডে পা দিয়ে চন্দন একবার পিছনে তাকায়। বিরাট মাঠ, বিরাট বটগাছের পটভূমিতে জীবনের কিনারায় পৌঁছানো ক্ষীণ চেহারার একটা মানুষকে সে দেখতে পেল।

একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটল না। চন্দন তখনি ঠিক করল, জ্যোতিষীর কথামত কালই মুক্তোর আংটি গড়াতে দেবে।

কপিল নাচছে

"আমি তো একা নই। হাজার হাজার লোকের···কারুর পাঁচ, কারুর পঞ্চাশ হাজার, কারুর পাঁচ লাখ। রণেনবাবু রিটায়ার করে যা পেয়েছিল, সারা জীবনের সঞ্চয় নব্বুই হাজার ওখানে রেখেছিল, সব গেছে। আমি তো সেই তুলনায় ভাগ্যবান, ষাট হাজার মাত্র।"

"একমাস ধরে অনবরত এই শুনছি আর ভাল লাগে না হাজার হাজারের কথা শুনতে। সর্বনাশের মধ্যে এখন আমরা নিজেরাই।"

তিনতলার বারান্দায় রবিবারের বিকেলে স্বামী-স্ত্রী অরুণ এবং বাণী রেলিংয়ে কনুই রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। ওদের দেখলে মনে হবে সফল জীবনকে তাদের সামনে স্থির বা ধাবমান প্রকৃতির মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে তা ফিরিয়ে নেবার জন্য প্রশান্ত আলস্যে যেন অপেক্ষা করছে।

চল্লিশ ফ্ল্যাটের সমবায় আবাসন সোসায়েটির চারতলা এই বাড়ির নাম 'বসবাস'। বাড়ির সামনের রাস্তা পার হলেই পাঁচিল ঘেরা পার্ক। পার্কের তিনদিকে খণ্ড খণ্ড বসত জমি কয়েকটিতে বাড়ি হয়েছে, কয়েকটিতে হচ্ছে। তারপরই ধূ-ধূ শূন্যতা। দূরে ছাইরঙের সদ্য সমাপ্ত অতিকায় এক বাড়ি, কোন সরকারী দপ্তর হয়ত বসবে। আরো দূরে ছড়ান গাছের আড়ালে গ্রামের আভাস দিচ্ছে কয়েকটি খড়ের চালা। তাতে লতানো গাছ, হয়ত লাউ বা চালকুমড়োর। পার্কের ডাইনে একটা ঝিলের কিছুটা অংশ দেখা যায়, কিন্তু দেখা যাবে না বাড়ি উঠলে। সকালে রোদ পড়লে ঝিলটা আয়নার মত ঝলসায়। বিরাট কিছু গাছ ঝিলের ধার ঘেঁষে। তার কিছু ফুলের। হলুদ আর লাল এ পর্যন্ত দেখা গেছে। বাতাসে কাঁপানো পাতার ফাঁক দিয়ে রাস্তার বা বাড়ির আলো মিটমিট করে জোনাকির মত। মেয়ে এবং পুরুষরা ঝিলে দুপুরে স্নান করে।

পার্কেও গাছ রয়েছে। উচ্চতায় এবং ঝাড়ে এখনো কৈশোরে কিন্তু হলুদ, শাদা, বেগুনি, লাল ফুল ফুটিয়েছে। সিমেন্টের বেঞ্চগুলো খালিই পড়ে থাকে। অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যে উপচানো সঙ্গলোভী বৃদ্ধদের সংখ্যা এখনো হয়ত বাড়েনি এই অঞ্চলে। পাঁচিলের ধার ঘেঁষে ঝোপ, বড় বড় ঘাস। পার্কের যত্ন নেওয়ার

লোকটি বোধহয় অলস কিংবা বেতন কম, পায়। ঝোপের উপর প্রজাপতি ওড়াউড়ি করে, তিনতলা থেকে দেখা যায়। পার্কের মধ্যে শালিক নামে, ঝগড়া করে। জোড়া বুলবুলি এ গাছ-ওগাছ উড়ে বেড়ায়। লম্বা লেজওয়ালা কালো পাখি পার্কের পাঁচিলে কখনো সখনো বসে। সকালে বা দুপুরে ঘুঘুর ডাক শোনা যায় দূর থেকে ভেসে আসা মোটর বা বাস বা জেনারেটরের শব্দ ছাপিয়েও।

এক বৃষ্টির দিনে মাটির সোঁদা গন্ধ, ঝাপসা গাছপালা এবং ঝমঝম আওয়াজের মধ্যে প্রান্তরে একটা তালগাছকে আবিষ্কার করে অরুণ অবাক হয়েছিল।

"বসবাসের" উত্তরের অংশে একটি ফ্ল্যাটের কিছুটা অভ্যন্তর দেখা যায় যদি পর্দা সরান থাকে। একদিন ফুটফুটে একটা বাচ্চা হামা দিচ্ছিল। অবাক হয়ে ঝুঁকে দেখছিল বিরলকেশ, কৃষ্ণকায় হাফপ্যান্টপরা স্বাস্থ্যবান এক যুবক। হঠাৎ পর্দার আড়ালে থাকা কারুর দুটি নিটোল ধবল বাহু বাচ্চাটিকে তুলে নিয়ে চলে গেল। তারপর যুবকটি, সম্ভবত বাবা, বাচ্চাটার নকল করে ঘরে হামা দিয়ে একবার ঘুরেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং সেইসঙ্গে ভেসে এল মাঝরাতে ঝমঝম বর্ষার মত হাসি। বাণী এই দৃশ্য ও হাসিতে অভিভূত হয়েছিল।

"এভাবে ঠকাবে একদমই ভাবিনি।"

"ভেবে আর লাভ নেই।"

প্রসঙ্গটা দুজনেই এড়িয়ে যেতে চায় কিন্তু মনের মধ্যে সারাক্ষণই বিষাদের বোঝা বহন করে চলার সামর্থ্যও আর নেই। অরুণ কঠিন ধাতের মানুষ যা তার ছোটখাট রুগ্নদেহ ও নম্র আচরণ থেকে বোঝা যায় না। স্কুলের পড়া শেষ করেই চাকরিতে ঢুকেছিল এবং গত তিরিশ বছরে ধাপে ধাপে উঠে এখন বিরাট এক এনজিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় বিভাগের তিন নম্বর কর্তা। সে জানে আর তার ওঠার যোগ্যতা নেই এখানেই আরো বছর দশেক থেকে অবসর নিতে হবে।

"আজ ভাত খাবার সময় দেবু কিছু বলেনি?"

"পরপর তিন রোববার মাংস হল না গাঁইগুই করছিল, অব্যেস হয়ে গেছে তো। এখনো ব্যাপারটা জানে না।"

"জানতে হবে। নইলে⋯"

"কি জানবে?"

"সতেরো-আঠারো বয়স, এখন তো নানান ব্যাপারে অভ্যস্ত হবার সময়, নানা প্ল্যান মাথায় খেলে, স্বপ্ন দেখে, আমার ক্ষমতার ভরসাতেই তো সব⋯এখানে ওর বন্ধুবান্ধবরা সবাই সচ্ছল ঘরের, ওর চালচলন, আবদারগুলোও সেইরকম হয়ে

উঠেছে…কিন্তু আমার আর ক্ষমতা যে নেই এটা ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে, আমি যে মার খেয়ে গেছি…"

স্বামী-স্ত্রী নীরবে, পাশাপাশি। ভবিষ্যৎ ওদের অস্থির, কাতর ও ভীত করছে এবং অতীতকে সেই জন্যই বারবার এখন মনে পড়ছে, অথচ সেখানে তারা আর আশ্রয় নিতে চায় না। কেউ কারুর দিকে না তাকিয়েই বুঝতে পারছে বর্তমান থেকে তাদের নিস্তার নেই।

"বাবু কি বলছে?"

"ওর অত খাওয়া নিয়ে বাহানা নেই…কুকুরের পেট ভরলেই সন্তুষ্ট।"

অরুণের মুখে পাতলা হাসি ভেসে উঠল। আড়চোখে দেখল বাণীও স্তিমিত হয়ে পড়েছে। এগারো বছরের বাবু আর সাত মাসের একটা স্পিৎজ বাচ্চা মিলে চমৎকার এক উৎপাত তৈরি হয়েছে। রাত্রে কুকুরটিকে বুকের কাছে নিয়ে ঘুমোয়, মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ার সময় টেবলের নিচে বসিয়ে রাখে। স্নান করান, লোম আঁচড়ান, সহবত শেখান ইত্যাদি ওর নানান কাজের ব্যস্ততায় তারা মজা পায়, দিন দশেক আগেও স্পিৎজ বাচ্চার নাম ছিল 'বথাম', এখন হয়েছে 'কপিল'। একসময় টার্জান ও বেতালকেও সে সম্মানিত করেছে।

অফিসের লিফটম্যান হামিদ কোথা থেকে বাচ্চাটিকে এনে দিয়েছে সাড়ে চারশো টাকায়। সবাই বলেছে, খুব সস্তায় পেয়েছেন। তখন চব্বিশশো টাকা প্রতি মাসে দিয়ে যেত পরিতোষ। মাসিক আয়টা হঠাৎ দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যাওয়ার জোয়ারে সংসারটা ফুলে উঠেছিল উচ্ছ্বাসে। ক্রমশ সেটা থিতিয়ে গেল বটে কিন্তু উচ্ছ্বাসের স্তর আর নামল না। এখন ওরা এই সচ্ছলতায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

পরিতোষ তার নিজের ভাগ্নে। সরকারি অফিসের কেরানী। প্রথম যখন বলেছিল, অরুণ বিশ্বাসই করতে পারেনি।

"দেওয়া যায় নাকি বছরে শতকরা আটচল্লিশ?"

বাণী বলেছিল, "হাজারে চল্লিশ টাকা মাসে? তার মানে?"

"দেওয়া যায় কি না যায়, টাকা খাটাচ্ছে এমন লোকের কাছে যাচাই করে দেখ। আমিই তোমায় মাসে মাসে সুদের টাকা দিয়ে যাব বাড়িতে।"

দিন দশেক পর রাতে বিছানায় নিচু গলায় অরুণ বলেছিলে, "এবার টাকার দরকার হবে, এবার তোমার হেল্প চাই।"

"কিভাবে করব!"

"খরচ আরো কমিয়ে আনতে হবে। জমাতে হবে। ফ্ল্যাটের জন্য সোসায়েটি পনেরো হাজার টাকা চেয়েছে তিন মাস পর আরো দশ হাজার। এই বছরেই,

আমাকে মোট দিতে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হাজার, ব্যাঙ্কে যা আছে তাতে হাজার তিরিশ পারব। তাছাড়া অ্যাপেক্স থেকে লোন চল্লিশ হাজার, তারপর আরো দশ হাজার প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে তুলতেই হবে. ভেবেছিলুম ওখানে হাত দেব না, কিন্তু আর পাবই বা কোথা থেকে! জিনিসের যা দাম বেড়েছে তাতে ওরা বলছে পঁচাশি হাজারে পারা সম্ভব নয়, তার মানে আবার টাকা চাইবে।"

"নতুন জায়গায় নতুনভাবে থাকতে হলে অনেক কিছু কেনার দরকার হবে, তাতেও তো অনেক টাকা লাগবে।"

"লাগবেই তো। এখানকার পুরনো ভাঙ্গা ছেঁড়া রঙচটা জিনিসগুলো নিয়ে যাব ভেবেছ নাকি ? বালিশ তোষক থেকে শুরু করে বাসনকোসন, পর্দা, চেয়ার, টেবল, পাখা কত কি করাতে হবে।"

"গ্যাসের জন্য বলেছ ?"

"হ্যাঁ, হয়ে যাবে। সেও হাজার-বারশোর মত পড়বে।"

"অ্যাতো !"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাণী একগুঁয়ে গলায় বলেছিল, "হোক, কয়লার উনুনে আর আমি রাঁধব না।"

"ওখানে কয়লার উনুন প্রহিবিটেড, কেরোসিন নয়ত গ্যাস।"

"ডাইনিং টেবল ছাড়া চলবে না। দেবু আর বাবু আলাদা ঘরে থাকবে, খাট চাই, পড়ার টেবল চাই।"

"ওসব পরে হবে, টাকা জমিয়ে জমিয়ে করাব।"

"আবার কষ্ট করে চলতে হবে ?"

"উপায় কি ? অ্যাপেক্সের ধারের টাকা কোয়ার্টারলি শোধ করতে হবে না ? তারপর আসবে ট্যাক্স, ইলেকট্রিক, সোসায়েটির চাঁদা, সব নিয়ে মাসে অন্তত পাঁচ-ছ শো ধরে রাখতে পার কিংবা তারও বেশি। মাইনের টাকা থেকে এত সব দিতে হলে..."

"আবার কষ্ট করতে হবে! জীবনে সুখের মুখ দেখা আর..."

এসব কথা এক রাত্রে হয়েছিল তার পরদিনই অফিস থেকে ফিরে অরুণ দেখল পরিতোষ তার জন্য অপেক্ষা করছে।

"মামা কমিশনের টাকাটা তাহলে আমার কপালে আর নেই।"

"চট করে কি এসব করে ফেলা যায়।"

"কম করে রাখ...হাজার দশেক। মাসে চারশো টাকা..."

"কাল আসিস।"

রাতে ওরা আবার আলোচনা করেছিল।

"ওখানে গিয়েও কষ্ট করা...কি লাভ তাহলে ফ্ল্যাট কিনে। মানুষ উপরে উঠতে চায় নিচের দিকে নামে না।"

"প্রভিডেন্ট ফান্ডে হাত দেব না ভেবেছিলুম...আজ খোঁজ নিয়ে দেখলুম অফিসের সাত-আটজন টাকা রেখেছে, জানতুমই না। হিমাংশুবাবুর ঝি পর্যন্ত চব্বিশ হাজার রেখেছে।"

"ঝিয়ের...চব্বিশ হাজার! অ্যাতো?"

"ঝিয়ের ছেলে কারখানায় কাজ করত অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছল। দু বছর ধরে কাঠখড় পুড়িয়ে হিমাংশুবাবুই কম্পেনসেশন চব্বিশ হাজার টাকা আদায় করে এনেছে। তারপর এখানে টাকা রাখার জন্য যা কিছু করার সব করেছে, এখন সেই ঝি বস্তির ঘরে বসে মাসে মাসে প্রায় এক হাজার টাকা পাচ্ছে, ভাবতে পার পনেরো টাকা মাইনের বাসন মাজা ঝি..."

"তুমি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সবটাই দাও।"

বাণীর স্বরে তীব্রতা ছিল। 'সবটাই বরং' বা 'সম্ভব হলে' ধরনের দ্বিধা ছিল না। অরুণ পরদিন প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তোলার জন্য দরখাস্ত করে। আড়াই মাস পর পরিতোষ একটা খাম দেয়, তাতে তার মাইনের থেকেও বেশি টাকা ছিল।

"এখনো ইলেকট্রিক এল না আজ কি সিনেমা আছে?"

"জানি না।"

"এখনো বৃষ্টি নামল না, ধানটান কেমন হবে কে জানে?"

"টিভি-টা বিক্রি করে দাও।"

অরুণ না শোনার ভান করল। বহু দূরের রাস্তা দিয়ে কয়েকজন মজুর মেয়ে-পুরুষ চলেছে। শাড়ির লালরঙগুলো জমির মাটি ও গাছের পাতার মধ্যে চমৎকার সাম্যতা এনে দিয়েছে। এরকম কিছু একটা তাদেরও থাকা উচিত ছিল, তাহলে লোভ সংবরণ করা যেত। অরুণ অবাক হল, লোভ শব্দটা এখনও বাণী বা সে ব্যবহার করেনি। হয়ত ভয়ে কেননা তাহলেই ওটা ছোঁড়াছুঁড়ি হবে। তারা কেউই ঝগড়া করতে চায় না। এটা ঝগড়ার ব্যাপার নয়।

"আমাদের খরচ কমাতে হবে। ভাবছি কাল থেকে আট টাকা হাতে নিয়ে বাজারে যাব। কুকুরের জন্য আর বাড়তি কেনা সম্ভব নয়।"

"ওতে আর ক' টাকা সাশ্রয় হবে।"

"যতটুকুই হোক। এভাবেই কিছু কিছু করে ছাঁটতে হবে।"

অরুণের চোয়ালে ও ঠোঁটে কাঠিন্য দেখে বাণী কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

"কুকুরটাকে বিদেয় করলেই ভাল হয়।"

"বাবুর মনে লাগবে।"

"টি ভি-টা দরকার। বাড়িতে সময় কাটাতে...আগে কি বিশ্রিই সন্ধ্যেবেলাটা লাগত।"

রাস্তা দিয়ে বাবা-মা দুই মেয়ের একটা পরিবার আসছে 'বসবাস'-এর দিকে তাকাতে তাকাতে। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে আর সারা বাড়িটাতে চোখ বোলাচ্ছে। কোন ফ্ল্যাটে সম্ভবত ওদের আত্মীয় আছে। গেটের কাছে ওরা দাঁড়াল। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করছে।

"তোমার জ্যাঠামশাইরা একদিন ফ্ল্যাট দেখতে আসবেন বলেছিলেন।"

"হ্যাঁ। সেই বেহালা থেকে আসা...জেঠিমার পক্ষে তিনতলায় ওঠাও আর সম্ভব নয়। দীপু বলছিল বাংলাদেশ ধরার জন্য অ্যান্টেনায় কি একটা লাগাবে, এখানে অনেকেই লাগিয়েছে।"

একদম নয়, কোন খরচের মধ্যে আর যাওয়া নয়। দরকারটা কি ? এভাবেই তো লোভে পড়ে..."

অরুণ প্রায় অজান্তেই মুখ ফেরাল বাণীর দিকে এবং বাণীও ফেবাল তার দিকে। কয়েক সেকেণ্ড দুজনের চাহনি বাঁধা রইল।

"ওদের এবার বলতে হবে, এভাবে খরচটরচ করা আর সম্ভব নয়। শুধু বাজারই নয় অন্যান্য ব্যাপারেও কমাতে হবে। অনেক কিছুই তো আমাদের আগে ছিল না।"

"তাহলে তুমিই ওদের বলে দিও।"

"মেঝেতে টালি না বসিয়ে সিমেন্টের করালে হাজার ছয়-সাত বাঁচত।"

"আমি করাই নি, তুমি করিয়েছ।"

বাণীর কষ শক্ত, গলায় ঝাঁঝ। অরুণ অবসাদ বোধ করল। তারা ঝগড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আরাম স্বাচ্ছন্দ্যার জন্য লোভী না হলে টাকাগুলো থাকত। বড় কষ্ট করে জমানো টাকা।

"তখন অনেকেই বলেছিল গবরমেন্ট এ ব্যবসা চালাতে দেবে না কিছু একটা করবে। বিশ্বাস করিনি। এতো লোকের এত টাকা..."

বাণীর কানে এসব কথা পৌঁছল না। সে তখন ভাবছিল বসন্ত দাস স্ট্রিটের জীবনে আবার কি করে ফিরে যাবে ? অন্ধকার ঝুলকালি ভরা রান্নাঘর, শ্যাওলা মাখা উঠোন কলঘর, ফোঁটা ফোঁটা কলের জল, হাজা ফাটা ঘরের মেঝে, দরদর ঘাম, ভ্যাপসা বিছানা, বালিখসা ভিজে দেয়াল, জানলার নিচে আস্তাকুঁড়, রাস্তায় দিন রাত বস্তির বাচ্চাদের চিৎকার, লাউডস্পীকার, বোমা নিয়ে

খুনোখুনি…নানাবিধ গন্ধ শব্দ রঙ প্রাক্তন জীবন থেকে তালগোল পাকিয়ে হা হা করে তার উপর আছড়ে পড়ছে এখন। প্রশস্ত, প্রশান্ত, আলোবাতাস মাখান জীবনের জন্যই সে যুদ্ধ করে গেছে। বসন্ত দাস স্ট্রিটে ফিরে যেতে হবে না ঠিকই। কিন্তু এই পরিসর, পরিচ্ছন্নতা, অবকাশ, নীরবতা পেয়েও হারাতে হবে। আবার কষ্ট আবার একটা যুদ্ধ। এখন মাইনের টাকাই সম্বল, তাই দিয়ে সব মেটাতে হবে। বাণী ক্লান্তি বোধ করতে শুরু করল।

দরজায় ধাক্কা পড়ছে আর কুকুরের ডাক। বাবু ফিরেছে।

বাণী দরজা খুলে দিতেই উত্তেজিত বাবু বলে উঠল, "জান মা, কপিল আজ হাড় খেয়েছে। ওই যে চায়ের দোকানটা, বাস রাস্তায় ব্যাংকের গায়ে টালির চাল দেওয়া, ওর যে মালিক সে বলেছে মাংসের হাড়টাড় যা প্লেটে পড়ে থাকবে সব রেখে দেবে। আমাকে বলল একটা টিনের কৌটোমৌটো দিয়ে যেতে। স্কুল থেকে ফেরার সময় বাস থেকে ওখানে নেমে কৌটোটা নিয়ে বাড়ি আসব। আজ এই মোটা একটা হাড় ওকে দিয়েছিল, পারে নাকি চিবোতে! একটা লোক তখন মাংস খাচ্ছিল, একটা নরম হাড় ছুঁড়ে দিতেই ঝাঁপিয়ে কচমচ করে চিবিয়ে খেল, দাঁতে বেশ জোর হয়েছে, ঘিয়ের কত টিন রয়েছে তো একটা দেবে ? আমার সঙ্গে বলু আর প্রদীপ্ত ছিল, ওরা বলেছে ওদের যে দিন মাংস রান্না হবে কপিলের জন্য হাড়গোড় রেখে দেবে।"

বাণী বকুনি দিতে গিয়েও দিল না। শুধু বলল, "এঁটো কাঁটা ভিক্ষে করে কদিন খাওয়াবে, তার থেকে ওকে বরং বিদেয় করাই উচিত।"

কথাটা এতই হাস্যকর যে বাবু গ্রাহ্যে না এনে বলল, "আচ্ছা, সব ফ্ল্যাটে গিয়ে যদি কপিলের জন্য রাখতে বলি ? তাহলে নিশ্চয় এক বালতি হয়ে যাবে। অত খেতে পারবে না।"

কুকুরটা ঘুরঘুর করছিল ঘর-বারান্দা। কয়েকবার ওকে মেঝে শুঁকতে দেখে বাবু ধমকে উঠল, "না না এখানে নয়, বাথরুমে।"

সে নিজে বাথরুমের ভিতরে গিয়ে ডাকতে লাগল, "কাম্ কাম্।"

বাণী বারান্দায় আসতেই অরুণ মুখ না ফিরিয়ে বলল, "সিগারেট ছেড়ে দেব, শ'খানেক টাকা সেভ হবে।"

বাণী নিরুত্তর রইল। বাথরুমের থেকে বাবুর নির্দেশ শোনা যাচ্ছে : "নো নো, এইভাবে এইভাবে বোস…মার খাবে কিন্তু বলছি…"

দূরের বাড়িগুলো ঝাপসা হয়ে এসেছে। লোডশেডিংয়ের জন্য কোথাও আলো দেখা যাচ্ছে না। কিছু কাক ডাকাডাকি করে চুপ করে গেল। একটু পরে আলো জ্বলে উঠতেই ওরা ঘরে এসে বসল টি ভি-তে সিনেমা দেখার জন্য।

দুদিন পর রান্নাঘরের সিঙ্কের নিচে একটা টিনে কিছু হাড় আর মাছের কাঁটা দেখে অরুণ ব্যাপারটা জানতে চায় এবং বাণী জানায়।

"এভাবে বাইরে থেকে চেয়ে আনলে লোকে ভাববে আমাদের বোধহয় মাছ মাংস খাওয়ার পয়সা নেই। এসব বন্ধ কর।"

"বাচ্চা ছেলে চেয়ে আনছে এতে কে আর মনে করবে।"

পরদিন বাণীকে সকালে ঘর মুছতে দেখে অরুণ প্রশ্ন করতে গিয়েও করল না। বাণী নিজেই বলল, "সামান্য কাজের জন্য মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়া...ছাড়িয়ে দিলুম। একটু খাটাখাটনি না করলে বাত ধরে যাবে।"

সেই দিনই রাতে দেবু খাওয়ার টেবলে হাত গুটিয়ে বসল।

"রোজ রোজ দুবেলা এই ডাল আর ভাত, ভাত আর তরকারি ভাল লাগে? একটা ভাজা পর্যন্ত নেই, মাছ নেই।"

"ভাল না লাগলে খেও না। মাসে চার কিলো সর্ষের তেল খরচ হয়, এই কটা লোকের জন্য! এবার থেকে দু কিলোর বেশি আর কিনব না। আগে তো এই রকমই রান্না হত তখন মুখে রুচতে কি করে?"

গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে দেবু উঠে গেল। বাণী কষ্ট পেল এইভাবে কথা বলার জন্য। এখানে আসার পর এই প্রথম বসন্ত দাস স্ট্রিটের কণ্ঠস্বর তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল।

টেপরেকর্ডারে বিলিতি বাজনার সুর বাজছে নিচু স্বরে। মাস ছয়েক আগে দেবুকে কিনে দিয়েছিল অরুণ। বাণী ঘরে ঢুকতেই দেবু বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে উবুড় হল। ঘরের অন্য কোণে খাটে বাবু ঘুমোচ্ছে। কুকুরটা তার পায়ের কাছে। বাণীকে দেখে একবার মুখ তুলেই আবার কুণ্ডলী পাকাল।

"তোকে একটা কথা বলা দরকার।"

সে ঠিক করেই ফেলেছে তাদের অবস্থা এবং ক্ষতির কথাটা দেবুকে এবার বলা দরকার। বয়স প্রায় আঠারো, বুঝতে পারবে।

বাণীর মাত্র দু'মিনিট লাগল দেবুকে বিস্ময়ে উঠে বসাতে।

"বাবা ওখানে টাকা রেখেছিল! ও আর ফেরত পাবে না। আমার ক্লাসের এক বন্ধুর বাবার তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

এরপর বাণী দেখল কৈশোরের প্রান্ত থেকে দেবুর তাজা মুখটা ধীরে ধীরে বার্ধক্যে পৌঁছে যাচ্ছে। কুঁজো হয়ে কাঁধ ঝুঁকিয়ে স্তিমিত দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। ও রেগে উঠল না, কিছুটা যেন উদাসীন হয়ে পড়েছে। সে ভেবেছিল অনেক কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে ছেলেকে, কেন তাদের টেনেটুনে চলতে হবে এবং কেন ভবিষ্যতেও কিছু রেখে যাওয়ার আর উপায় নেই এই

ফ্ল্যাটটি ছাড়া।

কিন্তু কিছুই বলার দরকার হল না। খবরের কাগজে পড়েছে নিশ্চয়, শুনেছে অনেক। তবে প্রথমেই বলে উঠেছে মাথা খারাপ হওয়ার কথা কেন?

"আমাদের এখন অন্যভাবে চলতে হবে, বুঝতেই তো পারছিস।"

বাণী এইটুকু বলে বারান্দায় এল। ইজিচেয়ারে গল্পের বই পড়ছে অরুণ। বইটা হাতে ধরা, চোখ সামনের অন্ধকারে। একটু ত্রস্তে সে বইটায় চোখ ফেরাল।

"দূরের জানালার আলো কি সুন্দর লাগে দেখতে।"

"দেবুকে বলেছি।"

"কি বলল? কিভাবে নিল?"

বাণী মাথা নাড়ল। অরুণ উদ্বিগ্ন চোখে সিধে হয়ে বসল।

"ওর এক বন্ধুর বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

"তার মানে আমার হতে পারে...পাগল।"

অরুণ হাসতে শুরু করল। হাসিটা যখন টানার ক্ষমতা হারিয়ে থেমে গেল তখন বলল, "হিমাংশুবাবুর সেই ঝি কি বলে বেড়াচ্ছে জান? বাবুই তার টাকা মেরেছে, কাগজপত্তরে সই করিয়ে লিখিয়ে নিয়ে এখন বাবু বলছে কোম্পানি ফেল করেছে। ঝি রোজ এসে কান্নাকাটি, গালাগালি, শাপশাপান্ত করছে, হিমাংশুবাবুর অবস্থাটা ভাব! ওর তো পাগল হওয়ার কথা, হয়নি।"

"নিজের টাকা গেলে হত।"

অরুণ বইটা আবার চোখের সামনে তুলল। পার্কের থেকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক আসছে। দূরে হর্ন দিল ইলেকট্রিক ট্রেনের এঞ্জিন। দেবু আবার টেপ রেকর্ডার চালিয়েছে। বাণী বারান্দার কোণায় গিয়ে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল।

পর্দাটা সরান। ঘরে অনেক সুবেশ নারী ও পুরুষ কোন কারণে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে, অনেকের হাতে প্লেট। হঠাৎ দমকা সমস্বরে হাসি, চেঁচিয়ে ওঠা একক কণ্ঠ, উজ্জ্বল আলো, টেবলে রজনীগন্ধার গোছা এই সবের মধ্যে বাচ্চাটিকে সে দেখতে পাচ্ছে না, হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবাকে বারদুয়েক দেখা গেল ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবিতে একেবারে অন্য চেহারা। গলায় মোটা বেলফুলের মালা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, বরের মত লাগছে। হয়ত বিবাহবার্ষিকী কিংবা জন্মদিন।

বাণী মুখ ফিরিয়ে অরুণের দিকে তাকাল। দেবুর বন্ধুর বাবা পাগল হয়ে গেছে। সে আরও নিবিষ্ট হয়ে দেবুর বাবার দিকে তাকাল। একই রকম মনে হচ্ছে, বসন্ত দাস স্ট্রিটেরই লোকটা।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বাণীর। দালানে আলো জ্বলছে। ঘরের খোলা দরজা দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে অরুণ দাঁড়িয়ে। তাকাচ্ছে এধার ওধার। লাইম পানিংয়ের শঙ্খ মসৃণ দেয়ালে হাত বুলোল, উবু হয়ে মার্বেলাইট টালির মেঝেয় হাত বুলোল, হাত বাড়িয়ে পর্দাটা মুঠোয় ধরে অনেকক্ষণ নকশার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর রেফ্রিজারেটর, ডাইনিং টেবল, টি ভি সেট, পোর্সেলিনের বেসিন, ইলেকট্রিক সুইচ বোর্ড ছুঁয়ে ছুঁয়ে আনমনে দালানটায় ঘুরতে লাগল। একবার রান্নাঘরের দরজা খুলে পাথরের টেবলের উপর নিকেলের ঝকঝকে হটপ্লেটের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল। এরপর সে দালানের মাঝে দাঁড়িয়ে আবার প্রত্যেকটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তাব দু চোখে অবিশ্বাস, সন্দেহ।

কয়েক দিন পর দেবু জানাল সে একটা টিউশনি পেয়েছে, ক্লাশ থ্রি-র ছাত্র, ষাট টাকা মাইনে।

শুনে অরুণ বলল, "স্বাবলম্বী হওয়াই তো উচিত, তোর বয়সেই আমি রোজগারে নেমেছি, তবে নিজের পড়ার যেন ক্ষতি না হয়।"

বাণীকে সে বলল, "আর বছর দশেক তারপর এই ফ্ল্যাটের জন্য যা কিছু ধারদেনা ওকেই তো টানতে হবে। অবশ্য আমি মরে গেলে অ্যাপেক্সের টাকাটা আর দিতে হবে না, ইন্সিওর করান আছে।"

একথা শুনে বাণী বা দেবু কোন মন্তব্য করল না। রাতে চাপা গলায় বাবু জানতে চায়, "ষাট টাকা নিয়ে কি করবিরে দাদা?"

"পড়ার ব্যাপারে আর বাবার কাছ থেকে কিছু নোব না।"

"কপিলের জন্য একটা চিরুনী কিনে দিবি?"

"দোব, ওর নামটা এবার বদলা।

প্রবল বৃষ্টিতে বাস চলাচল প্রায় বন্ধ হওয়ায় অরুণ জল ভেঙে ভিজতে ভিজতে অফিস থেকে বাড়ি ফিরল। কয়েক দিন সর্দিজ্বরে ভুগে অফিসে গিয়েই শুনল কাজ করতে করতে হিমাংশুবাবুর বুকে ব্যথা ওঠায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সেখানে সীট না পাওয়ায় নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। অফিসেরই খরচে। অরুণ জেনে নিল নার্সিংহোমটা 'বসবাস'-এর কাছেই। অফিসের অনেকেই দেখে এসেছে।

"টেবলে মাথা রেখে অজ্ঞানের মত হয়ে গেছল…স্ট্রোক হয়নি, হাই ব্লাডপ্রেসার আছে, দুশ্চিন্তায় ভাবনায় এই সব হয়। ভাবলুম একবার দেখে আসি কিন্তু মাঝপথে আর নামতে ইচ্ছে করল না, রোববার দেখে একদিন যাব।"

বাণী মৃদু উদ্বেগবোধ করল। ব্লাডপ্রেসার অরুণেরও আছে তবে নিচুর দিকে।

বন্ধুর বাবা সম্পর্কে দেবুকে প্রায়ই সে জিজ্ঞাসা করে। ইতিমধ্যে বসবাস-এর এক সদস্য ক্যানসারে মারা গেলেন। দীর্ঘদিনই ভুগছিলেন। বাকি উনচল্লিশ ফ্ল্যাটের লোকেরা ব্যাপারটা প্রায় লক্ষ্যই করল না। শুধু চারতলার দুই বারান্দার মধ্যে কথাবার্তার টুকরো বাণীর কানে এল: "...পুরো টাকাটাই তো উনি দিয়ে দিয়েছেন। যদি না দিতেন এখন আর শোধ করার দরকার হত না, কত হাজার টাকা তা হলে রাখতে পারতেন ভাবুন তো!" ..."উনি তো ঠাট্টা করে বলেন, এখন যদি মরে যাই ইন্সিওরেন্সই শোধ করবে হাজার চল্লিশ বেঁচে যাবে।"

খরচ কমাবার জন্য বাণী পরের সাতদিনে একের পর এক ব্যবস্থা নিল। ট্রানজিস্টারের ব্যাটারি ফুরিয়েছে কেনা হয়নি, লন্ড্রীতে আর কিছু যায় না সবই নিজে কাচছে, ফিরিওলা দেখলেই মাথা নেড়ে দরজা বন্ধ করে দেয়, অরুণের দূরসম্পর্কের কাকার মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়েও তারা যায়নি তাতে অন্তত একশো টাকা বেঁচেছে, জানালার কাচ বাবু ভাঙল কিন্তু বদলায়নি, জিরজিরে তোয়ালে দুটো আর বদল না করলেই নয় গামছা কিনল। চা কিনেছে অর্ধেক দামের। তার এই ব্যয় সঙ্কোচন চেষ্টার কোন প্রতিবাদ উঠল না সংসারে বরং ঠাট্টা করেই দেবু বলল, "লোডশেডিং মাকে অনেক সাহায্য করছে ইলেকট্রিক বিল কমিয়ে দিয়ে।"

আগের মতই সাজানো গোছানো অথচ কোথায় যেন একটা ফাটল যেখান থেকে প্রাণরস চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। অরুণ অনুভব করে, বাণীও সেটা জানে। সবাই কথা কম বলে। রুটিন মাফিক কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে অযথা অকারণ কিছু নেই। শুধু কুকুরটার চেঁচামেচি, ছোটাছুটি জীইয়ে রেখেছে মরে আসা উচ্ছ্বাসকে। বাবু তার কপিলের জন্য হাড়গোড় উচ্ছিষ্ট যোগাড় করে আনছে। বসবাস-এর ছেলেরা পিকনিকে যাবে, সে দশ টাকা চেয়েছিল কিন্তু বাণী দেয়নি। ওর মুখ তখন যে কষ্ট বাণীকে দিয়েছিল সেটা অরুণও পেয়েছে কেননা তারপর বাবু চুপিচুপি তার কাছেও চেয়েছিল। সেও প্রত্যাখ্যান করে। তখন অরুণের মনে হয়েছিল, তারা যেন বাড়াবাড়িই করছে। তাদের কোন অধিকার নেই সন্তানদের পীড়ন করার। 'মানুষ উপরেই উঠতে চায় নিচের দিকে নামে না', কথাটা তাকে উত্তেজিত করেছিল। কিন্তু এই কি উপরে ওঠা?

কারণটা খুঁজতে খুঁজতে প্রতিবারই সে একটা কানাগলির দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সে আর বাণী দুজনেই সমান দায়ী, যে কারণে তারা আর এই মার খাওয়ার প্রসঙ্গ তোলে না, নীরবে প্রাক্তন জীবনে ফিরে যাচ্ছে মুখ নামিয়ে। বারান্দায় বসে, গাছ, পাখি, প্রজাপতি, ঘুঘুর ডাক, ধূধূ মাঠ বা তৈরি হওয়া বাড়ি কি মাটির গন্ধ এখন তার আর ভাল লাগে না। এসব শুধুই জড়বস্তু, ওদের কাছ

থেকে কিছুই ফিরে আসে না।

"রোববার হিমাংশুবাবুকে একবার দেখতে যাব।" এই বলে অরুণ খাবার টেবল থেকে উঠে বেসিনে গিয়ে হাত ধুতে লাগল।

"আগেই যাওয়া উচিত ছিল। আমিও বরং তোমার সঙ্গে যাব, অসুস্থ মানুষ লোকজন দেখলে মনটা ভাল থাকবে।"

"তা হলে আমিও যাব।" বাবু বলে উঠল।"আমি কখনো হাসপাতাল দেখিনি।"

"নার্সিংহোম, তফাত আছে হাসপাতালের সঙ্গে।"

ওরা তিনজন রবিবার বেরল। দেবু তার বন্ধুর বাড়ি গেছে। ফিরবে সন্ধ্যার পর। বারান্দায় কুকুরটিকে বেঁধে দরজায় চাবি দিয়ে ওরা রওনা হল। বাসে মিনিট পাঁচেকের পথ। ফাঁকা চওড়া নতুন রাস্তা। হুহু করে বাস যায়।

অরুণ অফিস থেকে ঘরের নম্বরটা জেনেই এসেছিল। হিমাংশুবাবু বিছানায় বসে জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। অরুণের থেকে বয়সে কিছু ছোট, শীর্ণ, চুলের অর্ধেক পাকা। লম্বাটে মুখে গভীর কয়েকটা ভাঁজ, শান্ত চোখ। খাটের পাশে টুলে বয়স্ক একটি লোক বসে।

অরুণদের দেখে হিমাংশু হাসল।

"জানলা দিয়ে দেখেছি আপনারা আসছেন।...খাটের উপরই বসুন, টুল ওই একটাই।"

"আমার স্ত্রী আর ছোট ছেলে বাবু, আছেন কেমন?"

ইতিমধ্যে লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে টুলটা ঠেলে দিয়েছে বাণীর দিকে।

"আমার মেজ ভাগ্নে,...ভালই আছি। একটা অ্যাটাক হয়েছে, ফার্স্ট, তবে আমাকে ডাক্তাররা কিছু বলছে না, না বললেও বুঝতে ঠিকই পারি। অফিস থেকে মাঝে মাঝে ওরা আসে, আজ বউ আসেনি ওরও শরীরটা খারাপ,...রোজ রোজ আসতে কি ভাল লাগে কারুর, নবদম্পতি তো নয়।"

হিমাংশুবাবু অবশ্য খুব জোরে হাসবার চেষ্টা করল না। অরুণ জানালা দিয়ে দেখল আকাশের একদিকে ঘন মেঘ দ্রুত আর একদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। গত কয়েকদিন এই সময় কালবোশেখির মত ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে।

খুঁটিয়ে ঘরের জিনিসগুলো লক্ষ্য করার পর বাবু গুটি গুটি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বাণী কয়েকটা মামুলি কথা বলল। এক নার্স এসে হিমাংশুবাবুকে ক্যাপসুল খাইয়ে গেল। তারা পাঁচ টাকার সন্দেশ কিনে এনেছিল। বাক্সটা খুলে হিমাংশুবাবু ডাকল বাবুকে। সে ইতস্তত করে বাবা-মা'র দিকে তাকিয়ে রইল। ইচ্ছা নেই কিন্তু অসুস্থ লোকটি খুশি হবে ভেবে বাণী মাথা

নেড়ে সম্মতি দিল। ওর ভাগ্নে আকাশের দিকে আড়চোখে বারকয়েক তাকিয়ে বিদায় নিল।

"আপনার সেই ঝিয়ের খবর কি? বলেছিলেন রোজ খুব উৎপাত করে। এখানে কটাদিন তা হলে শান্তিতেই ছিলেন বলুন।"

হিমাংশুবাবু বারকয়েক জানালা দিয়ে আকাশে তাকাল। কপালের কুঞ্চন ঝিয়ের অথবা আসন্ন ঝড় বৃষ্টির জন্য কিনা বোঝা গেল না।

"উৎপাত ঠিক নয়, আসলে দায়ী তো আমিই। ওকে টাকা রাখতে আমিই পরামর্শ দিয়েছি, অশিক্ষিত, গরিব, অসহায়, মরাল রেসপন্সিবিলিটি তো এড়াতে পারি না। মাসে মাসে দুশো করে টাকা দিয়ে শোধ করব, দু' মাস দিয়েছিও।"

অরুণ ও বাণী বহুদূরে চমকানো বিদ্যুৎ ও নির্ঘোষের ফলে নিশ্চয় এই রকম বোধরহিতের মত তাকিয়ে থাকল না।

"আপনি টাকা শোধ করবেন, চব্বিশ হাজার!"

বাণী তার সঙ্গত বিস্ময় প্রকাশ করল। অরুণও যোগ দিল।

"হয় নাকি! এত বছর ধরে কষ্ট করে... ধোৎ। এ আপনার বাড়াবাড়ি।"

হিমাংশুবাবু তার শীর্ণ আঙুলগুলো দিয়ে নিজের দুই গালে চেপে ঝুঁকে বসল বালিশ কোলে নিয়ে।

"আই ওয়ান্ট টু এনজয় মাইসেলফ। নিজেকে আনন্দে ডুবিয়ে রাখতে চাই অরুণবাবু। আমাকে অবশ্যই বাঁচতে হবে আরো কিছু বছর..."

"চব্বিশ হাজার শোধ না হওয়া পর্যন্ত!"

"চব্বিশ নয় আর একটু কম, মাস ছয়েক পেয়েছে তো সেটা বাদ যাবে।"

বৃষ্টি হতে পারে নাও হতে পারে এমন এক পরিবেশের মধ্যে ওরা বাসস্টপে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারটা প্রায় সন্ধ্যার মত। দুটো বাস এসে চলে গেল, তাদের গন্তব্যের নয়।

"আর দেরি করা নয় এবার যেটা আসবে উঠে পড়ব, কাছাকাছি তো পৌঁছন যাবে।"

অরুণ কথাটা শেষ করামাত্র একটা বাস এল। অন্য দিকে যাবে তবে মোড় ঘুরবে যেখানে 'বসবাস' হেঁটে সেখান থেকে মিনিট চারের পথ। ওরা উঠল। টিপ টিপ বৃষ্টি, এলোমেলো হাওয়ায় মাছির মত উড়ে ওদের গায়ে বসল বাস থেকে নামামাত্র।

"পৌঁছতে পৌঁছতে ভিজে যাব, একটু জোরে হাঁটি।"

গতি দ্রুত করতে গিয়ে বাণীর জীর্ণ চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ল। হাতে তুলে নিল।

"বরং পাশের এই মাঠটা দিয়ে..."

অরুণকে অনুসবণ করে বাণী ও বাবু মাঠে নামল।

"বৃষ্টি আসছে, কেমন, দ্যাখ।"

মাঠের ওপারে বহু দূরে গাছপালা, বাড়ির ঝাপসা পর্দা ঝুলছে।

বাণী সেদিকে তাকিয়ে চলতে চলতে হোঁচট খেল।

"এগিয়ে আসছে, আমাদের ধরে ফেলবে।"

"বাবা দ্যাখ!"

তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে ওরা দুজন থমকে দাঁড়িয়ে বাবুর তোলা হাতের নির্দেশের দিকে তাকাল।

দূরে 'বসবাস' দেখা যাচ্ছে। আধো অন্ধকারে জমি গাছপালা আকাশের মাঝখানে ফিকে কমলা রঙের চৌকো একটা বাড়ি। রূপালি রেলিং ঘেরা ছোট ছোট বারান্দা। বন্ধ কাচেব জানলায ঘবের আলো। অ্যাণ্টেনাগুলো শীর্ণ আঙুল মেলেছে আকাশের দিকে ভিক্ষুকের মত। একটি মানুষও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। অরুণ অবাক হয়ে ভাবল, এমন কবে তো বাড়িটাকে দেখিনি, অদ্ভুত তো!

"কপিল কপিল। বাবা বাবান্দায় কপিলকে দ্যাখ, নাচছে।"

ক্ষীণভাবে ভেসে আসা কুকুরের ডাক যেন ওরা শুনতে পেল। বাবু দৌড়চ্ছে।